ব্রহ্মবিদ্যা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন-বিষয়ক

ত্রৈমাসিক পত্র।

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত।

প্রথম ভাগ। বঙ্গাব্দ ১৩০৩।

কলিকাতা

২১০।৩।২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, ব্রাহ্মসমাজ-পল্লী হইতে

শ্রীযশোদালাল চৌধুরী-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ টাকা। ভি, পি, পোষ্টে ১৵৹।

প্রথম ভাগের সূচীপত্র।

ওঁ সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম।

ব্রহ্মতত্ত্ব

নিবেদন।

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ২। ১৫॥

"যখন যোগযুক্ত সাধক এখানে দীপস্থানীয় আত্মতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করেন, তখন তিনি জন্মরহিত, ধ্রুব এবং সর্ব্ব বিষয় দ্বারা অসংস্পৃষ্ট ঈশ্বরকে জানিয়া সমুদায় বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন।"

যে ব্রহ্মজ্ঞান সর্ব্ববিধ মঙ্গলের নিদান, যাহা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তি,—সাধ্যমত সেই মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করা এই পত্রের উদ্দেশ্য। যে চিন্তা ও সাধন-স্রোত স্মরণাতীত কালে বৈদিক ঋষিগণের চিত্তরূপ মহোচ্চ পর্ব্বত হইতে নিসৃত হইয়াছিল, যাহা প্রথমে উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রাদি পবিত্র পাত্রে অর্পিত হইয়াছিল, এবং তৎপর ভগবদ্গীতাদি প্রশস্তাধারে পতিত হইয়া জাতীয় জীবনক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি মনস্বীগণ যে জ্ঞান-প্রবাহ অনুসরণ করেন, যাহা অসংখ্য জ্ঞানী ও ভক্ত কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া, অসংখ্য সাধকের তপস্যা বলে বর্দ্ধিত হইয়া, অগণ্য ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ প্রণালী যোগে প্রবাহিত হইতেছে, যাহা বর্ত্তমান যুগে, বিধাতার বিধানে, পাশ্চাত্য অভিনব চিন্তা-স্রোতের সহিত মিশ্রিত হইয়া অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিতেছে, সেই মহাস্রোতের অনুসরণ করাই আমাদের অভিলাষ। প্রাচীন ও আধুনিক, দেশীয় ও বিদেশীয় ব্রহ্ম-সাধক-দিগের চরণতলে বসিয়া আমরা ব্রহ্মতত্ত্বের যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছি ও করিব, তাহা পাঠকদিগকে উপহার দিতে ইচ্ছা করি। ইচ্ছাপূর্ণ হওয়া না হওয়া ঈশ্বরের হস্তে।

ব্রহ্মবিদ্যা একটী ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র বিজ্ঞান নহে, ইহা বিবিধ বিজ্ঞান-সেবিত। মনোবিজ্ঞান, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, নীতি-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, ভক্তি-শাস্ত্র, এই সমুদায়ের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং "ব্রহ্মতত্ত্বে" প্রয়োজনমত ও আমাদের সাধ্যমত এই সমুদায় শাস্ত্রেরই আলোচনা হইবে। এখন ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর করিয়াও পাঠকগণের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া মূল কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।

ওঁ

আত্মপ্রত্যয় ও ব্রহ্মপ্রত্যয়।

অস্তি কশ্চিৎ স্বয়ং নিত্যমহংপ্রত্যয়লম্বনঃ।

অবস্থাত্রয়-সাক্ষী সন্ পঞ্চকোষ-বিলক্ষণঃ॥

শঙ্করাচার্য্যকৃত 'বিবেকচূড়ামণি,' ১২৭ শ্লোক।

"আত্মপ্রত্যয়ের নিত্য আশ্রয়রূপী স্বতন্ত্র একজন আছেন। তিনি জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী এবং অন্নময়াদি পঞ্চকোষ হইতে ভিন্ন।"

ব্রহ্মপ্রত্যয় আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ, বস্তুতঃ বিশুদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ই ব্রহ্মপ্রত্যয়, এই প্রবন্ধে আমরা এই কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 'আত্মা' অর্থ জ্ঞাতা। আত্মার অন্য যত কেন লক্ষণ থাকুক্ না, জ্ঞান ইহার মৌলিক লক্ষণ। যাহার জানিবার শক্তি নাই তাহার পক্ষে সুখ দুঃখানুভব এবং ইচ্ছাশক্তি-পরিচালন প্রভৃতি সকলই অসম্ভব। সুতরাং জ্ঞান যে আত্মার মৌলিক লক্ষণ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই জ্ঞানরূপী আত্মা যে আছে, এই বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ। 'আত্মা আছে,' 'আমি আছি,' কোনও অবস্থায় কোনও ব্যক্তির এই বিশ্বাসে প্রকৃত সন্দেহ আসিতে পারে না। 'আমি সন্দেহ করি আত্মা আছে কি না' এরূপ আপাত সন্দেহাত্মিকা চিন্তাতেও স্পষ্টরূপে আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ পাইতেছে। সন্দেহকারীর পক্ষে আপন সন্দেহের অস্তিত্বে সন্দেহ করা, অর্থাৎ সন্দেহ-যুক্ত আত্মাতে সন্দেহ করা, সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। আত্মা ভৌতিক কি অভৌতিক, এক কি বহু, নিত্য কি অনিত্য, এই সকল বিষয়ে অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু এই সকল বিষয়েও যে অনতিক্রমণীয় মৌলিক বিশ্বাস আত্মাতে নিহিত আছে, তাহা ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইবে। যাহা হউক, এই সকল বিষয়ে নানা সন্দেহ ও মতভেদ স্বীকার করিয়াও নিশ্চিতরূপেই বলা

যাইতে পারে যে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, জ্ঞাতার অস্তিত্বে বিশ্বাস, সকল অবস্থাতে সকলের পক্ষেই অনতিক্রমণীয়।

আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন একটী সন্দেহাতীত বিশ্বাসের উল্লেখ করিলাম, তেমনই বিষয়ের সহিত, অর্থাৎ জ্ঞাত বস্তুর সহিত, আত্মার সম্বন্ধ বিষয়েও কতিপয় অনতিক্রমণীয় বিশ্বাসের উল্লেখ ও বর্ণনা করিব। আমরা দেখাইব যে সেই বিশ্বাসগুলি আত্মপ্রত্যয়ের সহিত এমন ভাবে জড়িত যে সে গুলিকে আত্মপ্রত্যয় হইতে পৃথক করা যায় না, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইলে সেই সকল বিশ্বাসও পোষণ করিতে হয়, সুতরাং সেই সকল বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়ের অন্তর্গত।

প্রথমতঃ একটী বিশ্বাস এই যে, আমরা যে-কোন বস্তুই জানিনা কেন, প্রত্যেক জ্ঞাত বস্তু অনুক্ষণই আত্মার জ্ঞানে বর্ত্তমান আছে, অর্থাৎ বস্তু সমূহ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইবার সময়ে যেরূপ জ্ঞানের বিষয়রূপে প্রকাশিত হয়, ইন্দ্রিয়-সান্নিধ্যে না থাকিলেও সেরূপ জ্ঞানের বিষয়রূপেই বর্ত্তমান থাকে। আমার সম্মুখস্থ এই টেবিলটী আমি এই মুহূর্ত্তে জানিতেছি, ইহার ব্যাপ্তি, বর্ণ, কঠিনতা, প্রভৃতি অনুভব করিতেছি; নানা গুণযুক্ত এই টেবিল আমার জ্ঞানের বিষয়রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পর মুহূর্ত্তে আমি স্থানান্তরে গেলাম, অর্থাৎ আমার শরীর স্থানান্তরিত হইল, টেবিলটী আমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে ব্যবধানে রহিল। এখন আমাদের বক্তব্য এই যে সম্প্রতি টেবিলটী যে অবস্থায় রহিয়াছে সেই অবস্থায়ও আমি বিশ্বাস করিতেছি যে উহা পূর্ব্বে যেমন আমার জ্ঞানের বিষয়রূপে বর্ত্তমান ছিল, এখনও তেমনই আমার জ্ঞানের বিষয়রূপেই বিদ্যমান আছে। কথাটা আপাততঃ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মরূপে চিন্তা করিলে এই অসঙ্গতিবোধ দূর হইবে। টেবিলটী আমার চক্ষুর ব্যবধানে আছে, স্পর্শেন্দ্রিয়ের ব্যবধানে আছে, ইহাতেই আমরা মনে করি উহা জ্ঞাতৃরূপী আত্মারও ব্যবধানে আছে। শরীর ও আত্মাকে কার্য্যতঃ এক মনে করি, তাহাতেই এরূপ বোধ হয়। কিন্তু আত্মা জ্ঞাতা, ইহা জ্ঞানস্বরূপ, এই কথাটী স্মরণ রাখিয়া ভাবিলে দেখি 'টেবিলটী আছে' এই বিশ্বাসের সহিত 'টেবিলটী আমার জ্ঞানের বিষয়রূপে আছে' এই বিশ্বাসটী অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। দেখি, টেবিলটীর অস্তিত্বে বিশ্বাস

করিতে গিয়া ইহার সাক্ষিরূপী আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছি। ইন্দ্রিয়সান্নিধ্য কালে যে বিশ্বাস করিয়াছিলাম 'টেবিলটী আছে,' তাহার অর্থ ইহাই ছিল,—আর কিছু নহে,—যে 'টেবিলটী জ্ঞানের বিষয়রূপে আছে'। জ্ঞানের বিষয়রূপেই ইহা আমার বিশ্বাসের ব্যাপার হইয়াছিল; জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্ররূপে ইহা আমার চিন্তা বা বিশ্বাসের ব্যাপার হয় নাই, এবং হওয়াও সম্ভবপর নহে। এখনও উহা জ্ঞানের বিষয়রূপেই আমার বিশ্বাসের ব্যাপার হইতেছে; জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্ররূপে হইতেছে না এবং হইতে পারেও না। আমার শরীরকে আমি টেবিল হইতে দূরে ভাবিতে পারিতেছি সন্দেহ নাই, কিন্তু শরীর-সান্নিধ্য কালে যে আত্মার জ্ঞাত বিষয়রূপে টেবিলটী প্রতি-ভাত হইয়াছিল, সেই আত্মাকে কিছুতেই টেবিল হইতে ব্যবহিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। আমি টেবিলটীর সম্বন্ধে যাহাই বিশ্বাস করি না কেন, যথা, টেবিলটী আছে, টেবিলটী নড়িতেছে, টেবিলটী ভাঙ্গিয়া পড়ি-তেছে, টেবিলটী স্থানান্তরিত হইতেছে, ইত্যাদি, সমস্তই আত্মার সাক্ষিত্ব বজায় রাখিয়া বিশ্বাস করিতে হইতেছে, সমস্তই আমার জ্ঞানের বিষয় বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইতেছে। এই বিশ্বাস এবং ইহার পরে অন্য যে সমস্ত বিশ্বাসের উল্লেখ করা যাইতেছে, সেই সমস্ত যুক্তিযুক্ত কি না, এই কথা এখন বিচার্য্য নহে। আত্মার সম্বন্ধে কতিপয় বিশ্বাস অনতিক্রমণীয় কিনা, এই সকল বিশ্বাস জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ভাবে আমাদের অন্যান্য বিশ্বাস ও আমাদের চিন্তাকে নিয়মিত করিতেছে কিনা, ইহাই এখন বিচার্য্য।

জ্ঞাত বিষয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে যাইয়া যদি বাধ্য হইয়াই সাক্ষিরূপী আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হয়, 'জ্ঞাত বিষয় আছে' এই বিশ্বাসের সঙ্গে যদি 'জ্ঞাত বিষয় জ্ঞাতরূপেই আছে, আত্মার জ্ঞানের বিষয়রূপেই আছে', এই বিশ্বাস অনিবার্য্যরূপেই জড়িত থাকে, তবে আর একটী বিশ্বাসের অনতিক্রমণীয়তাও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সেটী এই—'আমার ইন্দ্রিয়-সান্নিধ্যে আসিবার পূর্ব্বেও এই সকল জ্ঞাত বিষয় জ্ঞানের বিষয়রূপে বর্ত্তমান ছিল, আমি যাহাকে আমার আত্মা বলিতেছি, সেই আত্মারই জ্ঞানের বিষয়রূপে বর্ত্তমান ছিল।' এই উক্তিটী আপাততঃ পূর্ব্ব উক্তিটী অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসটীকে

যদি পাঠক অনতিক্রমণীয় বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, তবে ইটীর অনতিক্রমণীয়তা বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। ভাবিয়া দেখুন, জ্ঞান-ক্রিয়ার সময় আমরা বিষয়গুলির যে পরিচয় পাই, বিষয় গুলিকে যে লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া জানি, সেই পরিচয়, সেই লক্ষণ, ঠিক রাখিতে গেলে উল্লিখিত বিশ্বাসই ধরিয়া থাকিতে হয় কি না। জ্ঞানক্রিয়ার সময় আমরা বিষয়ের কি পরিচয় পাই? এই পরিচয় পাই যে বিষয় আত্মার জ্ঞানের বিষয়,—দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, শ্রুত ইত্যাদি। জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-বাচক এই পরিচয় ছাড়া বিষয়ের আর কোন পরিচয় আমরা পাই না। 'জ্ঞাত বিষয় সমূহ আমাদের ইন্দ্রিয়-সান্নিধ্যে আসিবার পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল', ইহা যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তবে বাধ্য হইয়া ইহাই ভাবিতে হয় যে বিষয়গুলি এখন যাহা, তখনও তাহাই ছিল, অর্থাৎ এখন যেমন ইহারা জ্ঞানের বিষয়, তখনও তেমনি জ্ঞানের বিষয়ই ছিল। বিষয়ের অবান্তর পরিবর্ত্তন সম্ভব বটে, কিন্তু এরূপ আমূল পরিবর্ত্তন কখনও সম্ভব নহে যে যাহাকে আমরা জ্ঞানের বিষয় বলিয়া জানি তাহা জ্ঞানের অবিষয় হইয়া গেল। জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের অবিষয় হইলে আর সেই বস্তু থাকে না। ফলতঃ 'জ্ঞানের বিষয় যাহা, তাহা জ্ঞানের অবিষয়রূপে বর্ত্তমান আছে,' এটা একটা কথার কথা মাত্র, এই কথার কথাতে কোন অর্থ, কোন বিশ্বাস বা চিন্তা, প্রকাশ করিতেছে না। আপনারা নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিয়া দেখুন, দেখিবেন, যে 'আমার জ্ঞাত বিষয়গুলি আমার ইন্দ্রিয়-সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল,' ইহা বিশ্বাস করিতে গেলে অনিবার্য্যরূপেই বিশ্বাস করিতে হয় যে 'বিষয়গুলি আমার জ্ঞানেই বর্ত্তমান ছিল, আমি যাহাকে আমার আত্মা বলি, সেই আত্মাই বিষয়গুলির সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান ছিল'। আমরা যে বিশ্বাস করি যে, 'সেই সময় আমি ছিলাম না,' সে কেবল এই অর্থে যে 'আমার শরীর, আমার ইন্দ্রিয়সমূহ, সেই সময় বর্ত্তমান ছিল না'। কিন্তু যে আত্মাকে এখন বিষয়ের সাক্ষী বলিয়া জানিতেছি, সেই আত্মাকে সাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান না করিয়া সেই সময়কার কথা কিছুই বিশ্বাস করিতে পারি না।

এখন আত্মার সম্বন্ধে আর একটি বিশ্বাসের আলোচনা করা যাক্। সেই বিশ্বাসটীও উল্লেখকালে আপাততঃ অতীব বিস্ময়কর, কিন্তু বিস্ময়কত্বর

সত্ত্বেও অনতিক্রমণীয়। সেটি এই যে 'যাহা আমার ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই, এবং ভবিষ্যতে না হইতেও পারে, অথচ যাহা আছে, তাহা জ্ঞানেই বর্ত্তমান আছে,—যাহাকে আমার আত্মা বলি, সেই আত্মার জ্ঞানেই বর্ত্তমান আছে।' হিমালয় পর্ব্বত কখনও আমার ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই, এবং হয়ত কখনও হইবে না, অথচ ইহা আছে। আমি যে 'ইহা আছে' বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই বিশ্বাসের সহিত এই বিশ্বাস অনিবার্য্যরূপে জড়িত যে 'আমি হিমালয়ের সাক্ষী—সেই মহত্ত্ব শীতলত্বাদি বিচিত্র গুণযুক্ত বিষয়ের সাক্ষী'। কেবল আমার জ্ঞানের বিষয়রূপেই সেই বস্তু আমার বিশ্বাসের বিষয়ীভূত হইতে পারে। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে এখন আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। শরীর ও ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিয়া মনে করা, অথবা আত্মাকে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সহিত জড়িত একটা ক্ষুদ্র বস্তু বলিয়া মনে করাতেই সহসা বোধ হয় না যে আমাদের সমুদায় বিশ্বাসের মূলে আত্মার সর্ব্বসাক্ষিত্বে বিশ্বাস অপরিহার্য্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু শরীর যদি আত্মা না হয়, ইন্দ্রিয় যদি আত্মা না হয়, জ্ঞাতাই যদি আত্মা হয়, জ্ঞাতৃত্বই যদি আত্মার মূলস্বরূপ হয়, তবে ভাবিয়া দেখুন, প্রত্যেক বিষয়-প্রত্যয়ের মূলে, প্রত্যেক বিষয়-প্রত্যয়ের সহিত অনিবার্য্যরূপে, আত্ম-প্রত্যয় জড়িত রহিয়াছে কি না। পুনরায় বলি, এই বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত কি না এই প্রশ্ন সম্প্রতি আমাদের বিবেচ্য নহে, এই বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে নিহিত রহিয়াছে কি না, ইহাই বিবেচ্য। ইন্দ্রিয়ের অসাক্ষাৎ বিষয়কেও আমি 'আমার জ্ঞানাশ্রিত' বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হই, এই কথা সত্য কি না, ইহাই বিবেচ্য।

আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিলাম যে ইন্দ্রিয়ের সন্নিহিত বস্তুকে আমরা যেমন জ্ঞানের বিষয় বলিয়া বিশ্বাস করি, ইন্দ্রিয় হইতে ব্যবহিত বস্তুকেও তেমনই জ্ঞানের বিষয় বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই, সেই বিষয় ইন্দ্রিয়-সন্নিধানে কখনও আসিয়া থাকুক্ আর নাই থাকুক্, ইন্দ্রিয় সন্নিধানে তাহার আসা সম্ভব হউক আর নাই হউক। এখন, আর একটি বিশ্বাস, যাহা পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাস সমূহের সঙ্গে সঙ্গেই অস্ফুটভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই বিশ্বাসটীর অতিক্রমণীয়তা আরও স্পষ্টরূপে দেখাইতে চেষ্টা করিব। সেই বিশ্বাসটী এই যে, সমুদায় দেশ, সমুদায় কাল, একই আত্মার জ্ঞানে বর্ত্তমান। সন্দেহ

নাই যে এই বিশ্বাস সহসা অনতিক্রমণীয় বলিয়া বোধ হয় না, বরং বিপরীত বিশ্বাসকে, আত্মার বহুত্বে বিশ্বাসকেই, অনতিক্রমণীয় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বিশেষ ধীরভাবে ভাবে চিন্তা করিয়া দেখা যাক্ আত্মার মৌলিক একত্বে বিশ্বাস অনতিক্রমণীয় কি না। প্রথমতঃ দেখুন্, যাহাকে প্রত্যেকে নিজ আত্মা বলিতেছেন, যাহা প্রত্যেকের ইন্দ্রিয়-সম্মুখস্থ সমুদায় বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতেছে, তাহাকে প্রত্যক্ষীভূত সমুদায় বস্তুর সাক্ষী বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছেন কি না। ক্রমশঃ অধিকতর বস্তুর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখুন্ সেই সমস্ত বস্তুকেও এই নিজ আত্মারই বিষয়রূপে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছেন কি না। তৎপরে এই গৃহের বহিরস্থ বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ বা বিষয়সমূহ চিন্তা করিয়া দেখুন্, এই গৃহস্থ বিষয়সমূহ এবং বাহিরের বিষয়সমূহকে প্রত্যেকে সেই একই আত্মার বিষয়রূপে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছেন কি না। 'এই দুইস্থানের বিষয়-সমূহের মধ্যে দেশগত যোগ আছে,' ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছি। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন্, 'উভয় স্থানের বিষয়সমূহ একই আত্মার জ্ঞানগোচর' ইহা বিশ্বাস না করিয়া কেহ ইহাদের দেশগত যোগ মানিতে পারিতেছেন না। দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সংযোগের মূলে এক অখণ্ড জ্ঞান মানিতে হইতেছে। আত্মার একত্বপ্রত্যয় পরিহার করিলে দেশের একত্বপ্রত্যয়ও অসম্ভব হইতেছে। কিন্তু দেশের একত্বে বিশ্বাস অনতিক্রমণীয়। 'দুটা বা ততোধিক দেশ আছে, তাহাদের মধ্যে কোন যোগ নাই, একটার সীমা হইতে আর একটা আরম্ভ হয় নাই,' এরূপ বিশ্বাস অসম্ভব। দেশের একত্বে বিশ্বাস যদি অনতিক্রমণীয় হয়, তবে দেশের সাক্ষিরূপী আত্মার একত্বে বিশ্বাসও অনতিক্রমণীয়। এইরূপে দেশের প্রত্যেক অংশকে, শরীরের নিকটস্থ ও দূরস্থ প্রত্যেক দেশাংশকে, আমরা এক অখণ্ড আত্মার—যাহাকে নিজ আত্মা বলি সেই আত্মারই—জ্ঞানে বর্ত্তমান বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই। দেশ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, কাল সম্বন্ধে তাহার প্রত্যেক কথাই খাটে, সুতরাং সে বিষয় বিস্তৃতভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। এই স্থান যেমন দূরস্থ ও নিকটস্থ সকল স্থানের সহিতই সংযুক্ত, এই কালও তেমনই অতীত ও ভবিষ্যৎ সমুদায় কালের সহিত

সংযুক্ত, আর এই সংযোগের মূলে জ্ঞানের একতা। জ্ঞানের একতায় বিশ্বাস না করিয়া আমরা এই কালগত একতায় বিশ্বাস করিতে পারি না। 'ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘটনাসমূহ পূর্ব্বপরত্ব ও সমকালত্ব সম্বন্ধে সম্বদ্ধ,' এই বিশ্বাস পোষণ করিতে হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই কালত্রয়ে সংঘটিত ঘটনাসমূহের সাক্ষিরূপে এক অখণ্ড জ্ঞাতৃরূপী আত্মাকে দণ্ডায়মান করাইতে হয়। দেশভেদে, বস্তুভেদে ঘটনা-প্রবাহ ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে, সন্দেহ নাই, যথা,—এখানে বৃষ্টিরূপ একটি ঘটনা-প্রবাহ, ওখানে অগ্নিকাণ্ডরূপ আর একটি ঘটনা-প্রবাহ, ইত্যাদি। কিন্তু, একেত সমুদায় দেশ, সমুদায় বস্তুই আমরা এক জ্ঞানের আশ্রিত বলিয়া বিশ্বাস করি, তার পর, ঘটনা-প্রবাহ যত কেন ভিন্ন হউক না, সমুদায়ই সমকালত্ব ও পূর্ব্ব-পরত্ব সম্বন্ধে আবদ্ধ। ঘটনা-প্রবাহসমূহ হয় সমকালে সংঘটিত, অথবা একে অন্যের পূর্ব্বে বা পরে সংঘটিত। এই সমকালত্ব ও পূর্ব্বপরত্ব বিশ্বাস করিতে গিয়া অপরিহার্য্যরূপেই জ্ঞানের একত্বে বিশ্বাস করিতে হয়। সুতরাং দেখা গেল, সমুদায় দেশে, সমুদায় কালে, আমরা অনতিক্রমণীয়রূপে এক অখণ্ড সাক্ষিরূপী আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আর, সেই আত্মা কোন অনির্দ্দেশ্য বা অনুমান-গোচর পরোক্ষ আত্মা নহেন, প্রত্যেকে যাঁহাকে নিজ আত্মা বলিয়া সাক্ষাৎভাবে জানি, ইনিই সেই আত্মা। "এতদ্ বৈ তৎ"। সত্য বটে যে বিশেষরূপে চিন্তা না করিলে এই আত্মপ্রত্যয়কে স্পষ্টরূপে ধরিতে পারা যায় না, কিন্তু জ্ঞাতভাবে হউক বা অজ্ঞাতভাবেই হউক, ইহা মানবের সমুদায় বিশ্বাসের মূলে বর্ত্তমান থাকিয়া সেই সকল বিশ্বাসকে নিয়মিত করিতেছে, সম্ভব করিতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

উপর্য্যুক্ত মীমাংসা সম্বন্ধে একটি আপত্তি অতি সহজেই উঠিতেছে একাত্মপ্রত্যয়ই যদি আত্মপ্রত্যয়ের মৌলিক আকার হয়, তবে 'আমি জানিতেছি,' 'তুমি জানিতেছ', 'তিনি জানিতেছেন'—এই যে আত্মগত বিভাগ, ইহার অর্থ কি? এই ভেদপ্রত্যয় কি অনতিক্রমণীয় নহে? আর ইহা যদি অনতিক্রমণীয় হয়, তবে একাত্মপ্রত্যয়ের অনতিক্রমণীয়তা কোথায় থাকে? আমাদের ভাবনা যখন পৃথক্ পৃথক্, তখন 'একই আত্মা সকলের আত্মপ্রত্যয়ের বিষয়', ইহা কিরূপে বলিব?

আমরা এই আপত্তির উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেছি। একাত্মপ্রত্যয়ের ভিতরে যদি ব্যক্তিগত ভেদপ্রত্যয়ের স্থান না থাকে, তবে সে একাত্ম-প্রত্যয় মূল প্রত্যয় নহে, ইহা নিশ্চয়। একাত্মপ্রত্যয়ের অর্থ যদি এই হয় যে 'আমি' 'তুমি' ও 'তিনি' ঠিক একই বস্তু, কোন ভেদ নাই, তবে ইহা ঠিক যে, হয় একাত্মপ্রত্যয়কে পরিহার করিতে হইবে, না হয় এই ভেদবুদ্ধিকে পরিহার করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে এই উভয় প্রত্যয়ই মৌলিক, একে অন্যের বিরুদ্ধ নহে। 'আত্মা' কথাটা সর্ব্বদা ঠিক এক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। আত্মার কেবল জ্ঞাতৃত্বের দিক্ দেখিলে, আত্মার শুদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাকে অদ্বিতীয় অসীম ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। কিন্তু ইহাকে বিশেষ বিশেষ জ্ঞেয় বস্তুর সহিত এক করিয়া ভাবিলে, অর্থাৎ ইহার জ্ঞাতৃত্বের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞেয়ত্ব মিশ্রিত করিলে, জ্ঞেয় বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগানুসারে ইহার মধ্যেও প্রকারান্তরে বিভাগ আসিয়া পড়ে, এবং এই ভাবে দেখিতে গেলে ইহাকে বহু ও ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটা স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিব। "আমার চক্ষুর সম্মুখস্থ বস্তুগুলি যে জ্ঞাতার জ্ঞানাশ্রিত, আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী বস্তুগুলি, এবং এমন কি আমার ইন্দ্রিয়ের অতীত স্থানবর্ত্তী বস্তুগুলিও সেই জ্ঞাতারই জ্ঞানাশ্রিত", এই বিশ্বাস অনতিক্রমণীয়, সন্দেহ নাই; এবং এই ভাবে দেখিতে গেলে, শুদ্ধ জ্ঞাতৃত্বের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, "আমি ও বিশ্বাত্মা একই, অর্থাৎ যে আত্মা আমার আত্মারূপে, 'আমি' রূপে, প্রকাশ পাইতেছেন তিনিই সর্ব্বত্র আত্মরূপে প্রকাশিত," এই বিশ্বাস মৌলিক ও অনতিক্রমণীয়। কিন্তু আত্মাকে কেবল জ্ঞাতৃরূপে না দেখিয়া যদি ইহাকে সম্মুখস্থ বস্তু সমূহের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে এক করিয়া দেখি, যদি ইহাকে কেবল সম্মুখস্থিত বস্তু সমূহেরই জ্ঞাতৃরূপে চিন্তা করি, এবং ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিয়াও যদি ইহাকে কতিপয় বিশেষ বিশেষ চিন্তার চিন্তাকারী বলিয়াই আলোচনা করি, কতিপয় বিশেষ বিশেষ সুখ দুঃখের অনুভবকারী বলিয়াই চিন্তা করি, যদি অন্যান্য বস্তু, অন্যান্য চিন্তা এবং অন্যান্য সুখ দুঃখকে ইহার আশ্রিত বলিয়া মনে না করি, তবে, এই বিশেষ বিশেষ বিষয়-সংশ্লিষ্ট আত্মাকে অবশ্যম্ভাবিরূপেই সসীম বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়, এবং অন্যান্য বিষয়সমষ্টি-সংশ্লিষ্ট আত্মাকে ইহা

হইতে ভিন্ন বলিয়া ভাবিতে হয়। কিন্তু এই ভেদপ্রত্যয়ে আত্মার মৌলিক সর্ব্বব্যাপিত্ব ও একত্ব বিষয়ক প্রত্যয়ে আঘাত পড়ে না। যেমন সর্ব্ববিষয়-সাক্ষী আত্মার একত্বে বিশ্বাস করিয়াও আমরা সেই অদ্বিতীয় আত্মার জ্ঞানাশ্রিত অসংখ্য বিষয় ও বিষয়সমষ্টিতে বিশ্বাস করিতেছি, তেমনই সেই আত্মার একত্ব বজায় রাখিয়াই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়-সমষ্টির সহিত সেই অদ্বিতীয় আত্মারই আংশিক একীকরণ-জনিত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়িতেও বিশ্বাস করিতেছি। যাহা হউক দেখা যাইতেছে যে মূল বিভাগ বিষয়গত, আত্মগত নহে। বিশেষ বিশেষ বিষয়-সমষ্টির সহিত আত্মার একীকরণ এবং অন্যান্য বিষয়-সমষ্টিও ঘটনাশ্রেণী হইতে ইহার ভিন্নীকরণ বশতঃই আত্মার বিভাগ প্রতীত হয়। কতিপয় বিশেষ বিশেষ চিন্তাভাবাদির সহিত সাক্ষিরূপী আত্মাকে একীকৃত করিয়া সেই জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের মিশ্রণকে 'আমি' বলিতেছি। আবার অন্য কতিপয় চিন্তা ভাবরূপ উপাধিযুক্ত আত্মাকে এইরূপে 'তুমি' বলিতেছি। 'আমি' ও 'তুমি' যখন এইরূপে বিষয়ের ভিন্নতায় পরস্পর ভিন্ন, তখন 'আমি' আর 'তুমি' কখনও এক হইতে পারি না। পাঠক সাবহিত হইয়া ভাবিয়া দেখুন 'আমি' ও 'তুমি'র ভিন্নতার ভিতরে এই বিষয়গত ভিন্নতাই রহিয়াছে কি না। আমরা যখনই নিজ আত্মাকে অন্য আত্মা হইতে পৃথক করিয়া ভাবি ও বিশ্বাস করি, তখন ইহাকে অবশ্যম্ভাবিরূপেই বিশেষ বিশেষ চিন্তাদি বিষয়সমষ্টির সহিত এক করি, এবং অন্যান্য বিষয়সমষ্টি হইতে পৃথক্ করি। অপর দিকে সমুদায় বিষয় ও ঘটনাকে একই আত্মার সাক্ষিত্বাধীন না ভাবিয়াও থাকিতে পারি না, অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনান্তর্গত বিষয়সমষ্টির সাক্ষী জ্ঞানকেই সর্ব্ববিষয়-সাক্ষী বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হই। আত্মার একত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্বে বিশ্বাসকে আমরা মৌলিক আত্মপ্রত্যয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি; সম্প্রতি বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্পর্কে আত্মার যে ভেদ প্রত্যয়ের উল্লেখ করা হইল ইহাকে ব্যক্তিগত অহংকার বা অভিমান বলা যাইতে পারে। এই অহংকার বা অভিমান যখন বিশেষ বিশেষ বিষয়-সমষ্টি যোগেই প্রকাশিত হয়, তখন ইহাকে একপ্রকার সূক্ষ্ম বিষয় বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। ইহা যখন বিষয়, তখন ইহার সহিত বিশেষ বিশেষ দেশ ও কালের সম্বন্ধ আছে, এবং ইহা বহুসংখ্যক। আরো

অন্যান্য বিষয় যেমন আমাদের মূল আত্মপ্রত্যয়ানুসারে এক অখণ্ড আত্মার বিষয়ীভূত, এই সকল অভিমানরূপী সূক্ষ্ম বিষয়ও তেমনই সেই একই অখণ্ড আত্মার বিষয়ীভূত। যাহা হউক, এখন পূর্ব্বোক্ত আপত্তির উত্তর এই দাড়াইতেছে;—"আমি জানিতেছি" ইহার অর্থ—কতিপয় বিষয় একটী অহংকারাশ্রিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। "আমি এই বিষয়টী জানিতেছি", ইহার অর্থ—এই বিষয়টী সেই অহংকারাশ্রিত বিষয়সমষ্টির অঙ্গীভূত হইতেছে। "তুমি জানিতেছ" ইহার অর্থ—কতিপয় বিষয় আর একটী অহংকারাশ্রিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, ইত্যাদি। ব্যক্তিগত ভাবনা পৃথক পৃথক হওয়াতেও মূল আত্মপ্রত্যয়-গোচর আত্মা পৃথক পৃথক হইতেছেন না; সকলের ভাবনা একই আত্মার সাক্ষ্য দিতেছে। আমরা যে বলিতেছি যে আত্মা সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালব্যাপী, তাহা ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধ অহংকার সম্বন্ধে বলিতেছি না, এই অহংকারের মূলে এক সীমাতীত বস্তুর পরিচয় পাইয়া তাহারই সম্বন্ধে এই কথা বলিতেছি। প্রত্যেক অহংকারের মূলে স্পষ্টরূপেই হউক আর অস্পষ্টরূপেই হউক সেই এক সর্ব্বব্যাপী আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন।

এখন পুনরায় মূল আলোচনার অনুসরণ করা যাক্। যে মীমাংসায় উপনীত হওয়া গিয়াছে সেটী সংক্ষেপে উল্লেখ করি। আমাদের সমুদায় প্রত্যয়ের মূলে এক অখণ্ড সর্ব্বসাক্ষী আত্মার সম্বন্ধীয় প্রত্যয় বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাতেই হউক আর অসাক্ষাতেই হউক, ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, যে কালেই হউক, যে কোন বিষয় আমাদের বিশ্বাসের বিষয়ীভূত হউক, সমুদায়কেই আমরা এক অখণ্ড আত্মার জ্ঞানাশ্রিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই, অর্থাৎ যাঁহাকে আমরা প্রত্যেকে নিজ আত্মা বলি সেই আত্মারই জ্ঞানাশ্রিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই। উপর্য্যুক্ত আপত্তি খণ্ডন করিতে যাইয়া আমরা আরো দেখিলাম যে সেই অদ্বিতীয় অভেদ আত্মার সম্বন্ধীয় প্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত অহংকার-জনিত একটি ভেদপ্রত্যয় আছে। মূল বিশ্বাসের রাজ্যে পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধ কি, আমরা এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত পাইতেছি। আত্মাকে সর্ব্বজ্ঞরূপে দেখিলেই তিনি পরমাত্মা, আত্মা বিশেষ বিশেষ বিষয়সমষ্টির যোগে অভি-

মানাশ্রিত হইয়া প্রতিভাত হইলেই তিনি জীবাত্মা। যাহা হউক জীবও পরমের সম্বন্ধ তত্ত্বের ইহা একটী ক্ষুদ্র কণিকা মাত্র।

বিষয় ও বিষয়ীর সম্বন্ধ বিষয়ে আমাদের হৃদয়ে কিরূপ আত্মপ্রত্যয় নিহিত আছে, তাহা দেখা গেল। মানবের ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা আলোচনা করিলে আত্মপ্রত্যয়ের আর একটী মহাপ্রদেশ, উপর্য্যুক্ত প্রদেশাপেক্ষা বরং মধুরতর একটী প্রদেশ, আবিষ্কৃত হয়। সময়াভাবে এই বিষয় অতি সংক্ষেপে বলিব। ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে অবান্তর প্রভেদ যতই থাকুক, ধর্ম্মাধর্ম্মের অস্তিত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহাদিগকে অনধিক আয়াসেই দেখান যায় যে আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ক প্রত্যেক প্রত্যয়ের মূলে এক পূর্ণমঙ্গলময় পূর্ণপবিত্রস্বরূপ পুরুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় একটী অনতিক্রমণীয় প্রত্যয় নিহিত রহিয়াছে। মানবের শিক্ষা, সভ্যতা, দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে মঙ্গলের ভাব অনেক পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যেখানেই পরিবার, যেখানেই সমাজ, যেখানেই জীব ব্যক্তিগত সুখদুঃখানুভবে আবদ্ধ না থাকিয়া কিছু না কিছু পরিমাণে সমবেত জীবন অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছে, কেবল প্রাকৃত বাসনার উত্তেজনায় কার্য্যে প্রবৃত্ত না থাকিয়া বাঞ্ছনীয় কোন বস্তুর আদর্শ গড়িতে সমর্থ হইয়াছে, সেখানেই কোন না কোন আকারে মঙ্গলের ভাব, পবিত্রতার ভাব, বর্ত্তমান। অসভ্য অশিক্ষিত গৃহস্থ পরিবারবর্গের অন্ন সংস্থান মাত্রকেই মঙ্গল মনে করে। অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত পিতামাতা সন্তানবর্গের সুখসচ্ছন্দতা সাধনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান শিষ্টাচার ও ন্যায় ব্যবহার শিক্ষা দিতে পারিলেই কৃতকৃতার্থতা বোধ করেন। ধর্ম্মগত জীবন সাধক নিজ জীবনে সত্য, ন্যায় ও প্রেমের আধিপত্য স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হন না। জ্ঞানী সত্যের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত অপরিতৃপ্ত। প্রেমিক ভক্তের মতে প্রেমে চিরনিমগ্ন না হইলে পরম শ্রেয়োলাভ হইল না। নানা শ্রেণীর নরহিতৈষীগণ মানব সমাজে শৃঙ্খলা, সুখস্বচ্ছন্দতা, ন্যায় ও প্রীতি সংস্থাপনকেই পরম শ্রেয়ঃ মনে করেন। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের ভিতর দিয়া এক পূর্ণমঙ্গলময় পুরুষ প্রকাশ পাইতেছেন। অসভ্য অশিক্ষিত গৃহস্থ পরিবারবর্গের সম্বন্ধে মঙ্গলকাম হইয়া হয়ত ইহা বুঝিতে পারে না যে

সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেছে। কিন্তু সে যে তাহার নিজ হৃদয়ের মঙ্গল-কামনায় বিশ্বাস করে, তাহার আত্মরূপী এক মঙ্গলকাম পুরুষের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তাহার এই আত্মপ্রত্যয় মূলে ঈশ্বর-বিশ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নহে, কেননা জগদাত্মাই তাঁহাতে মঙ্গলকাম আত্মা রূপে আবির্ভূত। সুশিক্ষিত পিতামাতার যে সন্তানগণ সম্বন্ধে উচ্চতর মঙ্গলকামনা, তাহার ভিতরেও তেমনি মঙ্গলময় শুদ্ধসঙ্কল্প আত্মায় বিশ্বাস নিহিত রহিয়াছে। তাঁহাদের সাক্ষাৎ অনুভূত মঙ্গলাদর্শ অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শের ধারণা হয়ত তাঁহাদের নাই, এবং তাঁহাদের বুদ্ধিতে ঈশ্বর-বিশ্বাস সজ্ঞানভাবে না থাকিতেও পারে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের নিজ পবিত্র সংকল্পে বিশ্বাস, অর্থাৎ পবিত্র-সংকল্প আত্মায় বিশ্বাস, না করিয়া থাকিতে পারেন না, এবং এই বিশ্বাস মূলে মঙ্গলময় আত্মায় বিশ্বাস, মঙ্গলময় ঈশ্বরে বিশ্বাস, ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিশ্বাত্মাই তাঁহাদের মধ্যে মঙ্গলকাম হইয়া আবির্ভূত। তেমনই, ধর্ম্ম-সাধক যে নিজ জীবনে সত্য, ন্যায় ও প্রেমের আধিপত্য স্থাপনের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করেন, এই বিশ্বাস বস্তুতঃ সত্য ন্যায় ও প্রেমময় ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি যে অহরহ সত্য ন্যায় ও প্রেমের আদর্শ ধ্যান করেন ও আয়ত্তীকরণের আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই আদর্শে বিশ্বাস করিতে যাইয়া তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই তাঁহার আত্মরূপী এক সত্যসঙ্কল্প ন্যায়বান ও প্রেমিক পুরুষে বিশ্বাস করিতে হয়, কারণ আত্মাকে ছাড়িয়া নিরবলম্ব সত্য সঙ্কল্প, ন্যায় ও প্রেমের ভাবনা অসম্ভব এবং অর্থহীন। অবশ্য তিনি মনে করেন যে সত্য ন্যায় ও প্রেম তাহার জীবনে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয় নাই, কিন্তু ইহার অর্থ কেবল এই যে সেই সত্য ন্যায় ও প্রেম-মূর্ত্তিমান পুরুষ সকল সময়ে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে প্রকাশ পান না, তাঁহার অহংকারাশ্রিত চিন্তা কার্য্যাদির যোগে প্রতিভাত হন না, কিন্তু ইহাতে সেই পবিত্র পুরুষের অস্তিত্বে বিশ্বাস বিনষ্ট হয় না। যেমন আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানে সকল সময়ে সকল বস্তু প্রকাশিত না থাকিলেও আমাদের সর্ব্বসাক্ষী পরমাত্মায় বিশ্বাস বিনষ্ট হয় না, জ্ঞাতভাবে হউক অজ্ঞাতভাবে হউক সর্ব্বদা ইহা আমাদের সমুদায় বিষয়-প্রত্যয়কে নিয়মিত করে, তেমনই ব্যক্তিগত জীবনে সত্য ন্যায় ও প্রেমময় পরমাত্মার প্রকাশ সকল সময় অব্যাহত না

থাকিলেও এই বিশ্বাস জ্ঞাতভাবে হউক অজ্ঞাতভাবে হউক আমাদের সমুদায় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতাকে নিয়মিত করিতেছে। সম্পূর্ণরূপে নিস্বার্থ, নির্ম্মল নিজ চিন্তা-পরিত্যাগী পরহিতৈষীর চিত্তে যে মঙ্গলময় শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমাত্মপ্রত্যয় আরো উজ্জ্বল, সে বিষয়ে আর বিশেষভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন। যে বুদ্ধভাবাপন্ন ধর্ম্মসাধক নিজ নির্ম্মল পরম সুন্দর প্রেমময় আত্মায় বিশ্বাস করেন, অথচ বলেন তিনি জগৎকর্ত্তার বিষয় কিছুই জানেন না, তাঁহাকে জগৎ নাস্তিক বলিতে পারে, এবং বাস্তবিক তিনি ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতাদি স্বরূপে স্পষ্ট বিশ্বাসী না হইতেও পারেন, কিন্তু তিনি যে মঙ্গলময় শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমাত্মায় বিশ্বাসী, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের দার্শনিক স্বরূপ ধর্ম্মাভিজ্ঞতা-মূলক আত্মপ্রত্যয়ের বিষয়ীভূত নহে, তাহা বিষয়-বিষয়ী-ঘটিত আত্মপ্রত্যয়গোচর। যাহা হউক, আমাদের ধর্ম্ম জীবনের কেবল সুখময় অভিজ্ঞতা নহে, দুঃখময় অভিজ্ঞতা সমূহও উপর্য্যুক্ত আত্মপ্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মার মৌলিক নির্ম্মলত্বে বিশ্বাস থাকাতেই আমাদের আত্ম-গ্লানি সম্ভব হয়। আত্মার নির্ম্মলাবস্থার সহিত সমলাবস্থার প্রভেদ না দেখিলে আত্মগ্লানি সম্ভব হইত না। ঘৃণা বিদ্বেষের মূলেও শুদ্ধাত্ম-বিষয়ক প্রত্যয়ই বর্ত্তমান। আত্মা যে মঙ্গলাদর্শ লইয়া প্রকাশিত হন, অন্যের জীবনে তাহার বিরুদ্ধ ভাব দেখিলেই ঘৃণা বিদ্বেষের উদয় হয়। প্রাকৃতিক কার্য্যে আপাতত-অমঙ্গলকর ঘটনা দেখিলে অল্প বিশ্বাসী ব্যক্তির হৃদয়ে যে সন্দেহের উদয় হয়, এমন কি জগৎকর্ত্তার উপর যে ক্রোধ ও বিদ্রোহভাবের সঞ্চার হয়, তাহাতেও বাস্তবিক প্রকারান্তরে মঙ্গলসংকল্প জীবহিতাকাঙ্ক্ষী পরমাত্মার সম্বন্ধীয় প্রত্যয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ হৃদয়ে প্রকাশিত ন্যায় ও প্রেমের সহিত ঐ সকল ঘটনার আপাত-অসামঞ্জস্য দেখিয়াই ঐরূপ সন্দেহ ও বিদ্রোহভাবের উদ্রেক হয়। ঘটনাগুলি বাস্তবিক কিছুই প্রমাণ করে না, বাহ্য ঘটনাতে কর্ত্তার হৃদয়ের ভাব নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। কিন্তু সহৃদয় প্রেমিকের হৃদয়ের ঐ যে ভীষণ ক্লেশ ও আন্দোলন, তাহাতে আত্মার শুদ্ধতায় ও মঙ্গলভাবে বিশ্বাস স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। বুদ্ধিগত ভ্রমের ভিতর দিয়াও আত্মা সেখানে শুদ্ধ ও প্রেমিকরূপেই প্রকাশিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নাস্তিকের আত্মপ্রত্যয়েও অতর্কিতভাবে পরমাত্মপ্রত্যয়—

শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরম পুরুষে বিশ্বাস—নিহিত রহিয়াছে।

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ব্রহ্মে বিশ্বাস অনতিক্রমণীয়, ইহা অন্য সমুদায় বিশ্বাস ও চিন্তার সহিত অপরিহার্য্যরূপে জড়িত, ইহাই এই পর্য্যন্ত দেখান হইল। এখন বিবেচ্য এই যে এই আত্মপ্রত্যয় কতদূর জ্ঞান-সম্মত, ইহা কতদূর যুক্তিযুক্ত। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এই বিষয়ে সম্প্রতি অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

প্রথম কথা এই যে, যে বিশ্বাস অনতিক্রমণীয়, যে বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়-স্বরূপ, সে বিশ্বাসের বিপক্ষে জ্ঞানের কিছু বলিবার অধিকারও নাই, ক্ষমতাও নাই। ব্রহ্মপ্রত্যয় যে মৌলিক প্রত্যয়, অপরিহার্য্য অনতিক্রমণীয় প্রত্যয়, ইহা না বুঝাতেই জ্ঞান-ব্যবসায়ীগণ ইহার বিপক্ষে বলিতে গিয়াছেন। এই প্রত্যয়ের মৌলিকতা ও অনতিক্রমণীয়তা বুঝিলে আর ইহার বিপক্ষে কিছু বলিতে প্রবৃত্তি হয় না, কেননা তখন দেখা যায় যে ইহার বিপক্ষে যতই বলা যাউক্‌না কেন, তাহাতে ইহা বিনষ্ট হয় না, আর, বিরুদ্ধপক্ষে যাহা বলিতে যাওয়া যায় তাহাতেও এই বিশ্বাস অপরিহার্য্যরূপে জড়িত থাকে। উদাহরণ প্রদর্শনার্থ আমরা আত্মপ্রত্যয়-বিরোধীর ২।১ টি আপত্তির উল্লেখ করিতেছি। আত্মপ্রত্যয়-বিরোধী বলিতে পারেন যে হয়ত অতি অসভ্য মানবের অন্তরে আত্মপ্রত্যয় ছিলনা, ক্রমশঃ ইহা বিকশিত হইয়াছে। তবে আর ইহাকে মৌলিক বলা হইতেছে কেন, এবং এই প্রত্যয়ের বিষয়রূপী আত্মা বা ব্রহ্মকে ধ্রুব সত্য বলা হইতেছে কেন? এই আপত্তির প্রথম উত্তর এই যে সেই অতি অসভ্য মানবকে যদি জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করা হয়, যদি স্বীকার করা হয় যে সে দেখিত, শুনিত, স্মরণ করিত, বস্তুর ভেদাভেদ বুঝিত মীমাংসা করিত, তবে তাহাতে আত্মপ্রত্যয়ের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইবে, কারণ, আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত এই সকল জ্ঞানক্রিয়া সম্ভব নহে। দ্বিতীয় উত্তর এই যে যদি সেই মানবকে কেবল শরীর সম্বন্ধেই মানব বলা হয়, তাহাকে বুদ্ধিজীবী না বলিয়া কেবল প্রাণীমাত্র বলিয়া মনে করা হয়, অথবা বড় জোর, অসংলগ্ন ইন্দ্রিয়বোধপরম্পরার আধার বলিয়া মনে করা হয়, তাহাতে ও আমাদের মূল সিদ্ধান্তে আঘাত পড়ে না। প্রাণী বিশেষের আত্ম-প্রত্যয় আছে কি না, ছিল কি না ছিল, এই কথার নিষ্পত্তির উপর আমা-

দের মূল সিদ্ধান্ত নির্ভর করে না। জড় ও উদ্ভিদের আত্মপ্রত্যয় নাই, হয়ত কোটী কোটী নিকৃষ্ট জন্তুর আত্মপ্রত্যয় নাই, ইহাতে এই প্রমাণ হয় না যে বিশ্বের আত্মা নাই, এই জগৎ ঈশ্বরশূন্য। দৃষ্টান্তস্থানীয় অসভ্য মানবকে আত্মপ্রত্যয়শূন্য বলিয়া ভাবিলেও তাহার অস্তিত্ব ত ভাবিতে হইবে? যে সকল অভিজ্ঞতাযোগে ক্রমশঃ তাহার আত্মপ্রত্যয় জন্মিল সেই সকল অভিজ্ঞতার রঙ্গভূমি দেশকালগত জগতের অস্তিত্ব ত ভাবিতে হইবে? তবেই আপত্তিকারী ঠেকিয়াছেন। বিষয়ের সাক্ষী না ভাবিয়া বিষয় ভাবা, জ্ঞাতা না ভাবিয়া জ্ঞেয় ভাবা, অসম্ভব। জগতের সেই পুরাতন অবস্থাকে আমরা বর্ত্তমান অবস্থা হইতে যতই ভিন্ন ভাবি না কেন, একজন সাক্ষিরূপী জগদাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া আমরা কোনক্রমেই জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে পারি না। যিনি বলেন জগৎ তখন আত্মশূন্য ছিল, তাঁহাকেও বাধ্য হইয়া জগতের ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে জগদাত্মাকে ভাবিতে হয়, তিনি যদি বুদ্ধির অন্তঃস্থল-নিহিত এই ভাবনাকে ধরিতে না পারেন, তাহাতে ব্রহ্মপ্রত্যয়ের ভিত্তিশূন্যতা প্রকাশ পায় না, তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে নাস্তিক ও সন্দেহবাদী সূক্ষ্ম দর্শনে—চিন্তার সূক্ষ্ম গতি অবধারণে—অক্ষম। ইহা সহজেই বিশ্বাস করা যায় যে প্রথমে সৃষ্ট জীবে আত্মপ্রত্যয় ছিল না, বিশ্বাত্মা তখন জীবের আত্মরূপে প্রকাশিত হইয়া আত্মপরিচয় দেন নাই, অবস্থা-পরম্পরাকে অবলম্বন করিয়া তিনি ক্রমশঃ জীবের আত্মরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। কিন্তু এই কথা কিছুতে বিশ্বাস করা যায় না,—ইহা স্ববিরোধী কথা—জ্ঞানের মূলসূত্র-বিরোধী কথা—যে এমন এক সময় ছিল যখন কোন দ্রষ্টা ছিল না অথচ দৃষ্টির বিষয় ছিল, শ্রোতা ছিল না অথচ শ্রবণের বিষয় ছিল, স্প্রষ্টা ছিল না, অথচ স্পর্শের বিষয় ছিল, ভেদাভেদ বুদ্ধি ছিল না, অথচ ভেদাভেদ বুদ্ধির বিষয়ীভূত বিচিত্র বস্তু ছিল। যাঁহারা ব্রহ্ম-প্রত্যয়কে অজ্ঞানতামূলক বলেন এবং জগৎকে অন্ধশক্তির লীলাভূমি বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহাদের চিন্তা ও চিন্তাপ্রসূত দর্শনশাস্ত্র আদ্যন্ত এইরূপ স্ববিরোধিতা দোষে দূষিত।

এই বিষয়ে আরো অনেক কথা বলিবার আছে, প্রবন্ধান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।
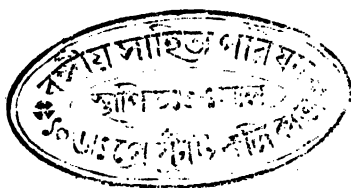
আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান।

আত্মপ্রত্যয়-বিষয়ক প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সার এই :—আত্মপ্রত্যয় সমুদায় প্রত্যয়ের ভিত্তি। আমরা যে কোন বিষয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না কেন, সেই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষয়ের সাক্ষিরূপী আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই। যে আত্মাকে আমরা প্রত্যেকে নিজ আত্মা বলি, সেই আত্মাকেই সমুদায় বিষয়ের সাক্ষী বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই। ইন্দ্রিয়ের সন্নিহিত বিষয় সমূহকে যেমন আত্মার জ্ঞান-গোচর বলিয়া বিশ্বাস করি, তেমনি ইন্দ্রিয় হইতে ব্যবহিত বিষয় সমূহকেও,—যে সকল বিষয় কখনও ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে আসে নাই এবং আসিবে না সেই সকল বিষয়কেও—আত্মার জ্ঞানগোচর বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই। 'ইন্দ্রিয়ের ব্যবহিত হইয়া বিষয় আছে' ইহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি ; কিন্তু 'সাক্ষিরূপী আত্মা নাই, অথচ বিষয় আছে' ইহা আমরা কখনও ভাবিতে পারি না। ভাবিতে পারি বলিয়া যে মনে হয়, ইহার কারণ এই যে এরূপ ভাবনার সময় আমরা শরীরকে বা ইন্দ্রিয়কে আত্মার সহিত এক বলিয়া ভাবি। আত্মার প্রকৃত অর্থ স্মরণ রাখিলে, আত্মা যে জ্ঞাতৃরূপী ইহা স্মরণ রাখিলে, আর উক্ত ভাবনা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। জ্ঞাতা ছাড়া বিষয় আমরা কখনও জানিতে পারি না, ভাবিতেও পারি না। আর, সমুদয় দেশে, সমুদায় কালে, আমরা একই জ্ঞাতা ভাবিতে বাধ্য হই। দেশের সমুদায় অংশকে আমরা পরস্পর সংযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদায় ঘটনাকেও আমরা এক কালসূত্রে সম্বদ্ধ বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হই। দেশ কালের একত্ব সম্বন্ধীয় এই বিশ্বাসের মূলে দেশকালের সাক্ষিরূপী এক অখণ্ড আত্মায় বিশ্বাস নিহিত। 'দেশ এক, কাল এক' এই বিশ্বাসের প্রকৃত অর্থ চিন্তা করিলে দেখা যায়,

ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, ইহার অর্থ এই যে সমুদায় দেশ ও সমুদায় কাল একই অখণ্ড জ্ঞানের বিষয়। কিন্তু এই অখণ্ড জ্ঞান সমুদায় দেশ কালের সাক্ষী হইলেও ইহা বিশেষ বিশেষ বস্তুতে অভিমানাশ্রিত হইয়া বিশেষ বিশেষ দেশ কালে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ কতিপয় বিশেষ বিশেষ চিন্তা ভাবাদির সমষ্টিকে 'এই সমুদায় আমার,' অথবা 'এই চিন্তাসমষ্টি আমি' এইরূপে আপনার সহিত এক করিয়া এই অখণ্ড জ্ঞানবস্তু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরূপে অনুপ্রকাশিত বা প্রতিবিম্বিত হয়। এই সকল চিন্তাদির সমষ্টি যখন পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন, তখন এই সকল সমষ্টিকে আশ্রয় করিয়া মূল আত্মার যে সকল অনুপ্রকাশ বা প্রতিবিম্ব হয়, সেই সকলও পরস্পরও ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং একাত্মপ্রত্যয়ের ভিতরে ব্যক্তিগত আত্মার ভেদ-প্রত্যয়েরও স্থান আছে। 'মূল আত্মা এক, অখণ্ড, সর্ব্ববিষয়-সাক্ষী,' এই বিশ্বাসের সহিত 'আমি, তুমি ও তিনি পরস্পর ভিন্ন' এই বিশ্বাসের অসামঞ্জস্য নাই। তার পর, বিষয়-বিষয়ি-ঘটিত সমুদায় প্রত্যয়ের মূলে যেমন এক, অখণ্ড, অনন্ত জ্ঞানরূপী আত্মার সম্বন্ধীয় প্রত্যয় দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি ধর্ম্মাধর্ম্ম-ঘটিত প্রত্যয় সমূহের মূলে এক শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ আত্মায় বিশ্বাস নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। পরিবারবদ্ধ অসভ্য হইতে বিশ্বপ্রেমিক নরহিতৈষী পর্য্যন্ত, মানবের নৈতিক জীবনের সমস্ত সোপানেই এক ক্রমশঃ বিকাশমান মঙ্গলের আদর্শ মানব-চেষ্টাকে পরিচালিত করিতেছে। সেই মঙ্গলাদর্শকে অনুভব করিতে গিয়া মানব অজ্ঞানে হউক, সজ্ঞানে হউক, এক মঙ্গলরূপী শুদ্ধ আত্মায় বিশ্বাস করিতে বাধ্য হয়। একটী নিরালম্ব আদর্শমাত্র ভাবা মানবের পক্ষে অসম্ভব। সমুদয় মঙ্গলাদর্শ, পবিত্রতার আদর্শ, এক সচেতন আত্মার স্বরূপ রূপেই ভাবা সম্ভব। মানবের আত্মপ্রসাদও সদাকাঙ্ক্ষারূপ সুখময় অভিজ্ঞতাই হউক, আর ঘৃণা, রাগ, অনুতাপ প্রভৃতি দুঃখময় অভিজ্ঞতাই হউক, তাহার সর্ব্ববিধ নৈতিক অভিজ্ঞতার মূলে স্ফুট ভাবে হউক, অস্ফুট ভাবে হউক, এক শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমাত্মায় বিশ্বাস,—অর্থাৎ তাঁহারই আত্মরূপী এক পবিত্র পুরুষে বিশ্বাস—নিহিত রহিয়াছে। এই সত্যং জ্ঞানমনন্তং, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ পরম বস্তু সম্বন্ধীয় বিশ্বাসকে পরিহার করিয়া আমরা বহির্জগৎ ও নৈতিক জগৎ সম্বন্ধে যে-

কোন মত কল্পনা করিতে যাই, দেখান যায় যে সেরূপ প্রত্যেক মত সবিরোধিতা দোষে দূষিত। যে নিরীশ্বরবাদী মনে করেন যে জ্ঞানের বিষয়রূপ এই জগৎ মানবাবির্ভাবের পূর্ব্বে আত্মশূন্য ছিল, তিনি বস্তুতঃ মনে করেন যে দ্রষ্টা ছাড়া দৃষ্ট বিষয় থাকিতে পারে, শ্রোতা, স্প্রষ্টা ও বোদ্ধা ছাড়াও শ্রুত, স্পৃষ্ট ও বুদ্ধ বিষয় থাকিতে পারে ইত্যাদি। যাঁহার নীতিবিজ্ঞানে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মঙ্গলময় পরমাত্মার স্থান নাই, তিনি বস্তুতঃ প্রেমিকশূন্য প্রেম ও পবিত্র আত্মা ভিন্ন পবিত্রতায় বিশ্বাস করেন, অথবা বিশ্বাস করেন বলিয়া মনে করেন। সুতরাং আত্ম-প্রত্যয়কে যাঁহারা ভিত্তিশূন্য প্রত্যয়মাত্র বলিয়া পরিহার করিতে চেষ্টা করেন এবং বিজ্ঞানের মীমাংসাকে উক্ত প্রত্যয়বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বস্তুতঃ এই বিশ্বাসকে অতিক্রম করিতে পারেন না; তাঁহাদের বিজ্ঞান নামধারী মতের ভিতরে এই বিশ্বাস নিহিত থাকিয়া সেই মতের স্ববিরোধিতা সপ্রমাণ করে।

এখন বক্তব্য এই যে, বিশ্বাসের যে কথা জ্ঞানেরও সেই কথা; ব্রহ্ম কেবল বিশ্বাসের বিষয় নহেন, জ্ঞানেরও বিষয়—প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়। ফলতঃ ব্রহ্মপ্রত্যয় ও ব্রহ্মজ্ঞান মূলে একই বস্তু। একই বস্তুকে অস্ফুট অবস্থায় প্রত্যয় এবং স্ফুট অবস্থায় জ্ঞান বলা যায়। ইহা যখন অজ্ঞাতভাবে আমাদের সমুদায় বিশ্বাস ও চিন্তাকে নিয়মিত করে, যখন মানব বুঝিতে পারে না যে ইহা বস্তুতঃই তাহার সমুদায় বিশ্বাসের ভিত্তি, তখন ইহাকে কেবল 'প্রত্যয়' বলা যাইতে পারে। যখন চিন্তার সাহায্যে ব্রহ্মপ্রত্যয়কে সমুদায় প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তখন ইহাকে 'ব্রহ্মজ্ঞান' বলা যায়। যখন আমরা অজ্ঞাতভাবে ব্রহ্মে বিশ্বাস করি তখনও আমরা ব্রহ্মকেই জানি, কিন্তু তখন বুঝিতে পারি না যে ব্রহ্মকেই জানিতেছি, তখন ব্রহ্মকে দেখিয়াও চিনিতে পারি না। যখন ইহা বুঝিতে পারি, যখন জানিতে পারি যে ব্রহ্মকে জানিতেছি, তখন সেই মৌলিক ব্রহ্মপ্রত্যয়ই 'ব্রহ্মজ্ঞান' নামের উপযুক্ত হয়। কিরূপ চিন্তাযোগে হৃদয়-নিহিত ব্রহ্মপ্রত্যয় আবিষ্কৃত হয়,—ইহাকে অনতিক্রমনীয় মৌলিক বিশ্বাস বলিয়া বুঝিতে পারা যায়,—তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে কতকটা দেখান হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহাই আরও বিশেষভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিব। জগতের জ্ঞান ও

আত্মজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে এই উভয়বিধ জ্ঞানের সহিত ব্রহ্মজ্ঞান অপরিহার্য্যরূপে জড়িত,—বস্তুতঃ জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান মূলে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমার হস্তের কাগজ খণ্ডকে জানিতে গিয়া আমি কি জানিতেছি? কাগজ খণ্ড দৈর্ঘ্য প্রস্থাদি বিস্তার যুক্ত, শ্বেত কৃষ্ণাদি বর্ণযুক্ত, কোমলতা প্রস্থণতাদি স্পর্শগুণযুক্ত। ইহাতে লেখা যায়, ইহাকে ছিঁড়িয়া ফেলা যায়, ইহাকে অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করা যায় এবং জলযোগে কর্দ্দমিত করা যায়, ইত্যাদি। কাগজ খণ্ডের এই সমস্ত গুণই জ্ঞাতৃরূপী আত্মার জ্ঞাত বিষয়-রূপে প্রকাশ পাইতেছে, আত্মার সহিত জ্ঞানসূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, স্বাধীন স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ পাইতেছে না। ফলতঃ আত্মার সহিত এই সমুদায়ের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে এই সকল গুণকে যেমন এক অর্থে কাগজের গুণ বলা যায়, আর এক অর্থে তেমনি এই সমুদায়কে আত্মার গুণ বলা যাইতে পারে। এই সকল গুণ না থাকিলে কাগজ কাগজ নয়, এই সকল গুণের প্রকাশ ও সমাবেশ স্থলেই আমরা 'কাগজ' নাম প্রয়োগ করি। এই অর্থে এই গুলি কাগজের গুণ। কিন্তু আর এক দিক্ হইতে দেখুন, যাহার জ্ঞানের বিষয় নাই সে জ্ঞাতা নহে, জ্ঞাতার পক্ষে অবশ্যম্ভাবিরূপেই কতকগুলি জ্ঞানের বিষয় থাকা চাই, এই অর্থে বিষয় বস্তুতঃ বিষয়ীর গুণ। আর, এই অর্থে কাগজের জ্ঞাতা যিনি, কাগজের গুণগুলি বস্তুতঃ তাঁহারই গুণ। তাঁহার জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে কিরূপে, কি ভাবে? না, বিস্তার, বর্ণ, মস্থণতাদি বিষয়-গুণ রূপে। তাঁহাকে এই সকল বিষয়মুক্ত করিলে, এই সকল গুণমুক্ত করিলে, তাঁহার কাগজ-জ্ঞাতৃত্ব থাকে না। ফলতঃ ভাবিয়া দেখুন, বিবিধ গুণযুক্ত কাগজ নামক বিষয়, এবং বিবিধ গুণযুক্ত জ্ঞাতা বা বিষয়ী, এই দুটী বাক্যে আপাততঃ দুটী স্বতন্ত্র বস্তুকে লক্ষ্য করি-তেছে বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু এই স্বতন্ত্রতা-বোধ ভ্রমমূলক। জ্ঞাতার সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলে কাগজের কাগজত্ব থাকে না, বিষয়ের বিষয়ত্ব থাকে না; কাগজের প্রত্যেক গুণই জ্ঞাতার সহিত সম্বন্ধ বুঝায়। আবার, যে গুলিকে কাগজের গুণ বলিতেছি সে গুলি জ্ঞাতার জ্ঞান হইতে সরাইয়া লইলে তিনি আর কাগজের জ্ঞাতা থাকেন না, এবং দেখা যাইবে যে

তাঁহা হইতে সমুদায় বিষয়ের জ্ঞান ও স্মৃতি সরাইয়া লইলে তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব আদতেই থাকে না। তিনি যে আপনাকে জানেন, সেও বিষয়ের জ্ঞাতারূপেই, অন্যরূপে নহে। সুতরাং উজ্জ্বল জ্ঞানের আলোকে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই যে কাগজের জ্ঞানরূপ ব্যাপারটা, এই ব্যাপারটাতে প্রকৃত জ্ঞানগোচর বস্তু একটা স্বতন্ত্র বিষয়ও নহে, একটা নির্বিষয় বিষয়ীও নহে; প্রকৃত জ্ঞানগোচর বস্তু একটা বিচিত্রতাযুক্ত জ্ঞানপদার্থ। ব্যাবহারিক অর্থাৎ কাজ চালাইবার উপযোগী ভাষায় এই জ্ঞানপদার্থের মধ্যে একটা বিষয়ের দিক্ এবং আর একটা বিষয়ের দিক্ স্বীকৃত হয় বটে, কিন্তু একটা দিক্ ছাড়িয়া দিলে যখন আর একটা দিক্ অর্থহীন ও শূন্যময় হইয়া যায়, তখন মূল বস্তু দাঁড়াইতেছে একটা। বিষয় জ্ঞানসাপেক্ষ, বিষয়ীও জ্ঞান-সাপেক্ষ, উভয় দিকেই জ্ঞানের প্রভাব, এবং আত্মা জ্ঞানরূপী, জ্ঞানই আত্মার মূলস্বরূপ, সুতরাং ঐ মূল বস্তুটাকে অসঙ্কোচেই আত্মা বলা যাইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে জ্ঞানকে আমরা চলিত কথায় 'জড়ের জ্ঞান' বা 'জগতের জ্ঞান' বলি, তাহা কেবল চিন্তাবিহীন অমার্জ্জিত বুদ্ধির পক্ষেই 'অনাত্ম বস্তুর জ্ঞান'। ধ্যানোন্মুক্ত চক্ষুর কাছে প্রকৃতপক্ষে তাহা আত্মজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যাহা হউক, আর একটী প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে হয়ত এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দিগ্ধ বলিয়া বোধ হইবে না। সেই প্রশ্নটী এই,—জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানে প্রত্যক্ষভাবে না হউক পরোক্ষভাবে, অনুমান যোগে, আমরা কোন আত্মাতিরিক্ত বস্তুকে জানি কি না?

এই প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানে একটী বিচিত্র-বিষয়-সমন্বিত আত্মবস্তু ছাড়া আর কোন বস্তু যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান-গোচর হয় না, তাহা ইতিপূর্ব্বেই দেখান গিয়াছে। এখন অনুমানের কথা। যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানগোচর হইতে পারে, কেবল তাহাই বা তদ-স্বরূপ বস্তুই অনুমানের বিষয় হইতে পারে; যাহা কখনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান গোচর হয় না তাহা অনুমানের বিষয়ও হইতে পারে না। আমাদের দৃষ্টান্ত স্থানীয় কাগজের জ্ঞানে যেমন বিচিত্র বিষয়-সমন্বিত একটী আত্মার প্রকাশ দেখা যাইতেছে, আত্মার এরূপ অসংখ্য প্রকাশ আমরা অনুমান ও

কল্পনা করিতে পারি। আলোচ্য দেশখণ্ডের অতিরিক্ত দেশ আছে, বর্ত্তমান কালের পূর্ব্বে ও পরে কাল আছে, এবং সেই দেশ ও কাল আত্মার বিষয়ীভূত, এই সমস্তই ন্যায্য অনুমানের বিষয়। এই কাগজ খণ্ড এখন যেমন জ্ঞানে বর্ত্তমান রহিয়াছে, পূর্ব্বেও তেমনি জ্ঞানে বর্ত্তমান ছিল, এবং পরেও থাকিবে, এরূপ অনুমানেরও যথেষ্ট কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু যাহা জ্ঞাতা নহে, জ্ঞেয়ও নহে, এরূপ কোন অনির্দ্দেশ্য অচিন্তনীয় কিম্ভূত কিমাকার ব্যাপারকে যদি কেহ 'জড় বস্তু' বা 'জড়শক্তি' নাম দিয়া অনুমানের বিষয় বলিয়া দাঁড় করাইতে চান, তবে এই মীমাংসার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে এরূপ কিম্ভূত কিমাকার বস্তু যখন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অগোচর, তখন ইহা অনুমানের বিষয়ও হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিতরে আত্মশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, আত্মার সেই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যে শক্তিবশতঃ ইহা জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছা এই ত্রিবিধরূপে প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রিয়বোধ বা জ্ঞানের অন্যান্য উপকরণের কারণ দর্শাইবার জন্য এই আত্ম-শক্তি ছাড়া আর কোন বস্তু বা শক্তি কল্পনা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, এবং কল্পনার উপাদানও নাই। প্রকৃত বস্তু যে জ্ঞানবস্তু, তাহা হইতে হয় জ্ঞাতৃত্ব, না হয় জ্ঞেয়ত্ব বলপূর্ব্বক পৃথক করিয়াই স্বতন্ত্র 'জড় বস্তু' বা 'জড়শক্তির' কল্পনা সিদ্ধ হয়। এরূপ মনগড়া স্ববিরোধী বস্তু থাকা অসম্ভব, এবং যদি তাহা সম্ভবও হইত তথাপি তাহাদ্বারা ইন্দ্রিয়বোধ বা অন্য কোন জ্ঞানোপকরণের কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা হইতে পারিত না।

বিষয়কে জানিতে গিয়া যে অবশ্যম্ভাবিরূপে আত্মাকে জানা হয়, তাহাই দেখান হইল। এখন দেখাইব যে আত্মাকে জানিতে গিয়া অবশ্যম্ভাবিরূপে ব্রহ্মকে জানা হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আর একটী প্রশ্নের বিচার হওয়া আবশ্যক। সেটী এই, আমরা বিষয় জগৎকে জানিতে গিয়া কি কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী মানসিক ঘটনা মাত্র জানি? অথবা আত্মার আশ্রিত কতকগুলি স্থায়ী বস্তু জানি? রূপ রস গন্ধাদিকে আপাততঃ ক্ষণিক অস্থায়ী বিজ্ঞান মাত্র বলিয়াই বোধ হয়। জ্ঞাতার সম্পর্কে এই সমুদায়ের ক্ষণিক প্রকাশ, তৎপর জ্ঞাতার সহিত সম্পর্ক-বিচ্যুত হওয়াতে বিনাশ,—বস্তুগুণ সম্বন্ধে আপাততঃ এই বর্ণনাই সত্য বলিয়া বোধ হয়। জ্ঞাতার সহিত সম্বন্ধ-বিচ্যুত

হইলে রূপরসাদি বিজ্ঞানের বিনাশ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু বাস্তবিক কথা এই যে জ্ঞাতার সহিত এই সমুদায়ের সম্বন্ধ-বিচ্যুতি আপাত মাত্র, প্রকৃত নহে। বিজ্ঞান সমূহ বস্তুতঃ স্থায়ীরূপে আত্মাতে বর্ত্তমান থাকে। জগতের উপকরণরূপ বিষয় সমূহ বিশেষ বিশেষ সমষ্টীভূত হইয়া, অন্য বিষয় সমূহকে ছাড়িয়া, ব্যক্তিগত জীবনে প্রকাশিত হয়, বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানসমষ্টিরূপে ব্যক্তিগত মানসিক জীবনের উপকরণ হয়। সময়ে সময়ে কতকগুলি ব্যক্তিগত জীবন হইতে সরিয়া পড়ে, অন্য কতকগুলি তাহাদের স্থান অধিকার করে। ব্যক্তিগত জীবনে বিষয়ের এই আবির্ভাব তিরোভাব দেখিয়া বোধ হইতে পারে যে বিষয় সমূহ কেবল অস্থায়ী বিজ্ঞান মাত্র। কিন্তু যদি তাহাই হইত তবে মানসিক জীবনে ক্ষণে ক্ষণে কেবল নূতন বিজ্ঞানেরই উদয় হইত, একবার যে বিজ্ঞান তিরোহিত হইত, তাহা পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া পুরাতন বিজ্ঞান বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে পারিত না। কিন্তু বস্তুতঃ অনুক্ষণ তাহাই ঘটিতেছে। অনুক্ষণই পুরাতন বিজ্ঞান স্মৃতির আকারে পুনরাবির্ভূত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা এই প্রমাণ করিতেছে যে ব্যক্তিগত জীবন হইতে তিরোধানের সময়েও তাহা বিনষ্ট হয় না, বর্ত্তমানই থাকে। আর, বিজ্ঞান কেবল বিজ্ঞানরূপেই থাকিতে পারে, বিজ্ঞান অন্যরূপে থাকা, অবিজ্ঞাতরূপে থাকা, বিজ্ঞাতাকে ছাড়িয়া থাকা, ইহার কোন অর্থই নাই। এই কাগজখণ্ড আমার মানসিক জীবন হইতে একবার তিরোহিত হইয়া পুনরায় তাহাতে উদিত হইল। আমি ইহাকে পূর্ব্বজ্ঞাত কাগজ বলিয়া জানিতে পারিলাম। ইহাতেই বুঝিলাম ইহার তিরোধান সময়েও ইহা বর্ত্তমান ছিল, বিনষ্ট হয় নাই; বিনষ্ট হইলে ইহার পুনরাবির্ভাব, পুনঃ পরিচয়, অসম্ভব হইত। যদি কেহ বলেন, এখন যাহা অনুভব করিতেছ, তাহা নূতন বিজ্ঞান, পুরাতন নহে, পুরাতনের সহিত সদৃশ, এইমাত্র,—ইহাতেও কিছু আসে যায় না, ইহাতেও আমাদের মীমাংসা অব্যাহত থাকে। কারণ, পূর্ব্ব বিজ্ঞান স্থায়ী না হইলে,—স্থায়ী থাকিয়া ব্যক্তিগত জীবনে পুনরাবির্ভূত না হইলে উক্ত সাদৃশ্যবোধ সম্ভব হইত না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ক্ষণে ক্ষণে নূতন বিজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে পুরাতন বিজ্ঞানের স্থায়িত্ব খণ্ডিত হয় না।

যাহা হউক, বিজ্ঞানের স্থায়িত্ব প্রমাণিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কতদূর প্রমাণিত হইতেছে,—কি বিস্ময়কর সত্য প্রমাণিত হইতেছে, এই বিষয় একবার ভাবিয়া দেখুন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিজ্ঞান কেবল বিজ্ঞানরূপেই, কেবল বিজ্ঞাতভাবেই, থাকিতে পারে। অর্থাৎ বিজ্ঞান থাকিতে গেলেই বিজ্ঞানের আশ্রয়রূপী জ্ঞাতা থাকা চাই। ইহাতে মনে হইতে পারে, আমাদের বিজ্ঞান সমূহ আমাদের ব্যক্তিগত জীবন হইতে তিরোধানের সময়ে আমাদের আত্মা হইতে পৃথক্ অন্য কোন আত্মাতে বর্ত্তমান থাকে, এবং স্মৃতিকালে সেই আত্মা হইতে আমাদের আত্মাতে সংক্রামিত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ বিজ্ঞানের পক্ষে এরূপ সংক্রামণ অসম্ভব। বিজ্ঞান আত্মার গুণ, আত্মা হইতে অবিচ্ছেদ্য। এক আত্মার বিজ্ঞান কখনও আর এক পৃথক আত্মায় সংক্রামিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ স্মৃতিব্যাপারে যাহা ঘটে, তাহাতে পৃথক্ পৃথক্ আত্মার এরূপ পরস্পর আদান প্রদান প্রমাণিত না না হইয়া অত্যন্ত ভিন্ন কথাই প্রমাণিত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বিষয়কে জানিতে গিয়া, যথা এই কাগজখণ্ডকে জানিতে গিয়া, আমি বিচিত্র গুণ-সমন্বিত একটী আত্মাকে আমার আত্মারূপে জানি, অতিরিক্ত কোন বস্তুকে জানি না; এবং কাগজের গুণগুলি সেই আত্মারই গুণ। এখন দেখুন কাগজখণ্ড আমার ব্যক্তিগত জীবন হইতে তিরোহিত হওয়াতে বস্তুতঃ কি ঘটিয়াছিল? এই ঘটিয়াছিল না কি যে, যাহাকে আমার আত্মা বলিতেছি সেই আত্মাই তাহার কতিপয় গুণসমষ্টিরূপ কাগজখণ্ড সহ এই ব্যক্তিগত জীবন হইতে তিরোহিত হইয়াছিল? আর স্মৃতির সময়ে কি ঘটে? ইহাই ত ঘটে যে, সেই আত্মাই তাহার সেই সকল গুণ লইয়া, ব্যক্তিগত জীবনে পুনঃ প্রকাশিত হয়। কাগজখণ্ডকে পুনরায় জানিতে গিয়া যেমন আমি জানিতেছি যে ইহা সেই পূর্ব্ব-জ্ঞাত কাগজ, তেমনি ইহাও জানিতেছি যে, যে আত্মা পূর্ব্বে কাগজখণ্ডকে জানিয়াছিল, যে আত্মার জ্ঞানাশ্রিত হইয়া কাগজখণ্ড পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই আত্মাই পুনরায় ইহার জ্ঞাতারূপে প্রকাশ পাইতেছে; সেই আত্মা ও এই আত্মা একই। ফলতঃ কাগজখণ্ডের জ্ঞান এবং কাগজখণ্ডের জ্ঞাতা বা আশ্রয়রূপী আত্মার জ্ঞান, পরস্পর পৃথক জ্ঞান নহে, একই অখণ্ড জ্ঞান। সুতরাং কাগজখণ্ডের

অদৃষ্টের সঙ্গে ইহার আশ্রয়রূপী আত্মার অদৃষ্ট অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত ; অর্থাৎ কাগজ খণ্ডের আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতির সঙ্গে, আশ্রয়রূপী আত্মাও ব্যক্তিগত জীবনে আবির্ভূত, স্থিত ও তাহা হইতে তিরোহিত হন। অতএব স্পষ্টরূপেই প্রমাণ হইতেছে যে ব্যক্তিগত জীবন হইতে তিরোধানের সময়ে কাগজ খণ্ড যে আত্মাতে স্থিতি করে, সে আত্মা পৃথক্ কোন আত্মা নহে, যে আত্মা কাগজের দ্রষ্টা ও স্মর্ত্তারূপে প্রতিভাত হয়, ইহা সেই আত্মাই।

এখন ভাবিয়া দেখুন্ আত্মজ্ঞান কিরূপ সাক্ষ্য দিতেছে, কাঁহার সাক্ষ্য দিতেছে। আত্মজ্ঞানে কি জগদাত্মা হইতে পৃথক কোন আত্মা প্রকাশিত হইতেছে, অথবা জগদাত্মাই ব্যক্তিগত আত্মারূপে প্রকাশ পাইতেছেন? আমরা দেখিলাম যে জগতের অংশরূপ এই কাগজখণ্ডকে জানিতে গিয়া আমি কাগজের জ্ঞাতারূপী যে আত্মাকে 'আমার আত্মা' বলিয়া জানি, সেই আত্মার সঙ্গে কাগজখণ্ডের কেবল এক মুহূর্ত্তের সম্বন্ধ নহে ; সেই আত্মা কাগজখণ্ডের নিত্য আশ্রয়। কাগজখণ্ড যে আত্মাতে নিত্য আশ্রিত হইয়া থাকে, সেই আত্মাই ব্যক্তিগত জ্ঞানক্রিয়ার সময়ে কাগজের জ্ঞাতা ও আশ্রয়রূপে প্রকাশ পায়, এবং তখন ইহাকে 'আমার আত্মা' 'ব্যক্তিগত আত্মা' বলি। তাহা হইলে সিদ্ধান্তটা এই দাঁড়াইতেছে যে, যখন জগতের অংশ স্বরূপ দেশাশ্রিত কালাশ্রিত কোন বিষয় ব্যক্তিগত মানসিক জীবনে প্রকাশিত হয়, তখন ব্যাপারটা এই ঘটে যে সেই বিষয়ের নিত্য আশ্রয়রূপী আত্মা যিনি, তিনিই তাঁহার আশ্রিত সেই বিষয় লইয়া ব্যক্তিগত আত্মারূপে প্রকাশিত হন ; যিনি বিশ্বাত্মা তিনিই প্রত্যগাত্মারূপে, জীবাত্মারূপে, প্রকাশিত হন। যাহাকে জড়জগৎ বলা হয়, কেবল সেই জগৎকে জানিতে গিয়াই যে এরূপ ঘটে তাহা নহে, যাহাকে নিরবচ্ছিন্ন মানসিক জগৎ বলা হয়, সে জগতেও বিশ্বাত্মা ও জীবাত্মার এই একত্ব প্রতিভাত হয়। অভিজ্ঞতার বিচিত্রতায় আত্মার একত্ব খণ্ডিত হয় না। চক্ষুরাদি সমুদায় ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ করিয়া মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়া যে আত্মাকে উপলব্ধি করি, সে কোন্ আত্মা? জগদ্দর্শনের সময় যে আত্মাকে জগতের জ্ঞাতারূপে, আশ্রয়রূপে, জানি, যে আত্মা ক্ষণে ক্ষণে আংশিক ভাবে বিশেষ বিশেষ বিষয়সহ ব্যক্তিগত জীবন হইতে তিরোহিত হইয়া পুনরায়

সেই সকল বিষয় লইয়া প্রকাশিত হন, মনোরাজ্যে কি সেই আত্মারই পরিচয় পাই না? জড়জগতে যিনি বিষয়ের জ্ঞাতারূপে প্রকাশিত হন, মনোজগতে তিনিই যে বিষয়ের স্বর্ত্তারূপে বর্ত্তমান, তাহাতে আর সন্দেহ কি? জড়জগতের অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-জগতের অভিজ্ঞতা, আত্মার একত্ব-বোধরূপ অচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে। তার পর, জড়জগতের বিষয় সমূহ যেমন পরস্পরের সহিত ঘনিষ্টরূপে সম্বদ্ধ, চিন্তা জগতের বিষয় সমূহও কি সেইরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ নহে? প্রভেদ এই মাত্র যে বাহ্যজগতের সহিত দেশ ও কাল উভয়ের যোগ, মনোজগতে দেশের আধিপত্য শতদূর নাই। কিন্তু কালের আধিপত্য সেখানেও অব্যাহত। বাহ্য জগতের বস্তু সমূহ যেমন ব্যক্তিগত জীবন হইতে তিরোহিত হইয়া নিত্য জ্ঞানে বর্ত্তমান থাকে এবং পুনরায় আবির্ভূত হইয়া নিজ পরিচয় দেয়, আভ্যন্তরিক চিন্তাসমূহ সম্বন্ধেও এই কথা ঠিক। আমার অদ্যকার নির্জ্জন চিন্তা ও সুখদুঃখাদি আমার ব্যক্তিগত জীবন হইতে তিরোহিত হইয়া আবার কল্য পুনরাবির্ভূত হইয়া আত্মপরিচয় দিবে, এবং এই সাক্ষ্য দিবে যে আমার আত্মার ব্যক্তিগত প্রকাশই সর্ব্বে সর্ব্বা নহে; ব্যক্তিগত জীবনের তিরোধানের সময়েও আমার চিন্তাসমূহ আমার আত্মবস্তুতে অবিস্মৃতরূপে বর্ত্তমান থাকে। যে আত্মা ব্যক্তিগত আবির্ভাবের সময়ে চিন্তা সমূহের আশ্রয়, তিনিই ব্যক্তিগত তিরোধানের সময় ইহাদের ধারয়িতা, এবং তিনিই স্মৃতির সময়ে চিন্তা সমূহ লইয়া পুনঃ প্রকাশিত হন। তিনি যেমন দেশগত জগতের আশ্রয়, তিনিই তেমনি কালগত জগতের আশ্রয়। সুতরাং বাহ্য অভিজ্ঞতায় যেমন বিশ্বাত্মাই জীবাত্মারূপে প্রকাশিত, অন্তর্জ্জগতের অভিজ্ঞতায়ও তেমনি বিশ্বাত্মাই জীবাত্মারূপে প্রকাশিত। সেখানে যেমন আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান এক, এখানেও তেমনি আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান এক।

তবে কি জীব ও ব্রহ্মে কোন প্রভেদ নাই? প্রভেদ কোথায় নাই ও কোথায় আছে, তাহা ইতিমধ্যেই ইঙ্গিতীকৃত হইয়াছে। প্রভেদ বস্তুগত নহে, প্রকাশগত; আত্মগত নহে, বিষয়গত। একই আত্মবস্তু যে দুইভাবে প্রকাশিত, তাহা স্পষ্টরূপেই দেখা যাইতেছে। ব্যক্তিগত জীবনরূপে যে আত্মার প্রকাশ, তাহা অপূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু এই অপূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী

প্রকাশের মূলে এক পূর্ণ ও স্থায়ী প্রকাশ রহিয়াছে। বিশ্বাত্মা এই যে বিচিত্র বিষয়সমূহ লইয়া আমার আত্মারূপে প্রকাশ পাইয়াছেন, এই প্রকাশ ক্ষণকাল পরেই তিরোহিত হইয়া যাইবে। বিস্মৃতিকালে আংশিকভাবে, সুষুপ্তিকালে সম্পূর্ণরূপে, ইহার তিরোধান হইবে। কিন্তু এই তিরোধানে মূল বস্তুর কোন অপচয় হইবে না। বিশ্বাত্মা এই বিষয়সমূহ সহ আপনার নিকট আপনি প্রকাশিত থাকিবেন; কোন ব্যক্তিগত জীবনে প্রকাশিত না হইলেও তাঁহার স্বপ্রকাশ ভাব অপ্রতিহত থাকিবে। সমগ্র জগৎ পরমাত্মার এই স্বপ্রকাশভাবের মধ্যে বর্ত্তমান। জীবের জীবনরূপে যে তাঁহার প্রকাশ, সেই প্রকাশকে তাঁহার অনুপ্রকাশ বলা যাইতে পারে, কারণ ইহা মূল প্রকাশ নহে, ইহা মূলপ্রকাশের অনুকৃতি বা প্রতিবিম্ব। তাঁহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য জীবের জীবনরূপে প্রকাশিত না হইলেও তাহা তাঁহার নিজের নিকট চিরপ্রকাশিত; তাহা ব্যক্তিগত প্রকাশসাপেক্ষ নহে; সেই জন্যই তাহা মুখ্যপ্রকাশ। আর, এই যে জীবের জীবনে ঐ জ্ঞানৈশ্বর্য্যের আংশিক ও প্রবাহরূপ প্রকাশ, এই প্রকাশ অবান্তর, তাই ইহাকে অনুপ্রকাশ বলিলাম। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্"—সমুদায় বস্তু সেই প্রকাশস্বরূপের প্রকাশেই অনুপ্রকাশিত। মুখ্যপ্রকাশ পূর্ণ, অনুপ্রকাশ অপূর্ণ, এস্থলে ব্রহ্ম ও জীবের ভিন্নতা। যিনি নিত্য স্বপ্রকাশ, তিনিই অনুপ্রকাশিত হন, এস্থলে অভেদ। মুখ্যপ্রকাশে সমগ্র বিষয় বর্ত্তমান, অনুপ্রকাশে কতিপয় বিষয়মাত্র বর্ত্তমান, এস্থলে ভেদ। কিন্তু এই ভেদ বিষয়গত, বিষয়ি-গত নহে; একই অভেদ অখণ্ড বিষয়ী সমুদয় বিষয়ের আধাররূপে বর্ত্তমান। জীব কি অর্থে সীমাবদ্ধ তাহা এখন কতকটা বুঝা যাইতেছে। পরমাত্মার অনুপ্রকাশে বিষয়সমূহ যে সীমা লইয়া প্রকাশিত হয়, সেই সীমা আত্মাতে আরোপিত হওয়াতেই জীবাত্মার সসীমত্ব সিদ্ধ হয়। মুখ্য প্রকাশে যে এই সীমা নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। পরমাত্মার নিকট সকল বিষয়ই এককালে প্রকাশিত, কোনও বিষয় কখনও প্রচ্ছন্ন নাই। সুতরাং ঐ সীমা পারমার্থিক নহে, ব্যাবহারিক। কিন্তু 'ব্যাবহারিক' অর্থ এই নহে, যে ইহা অনর্থক কল্পনাজাত। দেখিতেছি ইহা ঐশী শক্তিরই কার্য্য। ঈশ্বর স্বয়ংই নিজ শক্তিতে নিজ ইচ্ছাতে,

নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বিষয় লইয়া অনুপ্রকাশিত হন, এবং এই অনুপ্রকাশে তাঁহার অপার জ্ঞানৈশ্বর্য্য আংশিকভাবে লুক্কায়িত রাখেন, ইহা বাস্তবিক কথা। যাহা হউক, পরমাত্মার এই অনুপ্রকাশ ব্যাপারটা নিঃসন্দিগ্ধ সত্য বটে, কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব হইল, তাহা আমি বুঝি না। অপ্রতিহত-প্রকাশ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তাঁহার অসীম জ্ঞানের কিয়দংশ সীমাবদ্ধ করিয়া, অজ্ঞানতারূপ রেখা দ্বারা বেষ্টিত করিয়া, কিরূপে জীবাত্মারূপে অনুপ্রকাশিত হইলেন, তাহা আমার বুদ্ধির অতীত, কিন্তু ব্যাপারটা যে তাহাই ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে নিজ আত্মাকে জানিতে গিয়া যদি আমরা পরমাত্মার অপূর্ণ প্রকাশকেই জানিলাম, তবে আর এরূপ জ্ঞানকে অনন্ত ব্রহ্মের জ্ঞান কিরূপে বলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে প্রকৃত অনন্তত্ব কাহাকে বলে এই বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। অনন্তত্ব সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা এই যে সসীম বস্তুর অশেষ যোগে অসীম হয়। যথা, সসীম দেশের অশেষ সংযোগে অসীম দেশ হয়। কিন্তু সসীমের সংযোগ কখনও অশেষ হইতে পারে না এবং এরূপ যোগকে অসীমও বলা যাইতে পারে না। সসীম বস্তু ক্রমাগত যোগ করিয়া যাও, বস্তু-পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু অসীম কখনও হইবে না। এরূপ যোগ-ভাবনায় অনন্ত পাওয়া যায় না। চিন্তার অবসাদ বশতঃ মানসিক যোগক্রিয়া যেখানে শেষ হইল সেখানে আমরা চীৎকার করিয়া বলিতে পারি, "হে অনন্ত, তোমাকে ভাবিতে পারিলাম না," কিন্তু যে অনন্তকে ভাবিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইলাম সে অনন্ত একটা অতি বৃহৎ বস্তু মাত্র, প্রকৃত অনন্ত নহে। কারণ, সসীমের প্রসারণ যতই কেন অধিক হউক না, ইহার বাহিরে আরও বস্তু থাকে, সেই বস্তু দ্বারা উহা সীমাবদ্ধ। যাহার বাহিরে আর কিছু নাই, যাহার অতিরিক্ত আর কিছু নাই, যাহাকে আশ্রয় না করিয়া কিছুই থাকিতে পারে না, তাহাই প্রকৃত অনন্ত। এই প্রকৃত অনন্তের জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র বস্তুর জ্ঞানের সঙ্গেও জড়িত রহিয়াছে। অনন্তের জ্ঞান লাভের জন্য ক্রমাগত বস্তুর সহিত বস্তু যোগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। দেশ কালের যে অনন্তত্ব, যে অনন্তত্ব প্রকৃত অনন্তত্বের আভাস মাত্র, তাহাও

বহু দেশাংশ ও বহু ঘটনা যোগ করিয়া বুঝিতে হয় না। বহিরিন্দ্রিয়-গোচর অতি ক্ষুদ্র বস্তুর জ্ঞানেও দেশের অনন্তত্ব ও একত্বের জ্ঞান জড়িত রহিয়াছে। দেশ অর্থই এমন কিছু যাহাকে অবলম্বন না করিয়া কোন ইন্দ্রিয়বোধ সম্ভব নহে, এবং যাহাতে ভেদ নাই, অর্থাৎ যাহাকে খণ্ডিত করা যায় না। যাহাকে না ভাবিয়া সংখ্যা ও বিভাগ ভাবা যায় না, যাহা সংখ্যা ও বিভাগ-ভাবনার আশ্রয়, তাহার প্রকৃতি সংখ্যা ও বিভাগের অতীত, অর্থাৎ তাহা অদ্বিতীয়, অখণ্ড। এরূপ এক অখণ্ড দেশের ভাব আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার সহিত জড়িত রহিয়াছে। তেমনি, এক ও অনন্ত কালের ভাব প্রত্যেক ঘটনা-বোধের সহিত জড়িত রহিয়াছে; এই ভাব লাভের জন্য বহু ঘটনাবলী একত্র চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, দেশ ও কালের অনন্তত্ব প্রকৃত অনন্তত্ব নহে, প্রকৃত অনন্তত্বের আভাস মাত্র। ইন্দ্রিয়-ব্যাপারেই দেশ কালের আধিপত্য। ইন্দ্রিয়-ঘটিত ও ইন্দ্রিয়াতীত সমুদায় ব্যাপার যাহার আশ্রিত, দেশ কালও যাহার আশ্রিত, যাহাকে না জানিয়া কিছুই জানা যায় না, যাহাকে না ভাবিয়া কিছুই ভাবা যায় না, যাহাকে বিশ্বাস না করিয়া কিছুই বিশ্বাস করা যায় না, তাহাই প্রকৃত অনন্ত বস্তু। এই অনন্ত বস্তু জ্ঞানরূপী আত্মা। দেশ কাল সম্বন্ধে যেমন দেখাইলাম যে একত্ব ও অনন্তত্বের ভাব ইহাদের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত, দেশ কাল অবশ্যম্ভাবি-রূপেই এক ও অনন্ত, তেমনি আত্মার প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে ইহা অবশ্যম্ভাবিরূপেই এক, অখণ্ড, অনন্ত। দেশ কালের আশ্রিত বিশেষ বিশেষ বস্তু ও ঘটনার সহিত দেশ কালকে এক করাতেই যেমন দেশ কালের সীমা কল্পিত হয়, বস্তুতঃ ইহারা অসীম, তেমনি আত্মার আশ্রিত বিশেষ বিশেষ বিষয় বা বিষয়-সমষ্টির সহিত আত্মাকে এক করাতেই ইহাকে সসীম বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃতপক্ষে ইহা অসীম। যাহাকে না জানিয়া সীমা জানা যায় না, যাহাকে না ভাবিয়া সীমা ভাবা যায় না, সে সীমাতীত, সন্দেহ নাই। আত্মার অসীমত্ব বুঝিবার জন্য জ্ঞেয় বিষয়ের সংখ্যা বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। যেমন ইন্দ্রিয়গোচর অতি ক্ষুদ্র বস্তুতেও দেশের অনন্তত্ব প্রকাশিত, অতি ক্ষুদ্র বিষয়েও তেমনি আত্মার অনন্তত্ব প্রকাশিত। অতি ক্ষুদ্র বিষয়ের যোগেও আত্মার যে পরিচয় পাই, তাহা-

তেই বুঝিতে পারি আত্মা এক অখণ্ড, অনন্ত। আপাততঃ মনে হয় আমার ইন্দ্রিয়-সাক্ষাৎ বিষয় সমূহই আমার আত্মার আশ্রিত, আমার ইন্দ্রিয়-ব্যবহিত বিষয় সমূহ স্বাধীন, আত্ম-নিরপেক্ষ, অথবা আমার আত্মার অতিরিক্ত অন্য কোন আত্মার আশ্রিত। আপাত-জ্ঞানে বিষয় ভেদে আত্মাও ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন এই দুই প্রকার বিষয়কে, ইন্দ্রিয়-সন্নিহিত ও ইন্দ্রিয়-ব্যবহিত বিষয়কে, যেমন একই অখণ্ড দেশের অন্তর্গত বলিয়া জানিতেছেন, এই জ্ঞানে যেমন কোন সন্দেহ ও ভ্রম নাই,—বিষয়দ্বয়ের আপাত-পার্থক্য সত্বেও যেমন এক অভিন্ন অবিভক্ত আকাশ উভয়ের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া উভয়কে সংযুক্ত রাখিয়াছে, উভয়ের সীমা যাহা তাহাও যেমন এই সর্ব্ব-বিষয়াধার দেশেরই অন্তর্গত, তেমনি আরো গভীরতর যথার্থতর অর্থে, এক অখণ্ড অভিন্ন আত্মা এই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়দ্বয়ের মধ্যে সেতুরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া বিষয়দ্বয়ের একান্ত ভেদ অসম্ভব করিতেছেন।

"স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়।"

এই লোক সমূহের একান্ত ভেদ নিবারণের জন্য তিনি সেতুরূপে, ধারয়িতারূপে বর্ত্তমান। এই ইন্দ্রিয়-সন্নিহিত বিষয়ের জ্ঞাতাকে ইন্দ্রিয়-ব্যবহিত বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন বলিতে চাও এই জন্য যে দুইটী বিষয়ের মধ্যে ভেদ রহিয়াছে, কিন্তু এই ভেদ ও ভিন্ন বিষয়দ্বয় জানিতে গিয়া তুমি এমন একটী আত্মাকে জানিতেছ যে এই ভিন্ন বিষয়দ্বয়ের এবং তাহাদের ভেদের আশ্রয়। সেই সেতুরূপী আশ্রয়রূপী আত্মাকে নিজ আত্মারূপে না জানিয়া তুমি বিষয়দ্বয়ের ভেদ ও ভিন্নতা জানিতে পারিতেছ না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিষয়ের যে ভেদজ্ঞান হইতে আপাততঃ আত্মার ভেদ বোধ হয়, সেই ভেদ জ্ঞানের ভিতরেই আত্মার অভেদ ভাব নিহিত রহিয়াছে। আত্মাকে জানিতে গিয়া আমরা এমন একটী বস্তুকে জানিতেছি যে বস্তুটী সমুদায় ভেদজ্ঞানের আশ্রয়, সুতরাং সমুদায় ভেদের অতীত। এক বিষয় হইতে আর এক বিষয়ের ভেদ, এক বিষয় ও আর এক বিষয়ের মধ্যে সীমা, বিষয় জগতের নানা খণ্ড, এই সমুদায় জানিতে গিয়া যাহাকে অবশ্যম্ভাবিরূপে জানিতে হয়, যাহাকে না

জানিয়া ভেদ, সীমা ও খণ্ড জানা যায় না, সেই আত্মবস্তুকে ভিন্ন, খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ বলিয়া জানা অসম্ভব। 'তাঁহাকে ভিন্ন, খণ্ডিত, সীমাবদ্ধ বলিয়া জানিতেছি,' এরূপ বোধ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ বুদ্ধিতে আত্মস্বরূপ প্রকাশিত হয় নাই। আত্মাকে জানিতে গিয়া এমন একটী বস্তুকে জানা হয় যাহার অতীত আর কিছু নাই, সমুদায় যাহার অন্তর্নিবিষ্ট, সমুদায় যাহার আশ্রিত। অনন্ত বস্তুর প্রকৃত লক্ষণ যাহা তাহা আত্মবস্তুতে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। দেশ, কাল, নানাবিধ বিষয় ও ঘটনা, ভেদ, সীমা, পরিমাণ, সংখ্যা,—কিছুই আত্মার বাহিরে জানা যায় না, ভাবা যায় না। আত্মার প্রকৃতিতে একত্ব, অখণ্ডত্ব ও অসীমত্ব অবশ্যম্ভাবিরূপে বর্ত্তমান। এই যে ব্যক্তিগত ভেদ, যাহা আমি অস্বীকার করিতেছি না, এবং বোধ হয় কেহই অস্বীকার করেন নাই, এই ভেদের ভিতরেও এই ভেদের আশ্রয়রূপে এক অভেদ আত্মা বিদ্যমান। এক অভেদ আত্মার পদবীতে দণ্ডায়মান হইয়াই আমরা এই ভেদ জ্ঞাত হই। এই কথাটি আরও স্পষ্টরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। যে সকল বিজ্ঞান ও সুখ দুঃখাদি বোধ আমার ব্যক্তিগত জীবনের উপকরণ, তোমার ব্যক্তিগত জীবনের উপকরণ তৎসমুদায় হইতে ভিন্ন; ইহাতেই তোমার আমার ব্যক্তিগত ভেদ। কিন্তু এই ভেদ আমাদের উভয়ের জ্ঞাত বিষয়,—আমাদের উভয়ের পক্ষে নিশ্চিত সত্য। এই যে নিশ্চিত ভেদ জ্ঞান—এই ভেদ জ্ঞানের মূলে একটী অভেদজ্ঞান রহিয়াছে, যাহাতে এই ভেদজ্ঞানকে সম্ভব করিতেছে। ভিন্ন জীবনদ্বয়ের মধ্যে সেতুস্বরূপ একটী অভেদ আত্মা আছে যে আত্মা জীবনদ্বয়কে জানিতেছে ও সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। সেই অভেদ আত্মা আর কেহ নহে, যাঁহাকে আমি আমার আত্মা বলিতেছি, এবং যাঁহাকে তুমি তোমার আত্মা বলিতেছ, তিনিই সেই আত্মা। যদি তোমার মানসিক জীবন ও আমার মানসিক জীবনে একান্ত ভেদ থাকিত, উভয়ের মূলে এক অভেদ আত্মা না থাকিতেন, তবে আমাদের পরস্পর পরিচয়ের কোন উপায় থাকিত না —একজন আর একজনের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিতে পারিতাম না। উভয় জীবন একই পরমাত্মার জ্ঞানাশ্রিত, এবং পরমাত্মাই জ্ঞাতারূপে উভয় জীবনে অনুপ্রকাশিত, ইহাতেই পরস্পরের পরিচয় সম্ভব হইয়াছে।

আমার আত্মা যে আমার ব্যক্তিগত জীবনের অন্তর্গত বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া অন্ত ব্যক্তিগত জীবনের তত্ত্বও জানিতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে আমার আত্মা কেবল আমার আত্মা নহে, ইহা সেই অপর ব্যক্তিরও আত্মা। এই সত্য দর্শন করিয়াই উপনিষদ্ পরমাত্মাকে "সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" বলিয়াছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যাহাকে আমরা ব্যক্তিগত আত্মা বলি তাহাকে জানিতে গিয়া আমরা বস্তুতঃ অসীম বিশ্বাত্মাকেই জানি। জড়-জগৎ ও জীবজগতের নানা ভেদ জানিতে গিয়াও এক অখণ্ড অভেদ পরমাত্মাকেই জানি। প্রকৃত আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানে কোন প্রভেদ নাই; প্রকৃত আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান, কারণ ব্রহ্ম আত্মরূপী। তিনি বিশ্বাত্মা, এবং তিনিই প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা।

উপরি-উক্ত মীমাংসার উপর স্বভাবতঃ অনেক আপত্তি উঠিতে পারে। সমুদায় আপত্তির সন্তোষকর উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু সমুদায় আপত্তির সন্তোষকর উত্তর দিতে না পারিলেই যে মূল সিদ্ধান্ত সন্দিগ্ধ হইয়া পড়ে, আমি তাহা মনে করি না। যে চিন্তা-পরম্পরায় সাহায্যে আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানের একত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই চিন্তা-পরম্পরার ভিতরে যতক্ষণ ভ্রম ও অসম্বন্ধ দেখান না যায়, ততক্ষণ মূল সিদ্ধান্ত অব্যাহত থাকিতেছে। দুটী কথা স্মরণ রাখিলেই ব্যাখ্যাত সত্যের সত্যত্ব স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইবে। প্রথম,—জগৎবিজ্ঞানের সময়ে আমরা একই আত্মাকে জ্ঞাত হই; সেই আত্মা জগদাধার এবং জগতের বিজ্ঞাতা দুইই;—একই আত্মা জগদাধার ও জগতের জ্ঞাতারূপে প্রকাশিত হন। দ্বিতীয় কথা এই যে আমরা যাহাকে আমাদের নিজ আত্মা বলি সেই আত্মা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বিষয়সহ প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু সেই আত্মা ছাড়া আর কোন আত্মা আমরা জানি না এবং ভাবিতেও পারি না। "আর আর কোন আত্মা," এটা একটা বাক্য মাত্র, ইহার অনুরূপ অর্থ ও ভাব বুদ্ধিতে উদয় হয় না। "আর কোন'' কথাটাতে যে ভেদ, বিভাগ ও সীমা বুঝায়, সেই সকল ভাবিতে গিয়া দেখি সমুদায়ের মূলে এক অখণ্ড অসীম আত্মার ভাব নিহিত। যাঁহাকে নিজ আত্মা বলি তাঁহাকেই অনি-

কার্য্যরূপে সর্ব্ববিষয়াধার বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হই। আত্মার প্রকৃতিতে অবশ্যম্ভাবিরূপেই একত্ব ও অনন্তত্বের ভাব বর্ত্তমান। জীব জগতের যে ভেদ, তাহা বস্তুতঃ আত্মগত নহে, বিষয়গত,—সে বিষয় স্থূল হউক আর সূক্ষ্মই হউক। দেহাত্মবুদ্ধি বশতঃ, বিষয়ে বিষয়ি-বুদ্ধিবশতঃ, যাহাই বোধ হউক, জ্ঞান ও বিশ্বাসের মূল দেশে যাইয়া দেখি একই অখণ্ড আত্মা বিশেষ বিশেষ বিষয় সমষ্টিতে অহংভাবাশ্রিত হইয়া ব্যক্তিগত আত্মারূপে অনুপ্রকাশিত রহিয়াছেন।

এই প্রবন্ধে মূলে একাত্মবাদ প্রদর্শন করিয়াও তন্মধ্যে ব্যক্তিগত ভেদের ভূমি স্পষ্টতঃই স্বীকার করা হইয়াছে। এই ভেদের উপর কিরূপে উপাস্য উপাসক, সেব্য সেবক, চিরমুক্ত ও মোক্ষার্থীর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা প্রবন্ধান্তরে প্রদর্শিত হইবে।

মার্টিনোর ঈশ্বরতত্ত্ব ও তৎসমালোচনা।

ডাঃ জেমস্ মার্টিনো বর্ত্তমান সময়ের একজন প্রধান ইউরোপীয় দার্শনিক। তিনি ঈশ্বরতত্ত্ব, নীতিবিজ্ঞান, খ্রীষ্টীয় মত ও সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েক খানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে তাঁহার প্রচারিত ঈশ্বর-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব। পাঠক প্রথম দুই প্রবন্ধে একটী ব্রহ্মবিজ্ঞানের আভাস পাইয়াছেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে দেখিবেন যে, উক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞানের সহিত মার্টিনোর ব্রহ্মবিজ্ঞানের অনেক অনৈক্য। মার্টিনোর গ্রন্থাবলী পড়িয়া আমরা প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরতত্ত্বে সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। সুতরাং তাঁহার মত ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সংক্ষেপে তাঁহার কোন কোন কথার সমালোচনা করিব।

ঈশ্বরাস্তিত্ব সংস্থাপনার্থ মার্টিনো কার্য্যকারণ সম্বন্ধীয় যুক্তির উপরই বিশেষ ভাবে নির্ভর করেন। তাঁহার মতে 'কারণ' অর্থ কেবল বস্তু নহে, এবং এক কার্য্যের কারণ কার্য্যান্তরও নহে। কোন অন্ধ শক্তিও প্রকৃত

কারণ নহে। প্রকৃত কারণে বস্তুর স্থায়িত্ব, কার্য্যের কার্য্যত্ব এবং শক্তির কর্তৃত্ব এই তিনটী গুণই থাকা চাই। এতদ্ব্যতীত আর একটী গুণ থাকা চাই; অসংখ্য সম্ভবনীয় কার্য্যের মধ্যে কেন একটি বিশেষ কার্য্য ঘটিল, কারণকে সেটী ব্যাখ্যা করা চাই। কোন কার্য্য ঘটিলে আমরা প্রধানতঃ দুটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, (১) কার্য্যাভাবের অবস্থা হইতে কিরূপে কার্য্য উৎপন্ন হইল? (২) অসংখ্য কার্য্য হইতে পারিত, তন্মধ্যে এই বিশেষ কার্য্যটী ঘটিল কেন? প্রথম প্রশ্নের উত্তর—শক্তি, অর্থাৎ এমন একটি বস্তু যাহা নিষ্ক্রিয়াবস্থা ভঙ্গ করিয়া কার্য্য ঘটাইতে পারে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—নির্ব্বাচন (choice)। নানা কার্য্যের মধ্যে কেন একটী বিশেষ কার্য্য হইল, ইহা সজ্ঞান নির্ব্বাচন ব্যতীত আর কিছুতে বুঝাইতে পারে না। এই নির্ব্বাচনও একটী কার্য্য, কিন্তু এই কার্য্যের পশ্চাতে কারণরূপী আর কোন কার্য্য নাই। ইহার কারণ কেবল নির্ব্বাচন-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তি। এস্থলে আমাদের আপত্তি এই যে প্রত্যেক ক্রিয়ার পশ্চাতেই যখন একটী কার্য্যরূপী কারণ থাকা চাই, তখন নির্ব্বাচন-ক্রিয়া এই নিয়ম-বহির্ভূত হইতে পারে না। ইহাকে নিয়ম-বহির্ভূত করিলে নিয়মের সার্ব্বভৌমিকত্ব থাকে না।

মার্টিনোর মতে আমাদের জ্ঞানক্রিয়াতে (perceptionএ) ঈশ্বরাস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দুটী শক্তির পরস্পর সংঘর্ষণ ব্যতীত জ্ঞানক্রিয়া সিদ্ধ হয় না,—আমাদের আত্মশক্তি ও আত্মার অতিরিক্ত আর একটী শক্তি। যথা, আলোকরশ্মি আমাদের চক্ষুস্থ স্নায়ুতে সংস্পৃষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়বোধ উৎপাদন করে; কিন্তু আত্মা যতক্ষণ নিজ শক্তি পরিচালন পূর্ব্বক এই ইন্দ্রিয়-বোধের দিকে অভিনিবেশ না করে, ততক্ষণ ইহা দৃষ্টিতে পরিণত হয় না, জ্ঞানে পরিণত হয় না। ইন্দ্রিয়-বোধ প্রাপ্তিতে কেবল আমাদের নিষ্ক্রিয় ভাব (passivity) প্রকাশ পায়, ইহাতে আমরা আমাদের নিজ শক্তি বা বহিঃ শক্তি, কিছুরই পরিচয় পাই না। কিন্তু প্রাপ্ত ইন্দ্রিয়বোধের দিকে মনোনিবেশ করাতে আমাদের কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়, এবং আমাদের নিজ কর্তৃত্বের পরিচয় পাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও জানিতে পারি যে আমাদের অতিরিক্ত আর একটী শক্তি আমাদের উপর কার্য্য করিতেছে,—আমাদের মনে ইন্দ্রিয়বোধ

উৎপাদন করিতেছে। নিজশক্তির জ্ঞান এবং বহিঃশক্তির জ্ঞান একই জ্ঞান-ক্রিয়ার দুটী দিক্ মাত্র। বহিঃশক্তির জ্ঞান যুক্তির মীমাংসা নহে, ইহা মৌলিক স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান। জ্ঞানক্রিয়াতে ইন্দ্রিয়বোধের প্রতি মনোনিবেশ করিতে যাইয়া আমরা যেমন নিজ কর্ত্তৃত্বের পরিচয় পাই, তেমনি ইন্দ্রিয়বোধ অনুভব করাতে, প্রাপ্তিতে, আমরা নিজ নিষ্ক্রিয়তারও পরিচয় পাই,—এই পরিচয় পাই যে আমরা নিষ্ক্রিয়ভাবে, অন্য শক্তির কার্য্যভূমিরূপে, সেই শক্তি হইতে ইন্দ্রিয়বোধ লাভ করিতেছি। যে সকল দার্শনিক কেবল ঘটনাপরম্পরায় বিশ্বাস করেন, শক্তি বলিয়া যে কিছু আছে, তাহা স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে মার্টিনো ঈদৃশ দৃষ্টান্ত-সংবলিত ব্যাখ্যা দ্বারা বহিঃশক্তি জ্ঞানের মৌলিকতা ও স্বতঃসিদ্ধতা বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। শক্তিবাদে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয়বোধ-উৎপাদিকা শক্তিকে বহিঃশক্তি,আত্মাতিরিক্ত শক্তি, বলাতে আমরা আপত্তি করি। ইন্দ্রিয়-বোধ প্রাপ্তিতে কেবল আত্মার নিষ্ক্রিয় ভাব প্রকাশ পায়,সুতরাং ইন্দ্রিয়বোধের কারণরূপী বহিঃশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, এই কথা ঠিক বলিয়া মনে করি না। 'বোধ' মাত্রেই ক্রিয়াশীলতা প্রকাশ পায়। আত্মার ইন্দ্রিয়বোধ হইতেছে, অথচ আত্মা নিষ্ক্রিয়, ইহা স্ববিরোধী কথা। ফলতঃ জ্ঞানক্রিয়ার কোন দিকেই নিষ্ক্রিয়তা নাই, জ্ঞান সম্পূর্ণরূপেই আত্মশক্তির প্রকাশ, সুতরাং ইহাতে আত্মাতিরিক্ত কোন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহা হউক, প্রকৃত কারণের পক্ষে যে ইচ্ছাশক্তি অবশ্যম্ভাবী, তাহা অন্য একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতেছে। দৃষ্টান্তটী মার্টিনো নিজেই দিয়াছেন। আমি অনিবিষ্ট ভাবে হাত নাড়িতে নাড়িতে একখানি পুস্তকের সংস্পর্শে আসিলাম, —আমার হাত একখানি পুস্তকে ঠেকিল। হাত যতক্ষণ অপ্রতিহত ভাবে নাড়িতেছিল, যতক্ষণ কোন বহিঃশক্তির সংস্পর্শে আসে নাই, ততক্ষণ আমি এই ব্যাপারে নিজশক্তি বা বহিঃশক্তি কিছুরই পরিচয় পাই নাই। ততক্ষণ আমার শক্তি অজ্ঞাতভাবে নিজের পরিচয় না পাইয়া কার্য্য করিতেছিল। পুস্তকের সংস্পর্শে আসা মাত্র আমি পুস্তকের প্রতিরোধ শক্তির সঙ্গে সঙ্গে নিজ শক্তিরও পরিচয় পাইলাম। অতঃপর আমার শক্তি হস্তের গতি স্থগিতই করুক, অথবা পুস্তকখানাকে ঠেলিয়া স্থানান্তরি-

তই করুক, যে কোন কার্য্যই করুক, সমস্তই সজ্ঞান। যাহা হউক, কেবল কার্য্যোৎপাদন শক্তি ছাড়া এস্থলে আমি আর একটী শক্তির পরিচয় পাইতেছি। হস্তের গতি স্থগিত করা বা অব্যাহত রাখা, বইখানাকে সম্মুখে বা পশ্চাতে, দক্ষিণে বা বামে ঠেলিয়া দেওয়া, ইত্যাদি যে-কোন কার্য্যই এ স্থলে সম্ভব। এই সম্ভবনীয় নানা কার্য্যের মধ্যে কোন্ কার্য্যটী ঘটিবে, ইহা আমার নির্ব্বাচনক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, এবং নির্ব্বাচনক্রিয়া আমার ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করে। এই নির্ব্বাচনক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুতে ঘটনার বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না, এবং বিশেষত্ব ব্যাখ্যা না করিলে ঘটনার প্রকৃত ব্যাখ্যাই করা হয় না। সুতরাং কারণের প্রকৃত স্বরূপ—ইচ্ছা-নিয়মিত শক্তি (Will-directed Force) এবং প্রকৃত কারণ একজন ইচ্ছাময় পুরুষ। আমাদের জ্ঞানক্রিয়া এবং সমুদায় প্রাকৃতিক ক্রিয়ার মূলে এক ইচ্ছাময় মহান্ পুরুষ বর্ত্তমান। নিজশক্তিবোধ ও ইচ্ছাবোধের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা প্রাকৃতিক কারণের পরিচয় পাই। এই নিজশক্তি ও ইচ্ছাসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়া দিয়া, কেবল বাহ্য দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক কার্য্য আলোচনা করিলে আমরা প্রাকৃতিক কারণের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া দূরে থাকুক্, কারণ বলিয়া যে কিছু আছে, তাহাই জানিতে পারিতাম না। যে অভিজ্ঞতাতে কারণ সম্বন্ধে বিশ্বাস ও কারণের ধারণা পাওয়া সম্ভব, সেই অভিজ্ঞতার আলোকে দেখি প্রকৃত কারণ ইচ্ছা ও শক্তিময় পুরুষ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। যাঁহারা কারণকে কেবল বস্তু, কার্য্যান্তর বা শক্তি বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কারণের এক এক দেশমাত্র দেখেন। ইচ্ছাময় পুরুষরূপ কারণের স্থায়িত্বে বস্তুর ভাব, নির্ব্বাচনক্রিয়ায় কার্য্যের ভাব, এবং কর্ত্তৃত্বে শক্তির ভাব রহিয়াছে, এবং এতদ্ব্যতীত নির্ব্বাচন বা ইচ্ছাশক্তিতে ঘটনার বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ততা বর্ত্তমান।

উপরোক্ত কারণবাদ সম্বন্ধীয় যুক্তিকে মার্টিনো প্রাকৃতিক বিচিত্র শৃঙ্খলা, এবং জীবের অসংখ্য প্রয়োজন সিদ্ধি বিষয়ে প্রাকৃতিক বস্তুর আশ্চর্য্য উপযোগিতার নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার "ষ্টাডি অব্ রিলীজিয়ন" গ্রন্থের যে অংশে এই দৃষ্টান্ত-পরম্পরা বর্ণিত

হইয়াছে, তাহা অতি সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। কিন্তু এস্থলে তাহার উল্লেখ ব্যতীত আর কিছুই করা সম্ভবপর নহে।

ঈশ্বরের কারণত্ব হইতে তাঁহার কতিপয় প্রাকৃতিক স্বরূপ (natural attributes) নির্ণীত হয়। প্রথমতঃ, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। 'সর্ব্বশক্তিমান্' শব্দের দুটী অর্থ হইতে পারে, (১) দৃশ্যমান বিশ্ব-সৃষ্টিতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন, সেই পরিমাণ শক্তি-সমন্বিত; (২) অনন্ত শক্তি-সম্পন্ন, সমুদায় কার্যোপযোগী শক্তিবিশিষ্ট। দৃশ্যমান জগতে যে শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা যে ঈশ্বরের অধিকতর শক্তি আছে, সমুদায় কার্য্যোপযোগী শক্তিই আছে, তাহার প্রমাণ এই যে জগৎ যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা-প্রসূত, ঈশ্বরের নির্ব্বাচন কার্য্যের ফল, তখন বুঝিতে হইবে যে জগৎ যত প্রকার হইতে পারিত, সমস্ত প্রকারের মধ্য হইতে ঈশ্বর বর্ত্তমান প্রকার নির্ব্বাচন করিয়াছেন। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে জগৎ ঠিক তাঁহার ইচ্ছানুরূপই হইয়াছে; শক্তির অভাবে তিনি ইচ্ছানুরূপ জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই, এরূপ অনুমান অমূলক। আর, চিন্তার দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, যাহা কিছু স্ববিরোধী নহে তাহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, স্ববিরোধী যাহা তাহাই অসম্ভব। জগৎ যে অন্যরূপ হইতে পারিত, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু জগৎ যে-কয় প্রকার হইতে পারিত, তাহা যে অসংখ্য তাহা বলা যায় না। হইতে পারে যে কয়েকটা প্রকার ছাড়া আর সমুদায়ই স্ববিরোধী, অসম্ভব, সেই জন্যই সেই সেই প্রকারে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ বাহিরের দিক্ হইতে দেখিলে দেখা যায় শক্তির সীমা কেবল শক্তিই হইতে পারে। ঈশ্বরের শক্তি যদি সসীম হয়, তবে তাঁহার বিরোধী অন্য শক্তি আছে। কিন্তু তিনিই যখন জগতের একমাত্র কারণ,—তখন তাঁহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় শক্তি থাকা অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয় কারণ। মার্টিনো ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে এমন কতিপয় ইঙ্গিত করিয়াছেন যে সমস্ত পরিস্ফুটভাবে ব্যাখ্যা করিলে অতি দৃঢ় প্রমাণরূপে দাঁড়াইত,—যথা, সসীম বস্তু সমূহের সীমা নিয়মিত করিতে, বিচিত্রতার কারণ দর্শাইতে, সংখ্যা বিধান করিতে, শক্তিসাম্যের উপর অধ্যক্ষতা করিতে, এক অখণ্ড সর্ব্বাধার কারণের প্রয়োজন, সেই কারণ

না পাইলে বুদ্ধি পরিতৃপ্ত হয় না, ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল কথা তাঁহার গ্রন্থের দার্শনিক বিভাগে ব্যাখ্যা করা হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস যে এই সকল কথা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিলে মার্টিনোর দ্বৈতবাদ অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত। ঈশ্বরের একত্বের প্রমাণ তলাইয়া দেখিলে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, তাহার আভাস পাঠক আমাদের পূর্ব্ব প্রবন্ধদ্বয়ে কতক পাইয়া থাকিবেন। যাহা হউক, মার্টিনো ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে পরিস্ফুট ভাবে দুটী প্রমাণ দিয়াছেন। একটী প্রমাণ এই যে, এক মাত্র কারণ দ্বারা জগৎ ব্যাখ্যাত হইলে দ্বিতীয় কারণ কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন, সুতরাং যুক্তি-বিরুদ্ধ। দ্বিতীয় প্রমাণ জগতের একত্ব। জগতের সমস্ত বিভাগই একরূপ উপাদানে নির্ম্মিত, একরূপ নিয়মে নিয়মিত। পরস্পর হইতে দূরতম স্থানসমূহের মধ্যেও আকর্ষণাদি ক্রিয়া চলিতেছে। এক সর্ব্বব্যাপী ইথার আকাশের সমস্ত অংশকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে ও ইহার তরঙ্গযোগে পরস্পরের মধ্যে আলোক উত্তাপাদির আদান প্রদান চলিতেছে। এক অভঙ্গ ক্রমবিকাশসূত্র কালের সমস্ত বিভাগকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ফলতঃ জগতের ইতিহাস পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ইতিহাস নহে,—গভীর যোগে আবদ্ধ নানা অংশযুক্ত একটী বস্তুর ইতিহাস। জগতের এক বস্তুর পরিবর্ত্তনে অপর বস্তুর পরিবর্ত্তন ঘটে, এক ঘটনায় আর এক ঘটনা উৎপাদন করে। জগতের কারণ ও আশ্রয় এক না হইলে এই যোগ ও একত্ব সম্ভব হইত না। বাস্তবিক কথা তাই কি? জগৎ কার্য্যের একত্ব কি বহু দেবতার ঐকমত্যের ফল হইতে পারে না? আর, আমাদের জ্ঞাত জগতের অতিরিক্ত এমন জগৎ কি থাকিতে পারে না যাহা অপর একজন ঈশ্বরের রাজ্যভুক্ত?

তৃতীয়তঃ ঈশ্বরের জ্ঞান। তাঁহার ইচ্ছার প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান সপ্রমাণ হইয়াছে, কারণ ইচ্ছা জ্ঞান-সাপেক্ষ। জগতের নিয়ম শৃঙ্খলা, বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য ঐশ্বরিক জ্ঞানের প্রমাণকে আরো সুদৃঢ় করিতেছে। মানবের জ্ঞান—মানবের বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্প—ঐশ্বরিক কার্য্যের যথাযথ ব্যাখ্যা ও অনুকরণ করিয়াই মহীয়ান্ হয়। যে পরিমাণে বিজ্ঞান ও শিল্প ঐশ্বরিক কার্য্যের অনুসারী ও অনুরূপ, সেই পরিমাণেই ইহারা

জ্ঞানের পরিচায়ক। যে পরিমাণে ইহারা ঐশ্বরিক কার্য্যের সহিত অসংলগ্ন, সেই পরিমাণে ইহারা মিথ্যা ও অনুপযুক্ত। যে জগৎ-কার্য্যের ব্যাখ্যা ও অনুকরণে এত জ্ঞানের প্রয়োজন, সেই কার্য্য যে জ্ঞানপ্রসূত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহা মূলে নাই তাহা প্রতিবিম্বে কিরূপে থাকিবে?

চতুর্থতঃ ঈশ্বরের অনন্তত্ব। মার্টিনোর কারণবাদে প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তার স্থান নাই। লৌকিক ভাষায় যাহা জড় বলিয়া বর্ণিত, মার্টিনোর মতে তাহা এক দিকে ইন্দ্রিয়বোধ-পরম্পরা এবং অপরদিকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শক্তি। অন্ধ জড়শক্তি বলিয়া কিছু নাই, সমুদায় প্রাকৃতিক শক্তিই সাক্ষাৎ ঐশী শক্তি। প্রতিরোধ (resistance), যাহাকে জড়ের মৌলিক গুণ বলিয়া বোধ হয়, তাহাও সাক্ষাৎ ঐশী শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। মার্টিনোর প্রথম জীবনে লিখিত প্রবন্ধাদিতে জড়ের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত হইয়াছিল, এবং তাঁহার ইদানীং প্রকাশিত "সীট্ অব্ অথরিটি" নামক গ্রন্থের এক স্থানে উক্ত মতের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার "ষ্টাডি অব্ রিলীজিয়ন নামক গ্রন্থে এই মত নাই। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, একদিকে নানা রূপিনী অদ্বিতীয়া ঐশী শক্তি, অপর দিকে স্বাধীন মানবের শক্তি, এই দুই শক্তি ছাড়া জগতে আর কোন শক্তি নাই। মানব ও ঈশ্বরের মধ্যে জড় বলিয়া কোন মধ্যবর্ত্তী নাই। প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিতে গিয়া মানব বস্তুতঃ সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরের সংস্পর্শেই আসে। কিন্তু মানব স্বাধীন হইয়াও নিত্য নহে, স্বয়ম্ভু নহে, সে ঈশ্বরের সৃষ্ট। সুতরাং একমাত্র নিত্য, পরনিরপেক্ষ বস্তু কেবল ঈশ্বর। তাঁহার অতিরিক্ত, তাঁহা-নিরপেক্ষ বস্তু কিছুই নাই। কিন্তু নিত্য পর-নিরপেক্ষ বস্তু না থাকিলেও এরূপ কার্য্যভূমি, কার্য্যক্ষেত্র, একটী আছে; সেটী আকাশ। আকাশ ঈশ্বরনিরপেক্ষ, ঈশ্বর হইতে ভিন্ন এবং ঈশ্বরের কার্য্যক্ষেত্ররূপে নিত্য বর্ত্তমান। ঈশ্বর হইতে ভিন্ন এই আকাশরূপ কার্য্যক্ষেত্র যদি না থাকিত, ঈশ্বরই যদি সর্ব্বেসর্ব্বা হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে কার্য্য করা অসম্ভব হইত, তাঁহা হইতে জগদুৎপত্তি অসম্ভব হইত। কার্য্যের পক্ষে কতকটা দ্বৈতভাব চাই; ঈশ্বরও আকাশের মধ্যে সেই দ্বৈতভাব বর্ত্তমান। আমরা বলি ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, আকাশ জ্ঞানাধীন বিষয় বা জ্ঞানের প্রকরণ (Form) মাত্র। সুতরাং ইহা কখনও

ঈশ্বর-নিরপেক্ষ হইতে পারে না। আকাশকে ঈশ্বর-নিরপেক্ষ করিতে গিয়া মার্টিনো তাঁহাকে আকাশস্থ বস্তু অর্থাৎ প্রকারান্তরে সসীম বস্তু করিয়া ফেলিয়াছেন। আকাশকে ঈশ্বর-নিরপেক্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে ঈশ্বরের অনন্তত্ব সম্বন্ধীয় প্রমাণ,—সমগ্র আকাশই যে ঈশ্বরের আয়ত্ত, এই বিষয়ের প্রমাণ—কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু মার্টিনো এই সত্যের প্রমাণ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই প্রমাণ এই,—যদি সমগ্র আকাশ ঈশ্বরায়ত্ত না হইয়া একটা বিশেষ অংশ মাত্র ঈশ্বরায়ত্ত হয়, তবে জিজ্ঞাস্য এই, ঈশ্বরের এই বদ্ধ ভাবের কারণ ঈশ্বরের বাহিরে কি ভিতরে? ইহা ঈশ্বরাতিরিক্ত অন্য শক্তি জনিত, কি ঈশ্বরপ্রকৃতির আভ্যন্তরিক বদ্ধভাব-জনিত? ঈশ্বর যখন জগতের একমাত্র কারণ,—সমুদায় কারণত্ব, কর্ত্তৃত্ব, যখন তাঁহাতেই পর্য্যবসিত,—তখন তাঁহার অতিরিক্ত,—তাঁহার কার্য্যের প্রতিরোধকারী—কোন শক্তির অস্তিত্ব অসম্ভব। [পাঠক দেখিয়াছেন যে, মার্টিনো ঈশ্বরের একত্ব প্রকৃতপক্ষে প্রমাণ করিতে পারেন নাই।] * সুতরাং একমাত্র সম্ভাবনা এই থাকিতেছে যে, উক্ত বদ্ধভাব তাঁহারই প্রকৃতির ক্ষীণতা-জনিত। যদি তাহাই হয়, তবে এরূপ ঈশ্বর আর কারণ রহিলেন না, তিনি কার্য্যের পদবীতে যাইয়া পড়িলেন। তাহা হইলে তাঁহার সম্বন্ধে এই সকল প্রশ্ন উঠে—তাঁহার যে এই বিশেষ পরিমাণ, ইহার কারণ কি? ইহা অধিকতর বা অল্পতর নহে কেন? তিনি এই বিশেষ দেশখণ্ডে অবস্থিত কেন? অন্যত্র নহেন কেন? ঈদৃশ পরস্পর-বিরুদ্ধ সম্ভবনীয় ব্যাপারের মধ্য হইতে একটা নির্ব্বাচন করিবার জন্য এমন একটা মূল কারণ আবশ্যক, যাহার সম্বন্ধে এই সকল প্রশ্ন উঠা অসম্ভব। সেই মূল কারণই প্রকৃত ঈশ্বর। সুতরাং মূল কারণরূপী ঈশ্বরকে সসীম বলিবার যো নাই, তাঁহার সম্বন্ধে ইহা বলা অসঙ্গত যে, কার্য্যক্ষেত্ররূপ আকাশের কোন অংশ তাঁহার অনায়ত্ত। আমরা বলি, যাহা কার্য্য, যাহা ঘটনা, তাহার সম্বন্ধেই উপরিউক্ত- প্রশ্নগুলি উঠে। ঈশ্বর-শক্তির ক্ষীণতা যখন একটা কার্য্য নহে, ঘটনা নহে, তখন তার কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। মার্টিনোর কারণবাদের সহিত আমরা সসীম

* বন্ধনীর ভিতরকার কথাগুলি আমাদের মন্তব্য।

ঈশ্বরবাদের কোন অসামঞ্জস্য দেখি না। বরঞ্চ তাহাতে সসীম ঈশ্বরবাদ অপরিহার্য্য।

ঈশ্বর ও মানবের সম্বন্ধ বিষয়ে মার্টিনোর মত এই যে ইন্দ্রিয়বোধ, সুখ দুঃখ, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি যে সকল মানসিক ব্যাপারে আমাদের কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায় না, যে সকল ব্যাপারে আমরা কর্ত্তা নহি, ক্রিয়ার ক্ষেত্র মাত্র, সেই সকল বিষয়ে মানব ঈশ্বরের অধীন। কিন্তু জ্ঞান, চিন্তা, বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক বিচার, সঙ্কল্প-জাত মানসিক ও শারীরিক কার্য্য প্রভৃতি যে সকল ব্যাপারে আমরা ক্রিয়াশীল, সেই সকল বিষয়ে আমরা ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র। আমরা এককালে ছিলাম না, এখন আছি, ইহাতে প্রমাণ হয় বটে যে ঈশ্বর আমাদিগকে এক কালে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে আমরা তাঁহার অধীন নহি। [কর্ত্তৃত্ব যে জ্ঞানোদয়ের উপর, স্মৃতির উদয়ের উপর, নির্ভর করে, আর জ্ঞান ও স্মৃতির উদয় যে সম্পূর্ণরূপেই ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বাধীন, পাঠক তাহা প্রথম প্রবন্ধদ্বয়ে দেখিয়াছেন। মানবশক্তি ঐশী শক্তিরই অনুপ্রকাশ, ইহা কিরূপে ঈশ্বর-নিরপেক্ষ হইবে ?] যাঁহারা ঈশ্বরের অনন্তত্ব বজায় রাখিবার জন্য মানব-প্রতিভাকে ঈশ্বরানুপ্রাণন ও মানব শক্তিকে ঐশী শক্তি বলিয়া বর্ণনা করেন, মার্টিনো তাঁহাদের মতের নিতান্ত বিরোধী। তিনি বলেন আমরা ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র না হইলে তাঁহাকে জানিতেই পারিতাম না। মানব-কর্ত্তৃত্ব ও ঐশ্বরিক কর্ত্তৃত্বের সংঘর্ষণেই ঈশ্বর মানবকর্ত্তৃক জ্ঞাত হন। নিজ শক্তি ও ঐশী শক্তির মধ্যে প্রভেদবোধের অবস্থায়ই মানব ঈশ্বরকে জানে। এই প্রভেদবোধ যদি না থাকিত, তবে ঈশ্বরই কেবল আপনাকে জানিতেন, ঈশ্বর সম্বন্ধে মানবীয় জ্ঞান অসম্ভব হইত, সুতরাং প্রকৃত পক্ষে মানবের অস্তিত্বই থাকিত না। [মার্টিনোর মতে পরস্পর বিরোধী দুটী শক্তির সংঘর্ষণ ব্যতীত জ্ঞান অসম্ভব। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে মানব-সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের আত্মজ্ঞান ছিল না !] কিন্তু মানব ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক যোগে আবদ্ধ। মার্টিনোর মতে আমাদের বিবিধ কার্য্য-প্রবৃত্তি (Springs of Action) এর মধ্যে একটী অপরিবর্ত্তনীয় উচ্চ নীচের ভেদ রহিয়াছে। যথা, শারীরিক সুখলিপ্সা

অপেক্ষা মানসিক উন্নতির ইচ্ছা উচ্চতর, মানসিক উন্নতির ইচ্ছা অপেক্ষা সন্তান-বাৎসল্য ও স্বজন-প্রিয়তা উচ্চতর, স্বজন-প্রিয়তা অপেক্ষা নর-হিতৈষণা উচ্চতর, ইত্যাদি। যখন দুটী কার্য্য-প্রবৃত্তির সংঘর্ষণ হয়, তখন আমরা অনুভব করি যে উচ্চতর প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে আমরা বাধ্য; নিম্নের উপর উচ্চের এমন একটী প্রাধান্য আছে, কর্ত্তৃত্ব আছে, যাহা আমাদের মাননীয়। এই বাধ্যতাবোধ ও কর্ত্তৃত্ববোধকেই মার্টিনো বিবেক বলেন। তাঁহার মতে এই বিবেক আমাদের ভিতরকার বস্তু হইলেও ইহা আমাদের আত্মাতিরিক্ত একটী উচ্চতর আত্মার সুস্পষ্ট প্রমাণ। যেমন ইন্দ্রিয়বোধাদি মনোবিকার ভিতরকার বস্তু হইয়াও বহিঃশক্তির প্রমাণ, তেমনি বিবেক ভিতরকার বস্তু হইয়াও একটী উচ্চতর আত্মার, পরমাত্মার, মৌলিক ও স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। বিবেক আমাদিগকে যে কর্ত্তৃত্বের সহিত উচ্চতর প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে বলে, সেই কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব। বাহ্য পুরস্কার ও দণ্ড না পাইলেও, পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম দ্বারা স্বভাবতঃ আমাদের মনে যে আত্মপ্রসাদ ও আত্মগ্লানি উৎপন্ন হয়, তাহাতে এই ঐশ্বরিক কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধীয় বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে। সুতরাং যেমন কারণ-বিজ্ঞানে, তেমনি নীতি-বিজ্ঞানে, আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপের প্রমাণ পাইতেছি। আমাদের কার্য্য-প্রবৃত্তি সমূহের মধ্যে উচ্চতা নীচতা অনুসারে যে শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে, ইহাতে ঈশ্বরের নৈতিক স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যিনি মানবের নৈতিক প্রকৃতির স্রষ্টা, যিনি বিবেক দ্বারা তাহাকে সর্ব্বদা পবিত্রতার পথে অগ্রসর করিতেছেন, তিনি যে স্বয়ং শুভসংকল্প, পবিত্রস্বরূপ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। যেমন আলোক-রশ্মির মধ্যে বর্ণ-বৈচিত্র্য নিহিত না থাকিলে তাহা বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হইতে পারিত না, যেমন সূর্য্যের উত্তাপ না থাকিলে সৌর গ্রহ সমূহে উত্তাপ সম্ভব হইত না, তেমনি ঈশ্বর-স্বরূপে সহানুভূতি, স্নেহ, দয়া, পুণ্যের প্রতি প্রসন্নতা, পাপের প্রতি ঘৃণা প্রভৃতি না থাকিলে মানব-প্রকৃতিতে দৃশ্যমান বিচিত্রতা সম্ভব হইত না, এবং তিনি পূর্ণ পবিত্রস্বরূপ না হইলে আমাদের বিবেক পূর্ণ পবিত্রতার পক্ষপাতী হইত না। মার্টিনো আমাদের নৈতিক প্রকৃতি আলোচনা করিয়া

ঈশ্বরের চারিটী নৈতিক স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। (১) সমুদায় সুখ দুঃখানুভবক্ষম জীবের প্রতি দয়া অর্থাৎ সুখী করিবার ইচ্ছা। ইহার প্রমাণ আমাদের কার্য্য-প্রবৃত্তি সমূহের সমাজিকতা ও পরসুখ বর্দ্ধনের দিকে অভি-মুখিতা। ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় জন্তুর মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে পরাভিমুখী গতি বর্ত্তমান। মানবের সহানুভূতি, স্নেহ, দয়া, নিস্বার্থ হিতৈষণা প্রভৃতিতে এই গতির বিশেষ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিহিংসা প্রভৃতি প্রবৃত্তিকে আপাততঃ ইহার বিরোধী বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহারা প্রকৃত পক্ষে পরানিষ্টার্থ নহে, আত্মরক্ষার্থই বিহিত হইয়াছে। (২) ন্যায়পরতা অর্থাৎ মানবের নৈতিক উচ্চতা নীচতা অনুসারে তাহার প্রতি যথাবিহিত আচরণ,—পুণ্যবানকে পুরস্কার ও পাপীকে দণ্ড দান। আমা-দের নৈতিক প্রকৃতি মানবকে যে চক্ষে দেখে, পুণ্যবানকে যেরূপ শ্রদ্ধা করে, পাপীকে যেরূপ ঘৃণা করে, পুণ্যবানের পুরস্কারে ও পাপীর দণ্ডে যেরূপ সন্তুষ্ট হয়, ইহাতেই সুস্পষ্টরূপে ঈশ্বরের ন্যায়পরতা সপ্রমাণ হয়। (৩) নৈতিক সংগ্রামবিজয়ী প্রশান্তাত্মা প্রেমিকদিগের সহিত সখ্য ভাব ও আধ্যাত্মিক যোগ। এরূপ পুণ্যাত্মাদিগের প্রতি আমরা যে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি অনুভব করি, এরূপ সিদ্ধ পুরুষগণ পরস্পরের সহিত যেরূপ আন্তরিক যোগ অনুভব করেন, ইহাই ঈশ্বরের সখ্য ভাবের প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত সিদ্ধাত্মাদিগের অভিজ্ঞতাও আর এক প্রমাণ। ইহাঁরা ঈশ্বর হইতে যে সাক্ষাৎ প্রেমের নিদর্শন ও অনুপ্রাণন লাভ করেন বলিয়া সাক্ষ্য দেন, সেই সাক্ষ্য সম্পুর্ণ স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য। (৪) ঈশ্বর ধর্ম্মরাজ, আমরা তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যের প্রজা। ঈশ্বরের সহিত আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ কেবল ব্যক্তিগত নহে, ইহা সামাজিকও বটে। প্রত্যেক মানবের সহিত ঈশ্বরের যোগ আছে, আবার মানবসমাজে গভীর সাদৃশ্য ও যোগ বর্ত্তমান। সুতরাং ঈশ্বরের সহিত আমাদের সাধারণ যোগ, সামাজিক যোগ, বিদ্যমান। এই সম্বন্ধ সমুদায় কর্ত্তব্যকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যে এবং সমুদায় অপরাধকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অপরাধে পরিণত করে। এই সম্বন্ধ অনুভব করিলেই মানব বুঝিতে পারে যে সে এক মহান্ স্বর্গরাজ্যের অন্তর্গত; সেই রাজ্যের রাজা ঈশ্বর, সেই রাজ্যের প্রজা প্রত্যেক স্বাধীন জীব।

ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া, মানব প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ করিয়া, পৃথিবীতে সম্যক্‌রূপে সেই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করাই সমুদায় ধর্ম্মসাধনের লক্ষ্য।

উপাস্য ও উপাসক।

সাধারণ উপাসক উপাস্যকে সাক্ষাৎভাবে না জানিয়াই উপাসনা করেন। তিনি সাক্ষাৎ ভাবে যাহা জানেন, তাহা তিনি ব্রহ্মাতিরিক্ত জগৎ ও ব্রহ্মাতিরিক্ত জীবাত্মা বলিয়া মনে করেন। তাঁহার পক্ষে ব্রহ্ম জগৎ ও আত্মার পশ্চাতে। তিনি উপাস্য সম্বন্ধে অনেক কথা বিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু সে বিশ্বাসের তাদৃশ স্থিরতা নাই। ঈশ্বর আমার চিন্তার বাহিরে, অথচ তিনি আমার চিন্তা জানিতেছেন, আমি তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র, অথচ তিনি আমার আধার, বিবেক আমার একটা মনোবৃত্তি, অথচ ইহা তাঁহার সাক্ষাৎ আদেশ, এই সকল বিশ্বাস যখন তখনই টলিয়া যায় এবং উপাসনা-সাধনে বিঘ্ন জন্মায়। অতএব যাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, জীব ও ব্রহ্মের মৌলিক একতা স্বীকার করিলে উপাসনা কিরূপে সম্ভব হয়, তাঁহাদের অগ্রে ভাবিয়া দেখা উচিত জীব ও ব্রহ্মের মৌলিক ভেদ স্বীকার করিলে কিরূপে উপাসনা সম্ভব হয়, অথবা তারও পূর্ব্বে এই ভাবা উচিত, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মজ্ঞানে যে আত্মবস্তু সাক্ষাৎ ভাবে, প্রত্যগাত্মারূপে, প্রকাশিত হন, সেই আত্মা ছাড়া অন্য আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ কোথায়?

এই পত্রের প্রথম প্রবন্ধদ্বয়ে জীব ও ব্রহ্মের যে বস্তুগত অভেদ ও প্রকাশগত ভেদ দেখান হইয়াছে, তাহাতে কিরূপে উপাসনা সম্ভব দেখা যাক্। যিনি বিষয় ও বিষয়ীকে, জীব ও ব্রহ্মকে, মূলে এক বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহার উপাস্য অজ্ঞাত বস্তু নহেন, কেবল বিশ্বাসের বস্তু নহেন, তিনি অন্তরে বাহিরে প্রকাশিত, সাক্ষাৎ দৃষ্টিতে দৃষ্ট। যাঁহার পক্ষে জড় জগতের জড়ত্ববোধ দূর হইয়াছে, যিনি প্রত্যেক পরমাণুকে আত্মার প্রকাশ বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি উপাসনাকালে চক্ষু মেলিয়া জড় দেখেন না, আত্মাকেই দেখেন। তিনি উপাস্যকে জগতের পশ্চাতে খুঁজিতে যান না, জগৎরূপেই

প্রকাশমান দেখেন। চক্ষু মুদিয়াও তিনি বিশ্বাত্মা হইতে স্বতন্ত্র কোন ক্ষুদ্র আত্মাকে দেখেন না,—ইন্দ্রিয়-গোচর বস্তুতে যে সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে দেখিয়াছেন, ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে তিনি সেই আত্মাকেই দেখিতে পান। জ্ঞানালোকে যখন অহংকার দূর হয়, যখন জীবের স্বতন্ত্রতাবোধ দূর হয়, তখন আর উপাস্যকে খুঁজিতে হয় না, তখন তিনি উপাসকের নিজ আত্মারূপে প্রকাশিত হন। তখন উপরি-উক্ত সন্দেহ সমূহ একবারে কাটিয়া যায়। উপাস্য আমার চিন্তার বাহিরে, তবে কিরূপে আমার চিন্তা জানিতেছেন? তখন এই প্রশ্ন আর উঠে না, কেন না তখন উপাস্য আর চিন্তার বাহিরে থাকেন না, তিনি স্বয়ং চিন্তার আধার, চিন্তারূপী হইয়া প্রকাশিত হন। তখন উপাস্যের জ্ঞান প্রেম পবিত্রতাদি লক্ষণ কেবল পরোক্ষ চিন্তার বিষয় থাকে না, উপাস্য তখন নিজ স্বরূপে, নিজ জ্ঞান প্রেম পবিত্রতা লইয়া, উপাসকের নিজ আত্মারূপে প্রকাশিত হন। তখন উপাস্যকে অন্বেষণ করা অসম্ভব হয়, কারণ তখন অন্বেষণকারী ও অন্বেষ্টব্যের ভেদবুদ্ধি থাকে না।

কিন্তু ভেদবুদ্ধি দূর হওয়াতে অবিশ্বাস, সন্দেহ, অজ্ঞানতা প্রভৃতি বিঘ্ন কাটিয়া গেলেও আর এক নূতন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না কি? উপাস্য উপাসকের একান্ত ভেদ যদি উপাসনার বিঘ্ন হয়, তাহাদের একান্ত অভেদ কি তদপেক্ষাও গুরুতর বিঘ্নও নহে। উপাস্য মহান্, উপাসক ক্ষুদ্র; উপাস্য পূর্ণ, উপাসক অপূর্ণ; উপাস্য দাতা, উপাসক গ্রহীতা; উপাস্য উপাসকে এরূপ ভেদ না থাকিলে উপাসনা কিরূপে সম্ভব? আমাদের বক্তব্য এই যে আমরা যে অভেদের কথা বলিয়াছি, সেই অভেদ একান্ত অভেদ নহে, তাহার ভিতরে এক প্রকার ভেদবোধ বর্ত্তমান; এই ভেদবোধই উপাসনা সম্ভব করে। এই ভেদবোধ অজ্ঞানতা-জনিত নহে, উজ্জ্বল জ্ঞানের অবস্থায়ও ইহা দূর হয় না। দেখা যাক্ কোথায় সেই ভেদবোধ। উপাসক উপাস্যকে নিজ আত্মারূপে উপলব্ধি করিয়া অবিশ্বাস, সন্দেহ ও বিচ্ছেদ-জনিত দুঃখ হইতে মুক্ত হইলেন। এই উপলব্ধিতে বস্তুগত একতার ভাব এত পরিষ্কার যে তাহা অস্বীকার করা অসম্ভব। যাঁহারা এই একতা দেখেন না, তাঁহারা কি উপলব্ধি করেন জানি না। কিন্তু এই উপলব্ধি একতা-মূলক হইলেও ইহার মধ্যে সূক্ষ্মভাবে একটি ভেদবোধ বর্ত্তমান। উপলব্ধির পূর্ব্বেও উপাস্য উপাসকের আত্মারূপী ছিলেন, এখনও তাহাই,

অথচ দুটী অবস্থার কত প্রভেদ! উপলব্ধির পূর্ব্বেও উপাস্য উপাসকের আত্মারূপী ছিলেন বটে, কিন্তু আত্মারূপে পরিচয় দেন নাই, আত্মোপলব্ধি-রূপ সম্পত্তিকে উপাসকের জীবনে প্রকাশ করেন নাই। এই যে প্রকাশ ও অপ্রকাশের ভেদবোধ, ইহাতেই উপলব্ধির মিষ্টতা সম্পাদন করে; সুতরাং উপলব্ধি একতা-মূলক হইলেও ইহা একান্ত ভেদ-বর্জ্জিত নহে। এই সূক্ষ্মভেদ যোগের গভীর অবস্থায়ও যাইতে পারে না। পরিপূর্ণ, নিত্যপ্রকাশ, নিত্যযোগী পরমাত্মার কথা বলিতে পারি না; তাঁহাতে ভেদবোধ থাকিলে কি ভাবে আছে জানি না। কিন্তু অপূর্ণ উপাসক যতই উন্নত হউন না কেন, তাঁহার মধ্যে অত্যুন্নত যোগের অবস্থায়ও ভেদবোধ থাকিবে, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। একতা-মূলক গভীর উপলব্ধির অবস্থায়ও উপাসক-জীবনে উপাস্যের অনন্ত জ্ঞান শক্তি প্রকাশিত হয় না। তখনও সেই জীবনে তরঙ্গ বহিতে থাকে। জগতের বিচিত্রতা ভুলিয়া যাওয়াকে যাঁহারা যোগের পরাকাষ্ঠা মনে করেন, ব্রহ্মের প্রেমানন্দের সাক্ষাৎ লীলারূপ জগৎকে যাঁহারা অজ্ঞানের বিজৃম্ভন বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাঁহাদের কিরূপ হয় বলিতে পারি না। কিন্তু যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে ব্রহ্মের জগৎলীলা ভুলিবার বস্তু নহে, সাধনের বস্তু, তাঁহারা যোগের অবস্থায় সেই লীলাকে ভুলেন না, পরন্তু ইহাকে যোগদৃষ্টিতে দেখিতে প্রয়াস পান। এরূপ দর্শন করিতে গিয়া উপাস্য উপাসকের ভেদ স্পষ্টরূপেই উপলব্ধি হয়, একতামূলক যোগদৃষ্টিও সেই ভেদবোধের বিলয় করিতে পারে না। উপাস্যের পূর্ণ জ্ঞানে জগৎ নিত্য বর্ত্তমান, উপাসকের জীবনে জগতের জ্ঞান অপূর্ণরূপে, অস্থায়ী-প্রবাহরূপে, আসিতেছে যাই-তেছে; উপাস্যের পূর্ণ শক্তিতে সমগ্র জগৎ নিয়ত পরিচালিত হইতেছে, উপাসক সেই শক্তির ক্ষুদ্র অংশ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া উপাস্যের সহযোগিতা করিতেছেন, তাঁহার একাঙ্গরূপে কার্য্য করিতেছেন,—এবম্বিধ ভেদবোধ উপাসকের মধ্যে স্পষ্টরূপেই বর্ত্তমান থাকে। তিনি গভীর একতা আস্বাদন করিয়া খ্রীষ্টের সহিত "আমি ও আমার পিতা এক" ইহাই বলুন, আর আর্য্য ঋষির সহিত 'অহংব্রহ্মাস্মি'ই-বলুন, তাঁহার ব্যক্তি-গত জীবন যে লীলাময়ের "অখিল লীলারসের" একটী বিন্দুমাত্র, তাহা তিনি কখনও বিস্মৃত হন না। এই ধারণা যে স্থলে আছে, সে স্থলে উপাস্য উপাসকের, সেব্য সেবকের, ভেদবোধ ও সেই ভেদবোধ-জনিত সাধনা কখনও বিলুপ্ত হয় না। কিন্তু এই ভেদবোধ সাধারণ স্থূল ভেদবোধ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন,—এত ভিন্ন যে একত্বদর্শী অনেক সাধকই ইহাকে ভেদবোধ বলিতে অসম্মত।

প্রকাণ্ড বিষয়টাকে আমরা স্থানাভাবে অতি অল্প কথায় বলিতে বাধ্য হইলাম। পরে এই বিষয়ে আরো বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ওঁ
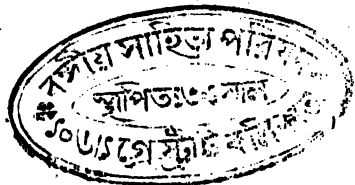
ব্রহ্মতত্ত্ব।

১। মার্টিনোর বিবেকতত্ত্ব।

'বিবেক' অর্থ ভেদবোধ। যথা, নিত্যানিত্যবিবেক, অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য বস্তুর ভেদবোধ; আত্মানাত্মবিবেক, অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার ভেদবোধ; ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবেক, অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ভেদবোধ, ইত্যাদি। কিন্তু আধুনিক ধর্ম্মসাহিত্যে 'বিবেক' শব্দটী কেবল শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হইতেছে। আমরা ও বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহা সেই অর্থেই ব্যবহার করিব।

ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারের প্রকৃত বিষয় কি? উচিত, অনুচিত,—পবিত্র, অপবিত্র, এই সকল বিশেষণের বিশেষ্য কোন্ বস্তু? আপাততঃ কার্য্যকেই পবিত্র বা অপবিত্র বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মার্টিনোর মতে কার্য্য ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারের বিষয় নহে; কর্ত্তাই প্রকৃত বিষয়। কর্ত্তা ভাল বা মন্দ হইলেই আমরা কার্য্যকে ভাল বা মন্দ বলি। সভ্যতা, সুশিক্ষা ও ধর্ম্মের বাতাসের মধ্যে প্রতিপালিত ব্যক্তির কার্য্য, ও অসভ্য অশিক্ষিত অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তির কার্য্যের আমরা একরূপ বিচার করি না। ধনভারে ভারাক্রান্ত ধনীর দান ও ঘোর অভাবগ্রস্ত দরিদ্রের দানকে আমরা সমান চক্ষে দেখি না। দুই ব্যক্তি একটী বালককে প্রহার করিলে, কর্ত্তাভেদে একজনের প্রহার ধর্ম্ম, অপরের প্রহার অধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

কর্ত্তাই যদি বিবেক-বিচারের বিষয় হইল, তবে এখন দেখা আবশ্যক কর্ত্তার ভিতরকার ঠিক কোন্ বস্তুটা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিশেষণে বিশেষ্য। কর্ত্তৃত্বের ভিতরে তিনটী উপাদান পাওয়া যায়—(১) প্রবৃত্তি বা অভিপ্রায়, (২) তদনুযায়ী চেষ্টা বা অঙ্গ-পরিচালন, (৩) চেষ্টার বাহ্যফল। যথা, দরিদ্রের দুঃখ নিবারণাভিপ্রায়ে এক ব্যক্তি তাহাদিগকে অর্থদান করিলেন, তাহাতে তাহা-

দের দুঃখ দূর হইল। অপর এক ব্যক্তি তাহার অপমানকারীকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার শরীরে তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রয়োগ করিল, তাহাতে শেষোক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইল। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে যদি কোন কারণে দাতার দান দানপাত্রদিগের হস্তগত না হয় ও তদ্দ্বারা তাহাদের দুঃখ দূর না হয়, তথাপি দাতার প্রশংসনীয়তা নষ্ট হয় না, এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে, আঘাতের পাত্র যদি সৌভাগ্যবশতঃ হত বা আহত না হয়, তাহাতেও তাহার হননেচ্ছু ব্যক্তির নিন্দনীয়তা দূর হয় না। সুতরাং কর্ত্তার গুণাগুণ কার্য্যের বাহ্যফলের উপর নির্ভর করে না। তার পর দেখুন্ যদি প্রথমোক্ত কর্ত্তা কোন কারণে তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিতে অসমর্থ হন, যদি তৎপূর্ব্বে তাঁহার বাক্‌শক্তি বা চলন-শক্তি রুদ্ধ হয়, অথবা তাঁহার ধন অপহৃত হয়, তথাপি তিনি প্রশংসা ও শ্রদ্ধার পাত্রই থাকেন। তেমনি দ্বিতীয় স্থলে, যদি হননেচ্ছু ব্যক্তি ঐরূপ কোন কারণে তাহার ঘৃণিত ব্যক্তির গাত্রে অস্ত্রপ্রয়োগে অসমর্থ হয়, তথাপি সে নিন্দনীয়ই থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে চেষ্টা বা অঙ্গ পরিচালনও নিন্দা প্রশংসার বিষয় নহে। তার পর থাকে প্রবৃত্তি বা অভিপ্রায়, সুতরাং ইহাই ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের বিষয়; ইহাই পবিত্র বা অপবিত্র বিশেষণে বিশেষ্য।

কিন্তু মনে করুন্ এক ব্যক্তির মন রাগে পরিপূর্ণ, তাহার মনে আর কোন প্রবৃত্তি নাই। দয়া, ন্যায় প্রভৃতি অন্য কোন প্রবৃত্তির সহিত রাগের সংগ্রাম হইতেছে না। রাগ অবাধে, অপ্রতিহত ভাবে, তাহার মনে প্রভাবযুক্ত হইয়া তাহাকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিল। এস্থলে রাগ নিন্দনীয় কি না?—অধর্ম্ম বিশেষণে বিশেষ্য কি না? তেমনি, যে স্থলে কেবল ক্ষুধাই কার্য্যের পরিচালক, অন্য কোন প্রবৃত্তির সহিত ইহার সংঘর্ষণ নাই, সেস্থলে ইহা ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারের বিষয় কি না? মার্টিনো বলেন—না, প্রবৃত্তি সমূহের মধ্যে নিরপেক্ষ প্রশংসনীয়তা বা নিন্দনীয়তা, পবিত্রতা বা অপবিত্রতা, কিছুই নাই। পরস্পরের সহিত অসম্বদ্ধ অবস্থায় ইহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারের বিষয় নহে। যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংগ্রাম, সেখানেই ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারের অবকাশ। রাগান্বিত ব্যক্তি যখন কোন নির্দ্দোষ, দয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে প্রহার করে, তাহার মনে যখন রাগ ও দয়ার সংগ্রাম হয়, এবং সে দয়ার

অধিকারকে লঙ্ঘন করিয়া রাগকে প্রশ্রয় দেয়, তখনই তাহার রাগ নিন্দনীয়। তেমনি, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যদি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, বহু দিনের অনাহারে ম্রিয়মাণ ব্যক্তির কাতর ভিক্ষাকে অগ্রাহ্য করিয়া আহার করে, তবেই তাহার ক্ষুধা নিন্দনীয়। এরূপ সংঘর্ষণ ও সংগ্রামের স্থলে আমরা সাক্ষাৎভাবে অনুভব করি যে একটী প্রবৃত্তি অপরটী অপেক্ষা উচ্চতর, এবং উচ্চতর বলিয়াই অনুসরণীয়। সুতরাং মার্টিনোর মতে 'বিবেক' অর্থ—আমাদের মানসিক প্রবৃত্তি নিচয়ের আপেক্ষি ক উচ্চতানীচতা বোধ। উচ্চতরের অনুসরণীয়তা-বোধ এই উচ্চতা-নীচতাবোধের সহিত অপরিহার্য্যরূপে জড়িত।

ধর্ম্মজীবনের নিম্নতর সোপানে বাধ্যতাবোধ, বিবেকের কর্ত্তৃত্ববোধই প্রধানতঃ কার্য্যকে নিয়মিত করে। উচ্চতর প্রবৃত্তির অনুসরণ অনেক স্থলেই কষ্টকর হয়, সুতরাং কর্ত্তা অনিচ্ছাতে উহার অনুসরণ করে। কিন্তু প্রথম হইতেই বিবেকবাণীর প্রতি একটী অপরিস্ফুট শ্রদ্ধা ধর্ম্মকার্য্যের সহিত —বিবেকের আদেশ পালনের সহিত—জড়িত থাকে। এই অপরিস্ফুট শ্রদ্ধাটী ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া ধর্ম্মানুরাগরূপে, সাধুতার প্রতি প্রীতিরূপে, পরিণত হয়। ইহা যতই বিকাশপ্রাপ্ত হয়, ততই কর্ত্তব্য পালনের তিক্ততা —কর্ত্তব্য-বোধের বাধ্যতা— চলিয়া গিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান স্বেচ্ছানুগত ও মধুর হয়। নিজ ইচ্ছা ও বিবেকের আদেশ ক্রমশঃ এক হইয়া পবিত্রতা সহজ স্বাভাবিক হইতে থাকে। এই উন্নতির একটী অপরিহার্য্য ফল এই যে ব্যক্তিত্ব-বর্জ্জিত (impersonal) ধর্ম্মানুরাগ ক্রমশঃ ব্যক্তিগত শ্রদ্ধায় পরিণত হয়। যে সকল লোকের চরিত্রে ধর্ম্মানুষ্ঠান অনেক পরিমাণে স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে, কর্ত্তব্যবোধ ও ইচ্ছার বিবাদ অনেক পরিমাণে দূর হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি স্বভাবতঃই হৃদয় আকৃষ্ট হয়। সাধুচরিত্রের প্রতি হৃদয়ের এই আকর্ষণের নামই ভক্তি (reverence)। ভক্তি অসম্পূর্ণ চরিত্রে পূর্ণ তৃপ্তি পায় না। ইহা স্বভাবতঃই এমন একটী পাত্র অন্বেষণ করে যাঁহার প্রতি ইহা অপ্রতিহত ভাবে প্রবাহিত হইতে পারে। মানুষে ইহা যখন-তখনই আঘাত পায়। যাঁহার সমস্ত ইচ্ছাই পবিত্র, যাঁহাতে বাসনা ও কর্ত্তব্যের সংগ্রাম নাই, এরূপ একজন শান্ত শুদ্ধ পূর্ণপবিত্র পুরুষ ব্যতীত আর কিছুতেই ভক্তি তৃপ্তি

লাভ করিতে পারে না। অবিশ্বাসীর পক্ষে এই পূর্ণ পুরুষ একটী আদর্শ মাত্র। বিশ্বাসীর পক্ষে তিনি নিত্য নিকটস্থ ঈশ্বর। মার্টিনোর মত এই যে পূর্ণ পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই সমুদায় প্রবৃত্তির শ্রেষ্ঠ। ইহা প্রবৃত্তি-শ্রেণীর শীর্ষস্থানীয়। মার্টিনো ভক্তির যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যানুসারে ভক্তি ও কর্ত্তব্যের চলিত প্রভেদ নিতান্ত অমূলক। ভক্তি যখন সমুদায় কর্ত্তব্যের সার, জীবন ও শীর্ষস্থানীয়, তখন ভক্তিমান ব্যক্তি কখনও দুর্নীতিপরায়ণ হইতে পারে এরূপ কল্পনা নিতান্তই অসার, এবং ভক্তির আবার আতিশয্য হইতে পারে, ভক্তিকেও যথাযথ সীমায় আবদ্ধ রাখা আবশ্যক, এরূপ মতও নিতান্ত ভ্রান্ত। যাহা হউক, ঈশ্বর-ভক্তিকে প্রবৃত্তিশ্রেণীর শীর্ষস্থানে বসাইয়া মার্টিনো বলিয়াছেন, ইহার অব্যবহিত নিম্নে জীবের প্রতি দয়া। তন্নিম্নে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি প্রীতি—পারিবারিক ও সামাজিক প্রীতি। তৎপর বিস্ময়, মহত্ত্ববোধ ও সৌন্দর্য্যবোধ এবং তজ্জনিত জ্ঞানপিপাসা ও বিদ্যাচর্চ্চা। তৎপর শক্তি-প্রিয়তা, যশঃপ্রিয়তা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা। তন্নিম্নে অযত্ন-সম্ভূত ঘৃণা, ভয় ও ক্রোধ। পারিবারিক ও সামাজিক সম্বন্ধ-জনিত স্বাভাবিক প্রীতিতে এক প্রকার আনন্দ আছে, সেই আনন্দ বশতঃ এই সকল সম্বন্ধ সাধন করা ধর্ম্মজীবনের বড় একটা উচ্চ জিনিস নহে। প্রেমপাত্র অন্যায় কার্য্য করিলে তার প্রতি যে স্বাভাবিক ঘৃণা ও ক্রোধ হয়, সেই ঘৃণাও ক্রোধ উপরি-উক্ত কৃত্রিম প্রীতি দ্বারা প্রতিহত হওয়া উচিত নহে। সুতরাং এরূপ কৃত্রিম প্রীতিকে মার্টিনো এস্থলে স্বাভাবিক ঘৃণাদির নিম্নে স্থান দিয়াছেন। ইহার নিম্নে স্বাভাবিক কার্য্যশীলতা (spontaneous activity) যাহা কোন কর্ত্ত্যবোধের অধীন নহে, এবং যাহা মানব ও পশুর মধ্যে সাধারণ। তার পর ক্ষুধা তৃষ্ণাদি স্বাভাবিক বাসনা। এই সকল বাসনা যখন চিন্তা ও অভিসন্ধির সহিত মিশ্রিত হইয়া সুখপ্রিয়তারূপ কৃত্রিম আকার ধারণ করে, তখন ইহারা প্রবৃত্তি-শ্রেণীর আরও নিম্নতর সোপানে নামিয়া যায়। সুখ-প্রিয়তার নিম্নে আর কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে যাহারা প্রবৃত্তিশ্রেণীর নিম্ন-তম। সেই সকল প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিম্নতর প্রবৃত্তি আর নাই, সুতরাং সেই সমুদায়ের কোন আপেক্ষিক প্রশংসনীয়তা নাই, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে নিন্দনীয়

ও পরিত্যাজ্য বস্তু। নিন্দাশীলতা, প্রতিহিংসা ও সন্দিগ্ধতা এই নিম্নতম সোপানের অন্তর্গত। স্বাভাবিক ঘৃণা, ভয় ও ক্রোধ নিন্দার বস্তু নহে, কিন্তু এই সকল প্রবৃত্তি উচ্চতর প্রবৃত্তির শাসন তাচ্ছল্য করিয়া, স্বাভাবিক সীমা লঙ্ঘন করিয়া, যখন নিন্দাশীলতা, প্রতিহিংসা ও সন্দিগ্ধতারূপ কৃত্রিম আকার ধারণ করে, তখন ইহারা নিরবচ্ছিন্ন নিন্দার বস্তু হইয়া উঠে। যাহা হউক, উপরি-উক্ত প্রবৃত্তিশ্রেণী সম্বন্ধে মার্টিনোর সাধারণ অভিপ্রায় এই যে এক একটী প্রবৃত্তি মনে উদিত হইবামাত্র ইহার অনুসরণ বা বর্জ্জনেই যে নৈতিক জীবন পর্য্যবসিত হইল, তাহা নহে। এমন ভাবে জীবন কাটাইতে হইবে, জীবনের কার্য্যক্ষেত্র এমন ভাবে মনোনীত করিতে হইবে, যাহাতে উচ্চতর প্রবৃত্তি সমূহ বিকশিত হইবার অবকাশ পায়, এবং নিম্নতর প্রবৃত্তি সমূহ উদ্রিক্ত হইবার অল্প অবকাশ থাকে। কিন্তু জীবনের বিচিত্রতা অসীম, জীবনের কার্য্যক্ষেত্র যে ঠিক ইচ্ছানুরূপ হইবে সেরূপ আশা করা যায় না। আর, কোন প্রবৃত্তি বা প্রবৃত্তি-নিচয়কে একবারে উন্মূলিত করিবার প্রয়াসও বৃথা। এক শ্রেণীর প্রবৃত্তিকে নির্জীব নিষ্কর্ম্মা করিয়া রাখিলে যে অপর উচ্চতর শ্রেণীর প্রবৃত্তি সমূহ সবলতররূপে কার্য্য করিবে, তাহা বলা যায় না। যাঁহারা পারিবারিক কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া কোন সাধারণ লোকহিতকর কার্য্যে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহারা যে জীবনের সমগ্র সময়ই তাঁহাদের ব্রত পালনে নিয়োগ করিতে পারেন, অথবা তাঁহাদের কার্য্যশীলতা যে বিশেষ বৃদ্ধি পায়, তাহা বলা যায় না। জীবনের কোন বিভাগকে উপবাসে রাখিলে তজ্জনিত অভাববোধ ও অবসাদ অবশ্যম্ভাবী। যেরূপ জীবনই অবলম্বন করা যাক্, যেরূপ কার্য্যক্ষেত্রেই নিযুক্ত হওয়া যাক্, জীবনের পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি রাখা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতাকে জীবনের পরিচালক করা আবশ্যক।

বিবেকের সহিত যে বাধ্যতাবোধ জড়িত, বিবেক যে কর্ত্তৃত্বের সহিত আমাদিগকে আদেশ করে, সে কর্ত্তৃত্ব কাহার? এই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর আছে। প্রথম উত্তর এই যে এই কর্ত্তৃত্ব, এই শক্তি সুখ দুঃখের। আমরা যখনই কোন কার্য্য করি, অথবা কোন কার্য্য হইতে বিরত হই, তখনই সেই কার্য্যের ফলরূপী সুখলাভ বা দুঃখ-পরিহার আমাদিগকে

পরিচালিত করে। এই উত্তর যে কেবল নিরীশ্বরবাদিরা দেন তাহা নহে, অনেক ঈশ্বরবাদীও এই উত্তর দেন। যাঁহারা স্বর্গ নরকের ভয় দেখাইয়া মানুষকে পুণ্যে প্রবৃত্ত ও পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পান, তাঁহারাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর কেহ কেহ বলেন যে সুখ দুঃখ ছাড়া কার্য্যের পরিচালক আর কিছু নাই,—প্রত্যেক কার্য্যই সুখলাভ বা দুঃখ-নিবারণের ইচ্ছায় করা হয়। এই মতের উপর প্রথম আপত্তি এই যে এই মতাবলম্বীরা কার্য্যতঃ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। আমাদের কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে যেগুলি ফলাফল চিন্তা-নিরপেক্ষ ভাবে কার্য্য করে,—ফলাফল উৎপত্তির পূর্ব্বেই কার্য্য করে। সুখ দুঃখ লক্ষ্য করিয়াই যদি সমুদায় কার্য্য ঘটিত, তবে এই সকল প্রবৃত্তির কার্য্য অসম্ভব হইত। ক্রোধের ফলাফল জানিবার পূর্ব্বেই ক্রোধ হয়। বিপক্ষের ক্লেশে আমার সুখ হইবে, এই মনে করিয়া রাগ করি না, তৎপূর্ব্বেই করি; বরঞ্চ রাগ হওয়াতেই বিপক্ষের ক্লেশে সুখানুভব হয়। বিপন্নের ক্লেশ দেখিয়া যে দয়ার উদ্রেক হয় তাহা দুঃখনিবারণ-জনিত সন্তোষলাভের অপেক্ষা রাখে না; বরঞ্চ দয়ার উদ্রেক হওয়াতেই পরে সেই সন্তোষলাভ সম্ভবপর হয়, নির্দ্দয় ব্যক্তির পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, এই শ্রেণীর লোকেরা বুদ্ধির কার্য্য ও বিবেকের কার্য্যের মধ্যে প্রভেদ অস্বীকার করেন, অথচ সে প্রভেদ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। সুখলাভ বা দুঃখ-নিবারণ লক্ষ্য করিয়া, ভবিষ্যদ্‌বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, যে কার্য্য করি, যে কার্য্য করা না করা* আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, সেই কার্য্য,—আর যে কার্য্য সজ্ঞান ভাবে কোন সুখ বা দুঃখ-নিবারণ লক্ষ্য করিয়া করা হয় না, কেবল কর্ত্তব্যবোধে করা হয়, যাহা করা না করা আমার খুসির উপর নির্ভর করে না, যাহা আমাকে আন্তরিক বাধ্যতাবোধের অধীন হইয়া করিতে হয়, না করিলে আপনাকে হীন বোধ করি—এই দুই শ্রেণীর কার্য্যের প্রভেদ অনপনেয়। তৃতীয়তঃ, যাঁহারা সামাজিক মতের বল, সামাজিক শাসন ভয় বা নরকের দণ্ড ভয়কে বাধ্যতাবোধের কারণ বলেন, তাঁহারা এই কথা ভুলিয়া যান যে প্রবৃত্তির উচ্চতানীচতাবোধ সামাজিক মত ও বাহিরের ফলাফল জানিবার পূর্ব্বেই অনুভূত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ আত্মাতে

বাধ্যতাবোধ করে ও সেই বাধ্যতাবোধ তাহার বাক্যে ও কার্য্যে প্রকাশ পায়, তাহাতেই সামাজিক মতের প্রবলতা সাধিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি বাধ্যতাবোধ-শূন্য হইত, কার্য্যের কর্ত্তব্যতা যদি কেবল ফলাফল ও সামাজিক শাসনের ফল হইত, তবে অন্তরে বাধ্যতাবোধ বলিয়া কিছু থাকিত না, অথবা যদি ফলাফল-ভয়ের আকারে এরূপ কিছু থাকিত, উহাকে আমরা সামাজিক মতের ছায়া বলিয়া অগ্রাহ্য করিতাম। নরক-দণ্ডের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে ইহাও ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের ব্যাপার মাত্র,—নরকদণ্ডের ভয় গ্রাহ্য করা না করা আমার খুসির উপর নির্ভর করে, ইহাতে নিজ ইচ্ছা অনিচ্ছা-নিরপেক্ষ আন্তরিক বাধ্যতাবোধের ব্যাখ্যা হয় না। কার্য্যে দেখা যায়, পাপে নিমগ্ন ব্যক্তি নরকের ভয়ে পাপজীবন পরিত্যাগ করে না, ভবিষ্যৎ দুঃখের ভয় সে সহজেই অগ্রাহ্য করে। কিন্তু কোন প্রকারে তাহার হৃদয়নিহিত প্রচ্ছন্ন পাপবোধ, আত্মার দুর্গতিবোধ, জাগরিত করিতে পারিলে আশ্চর্য্য কার্য্য হয়। যে আত্মা দুঃখের ভয়ে পাপ পরি-ত্যাগ করে নাই, সে আত্মা তখন আপনা হইতে অনুতাপানলে দগ্ধ হয়। দুঃখ পাপবোধের অবশ্যম্ভাবী ফল, ইহা পাপবোধের কারণ নহে।

কেহ কেহ বলেন, বিবেকের কর্ত্তৃত্ব আর কিছুর কর্ত্তৃত্ব নহে, ইহা আমাদের প্রকৃতির এক বিভাগের উপর আর বিভাগের কর্ত্তৃত্ব মাত্র। এক বিভাগ শাসনাধীন, আর এক বিভাগ শাসনকর্ত্তা, বাহ্যিক শাস্তা কেহ নাই। যদি তাহাই হয়, তবে বিবেচ্য এই যে কোন্ বিভাগ শাসনাধীন আর কোন্ বিভাগ শাস্তা? আত্মার যে বিভাগ জ্ঞান ও ইচ্ছা-সমন্বিত,—চিন্তা, বিচার, মনোনয়ন, কার্য্যনিষ্পাদন প্রভৃতি যে বিভাগের অন্তর্গত, অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমাদের ব্যক্তিত্ব যতটুকু, সেই সমস্তটুকুই দেখি-তেছি শাসনের অধীন। সুতরাং শাস্তা বলিতে থাকে কেবল কতকগুলি অন্ধ ও স্বাধীন-ইচ্ছাবিহীন প্রবৃত্তি (instincts) মাত্র। কিন্তু অজ্ঞান বস্তু সজ্ঞানের শাস্তা, স্বাধীন-ইচ্ছাবিহীন বস্তু স্বাধীনের শাস্তা, ধর্ম্মশাসন-কর্ত্তা, ইহা বড়ই অসম্ভব কথা। ব্যক্তির শাস্তা কেবল ব্যক্তিই হইতে পারে, স্বাধীন ইচ্ছার শাস্তা কেবল স্বাধীন ইচ্ছাই হইতে পারে। আমার নৈতিক শাসন-কর্ত্তা কেবল এমন একজন ব্যক্তিই হইতে পারেন, যিনি আমা অপেক্ষা

নীতিতে শ্রেষ্ঠতর। নিজের উপর নিজের শাসন প্রকৃত শাসন নহে। ইহা যখন সম্পূর্ণরূপেই আমার ভিতরকার বস্তু, স্বায়ত্ত বস্তু, তখন ইহা আমার ইচ্ছাকে কখনও শাসন করিতে পারে না; ইহার শাসন মানা না মানা আমার খুসি। কিন্তু বিবেকের শাসন ঈদৃশ মিথ্যা শাসন নহে। ইহাতে আমার অতিরিক্ত, আমা হইতে শ্রেষ্ঠতর একজন পুরুষের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। দুটী প্রবৃত্তির সন্ধিস্থলে যখন বিবেকবাণীর প্রকাশ হয়, ইহা যখন একটীকে উচ্চ বলে, আর একটাকে নীচ বলে, এবং উচ্চতরের অনুসরণ করিতে বলে, তখন ইহাতে একটী মনোনয়নকারী ইচ্ছার অর্থাৎ একজন জ্ঞানবান্ ইচ্ছাবান্ পুরুষের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছার গতি যে দিকেই থাকু, বিবেক যখন আমাকে সর্ব্বদাই উচ্চতর প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে বলে, তখন এই জ্ঞানবান্ ইচ্ছাবান্ পুরুষ যে পূর্ণ পবিত্র স্বরূপ ইহারও পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বিবেকবাণী যদি কেবল আমার জীবনের একটা বিশেষ ঘটনা হইত, আর কোথাও ইহার অস্তিত্ব না জানিতাম, তবে বরং ইহার সাক্ষ্যে সন্দেহ হইতে পারিত। কিন্তু ইহা মানব-জগতে সার্ব্বভৌমিক। দেশ-বোধ, কালবোধ, কারণত্ববোধ, চিন্তা ও বুদ্ধির মৌলিক নিয়ম-সমূহ যেমন মানবজগতের সর্ব্বত্র এক, এবং এরূপ একতা থাকাতেই যেমন মানুষে মানুষে চিন্তা ও ভাবের বিনিময় সম্ভব হইয়াছে, ন্যায়ান্যায়-বিবেকও তেমনি সার্ব্বভৌমিক বস্তু, এবং মানবের সার্ব্বভৌমিক নৈতিকত্ব থাকাতেই পরস্পরের মধ্যে ন্যায় ব্যবহার, দয়া, সত্যানুষ্ঠান, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্বন্ধ সম্ভব হইয়াছে। নীতির এই সার্ব্বভৌমিকত্বে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে বিবেকবাণী ব্যক্তিবিশেষের একটা বিশেষত্ব মাত্র নহে, ইহা সেই মহাপুরুষের অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য প্রকৃতির প্রকাশ, যিনি সমুদায় আত্মার স্রষ্টা ও আশ্রয়।

উপরে বিবেকের যে সংজ্ঞা ও বর্ণনা দেওয়া হইল, তদ্দ্বারা একটী প্রশ্নের মীমাংসা অতি সহজেই হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, কালে ও অবস্থায় ন্যায়ান্যায়-বোধের বিচিত্রতা ও আপাত-বিরোধ দেখিয়া অনেকের মনে হয় বিবেক একটা পরিবর্ত্তনশীল ও কৃত্রিম বস্তু মাত্র। কিন্তু বিবেকের উপরি-উক্ত

সংজ্ঞা স্মরণ রাখিলে দেখা যায় এই সকল বিরোধ প্রকৃত বিরোধ নহে। ন্যায় অন্যায় যদি কার্য্যগত হইত, কার্য্যের প্রবৃত্তি ও অভিপ্রায় বিচার না করিয়া যদি বিবেক কার্য্যমাত্রকেই উচিত বা অনুচিত বলিত, তবে বিবেক-বাণীর স্ববিরোধিতা অবশ্যম্ভাবী হইত; কারণ একই কার্য্য ভিন্ন দেশে, কালে ও অবস্থায় উচিত ও অনুচিত বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু ন্যায় অন্যায় প্রবৃত্তিগত,—আভ্যন্তরীণ কার্য্য-প্রবৃত্তিই ন্যায়ান্যায়বাচ্য, ইহা স্মরণ রাখিলে বিবেকবাণীতে কোন বিরোধ দেখা যায় না। একই কার্য্য উচ্চ ও নীচ উভয়বিধ প্রবৃত্তি হইতে জন্মিতে পারে, সুতরাং প্রবৃত্তির উচ্চতা নীচতা অনুসারে ইহার ঔচিত্য ও অনৌচিত্য বিবেচিত হইবে। আর, এই উচ্চতা নীচতাও যখন নিরপেক্ষ নহে, আপেক্ষিক,—কোন প্রবৃত্তিই যখন একাকী উচ্চও নহে, নীচও নহে, পরস্পরের সহিত বিরোধ স্থলেই উচ্চ বা নীচ, তখন উক্ত বিরোধভঞ্জন আরও সহজ হইয়া উঠিল। আপনি 'খ' নামক কার্য্য-টিকে অনুচিত বলিলেন, আমি ইহাকে উচিত বলিলাম। সহসা মনে হইবে এই বিরোধের মীমাংসা নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন্ আপনি যে 'খ' কে অনুচিত বলিতেছেন তাহা 'ক'এর তুলনায়। আপনি অন্যায়কারীর মনে 'ক' ও 'খ'এর বিরোধ দেখিয়া বা কল্পনা করিয়া, 'ক'কে পরাস্ত ও 'খ'কে জয়যুক্ত হইতে দেখিয়া, কর্ত্তাকে দোষী মনে করিতেছেন। আপনার মীমাংসা অকাট্য, সন্দেহ নাই, এবং আমার মীমাংসায় যদি আমি এ প্রণালীতেই উপনীত হইয়া থাকিতাম, তবে দুই মীমাংসার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইত। কিন্তু বাস্তবিক কথা এই যে, আমার মীমাংসা ঐ প্রণা-লীতে হয় নাই। আমি 'খ'কে 'ক'এর সঙ্গে তুলনা করি নাই; আমি ইহাকে ইহার নিম্নতর 'গ'এর সঙ্গে তুলনা করিয়াছি এবং নিম্নতরের উপর জয়লাভ করাতে ইহাকে উচিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। আমার মীমাংসাও অকাট্য, এবং বস্তুতঃ আপনার মীমাংসার সহিত ইহার কোন বিরোধ নাই। আমার স্থানে আপনি দাঁড়াইলে ঠিক এই মীমাংসারই উপনীত হইতেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, "খ অনুচিত," "খ উচিত" এরূপ নিরপেক্ষভাবে বিবেক-বাণীর উল্লেখ বা কল্পনা করিলেই ইহাতে বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু যে তুলনায় ইহার উৎপত্তি, সেই তুলনা স্মরণ রাখিলে, ইহার

সাপেক্ষতা স্মরণ রাখিলে, ইহাতে কোন বিরোধ দেখা যায় না। "ক অপেক্ষা খ অশ্রেষ্ঠ," এবং "গ অপেক্ষা খ শ্রেষ্ঠ," এই দুই বিচারে কোন বিরোধ নাই। যেখানেই দেখা যায়, আমাদের গৃহীত কোন ধর্ম্ম নিয়ম অপর ব্যক্তি বা জাতির জীবনে লঙ্ঘিত হইতেছে, এমন কি অধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইতেছে, সেখানেই অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, যে কার্য্য-প্রবৃত্তির প্ররোচনায় আমরা উক্ত ধর্ম্মনিয়ম দর্শন ও পালন করিতেছি, সেই কার্য্য-প্রবৃত্তি সেই অপর ব্যক্তি বা জাতির জীবনে অপ্রকাশিত। সেই ব্যক্তি বা জাতিতে নিম্নতর প্রবৃত্তিসমূহই রাজত্ব করিতেছে। প্রাচীন গ্রীসে চিররুগ্ন ও চির-অক্ষম শিশুদিগকে হত্যা করা অন্যায় বলিয়া বোধ হওয়া দূরে থাকুক, বরং পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। আমাদের বিবেচনায় ইহার ন্যায় গর্হিত কার্য্য আর নাই। ইহার কারণ আমাদের ও প্রাচীন গ্রীকদিগের বিশ্বাস ও আদর্শের ভিন্নতা। প্রাচীন গ্রীকগণ ব্যক্তিগত জীবনের মহত্ত্ব বুঝিতেন না। আত্মার অমরত্ব ও অনন্ত উন্নতি-বিষয়ক বিশ্বাস তাঁহাদের মধ্যে স্পষ্টরূপে বর্ত্তমান ছিল না। পার্থিব সমাজকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করাকেই তাঁহারা নীতির পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করিতেন এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তিগত জীবন বিসর্জ্জন আবশ্যক হইলে তাহা পরম পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং যে সকল রুগ্ন ও অক্ষম ব্যক্তি সমাজের শোভা বর্দ্ধন না করিয়া, সমাজের সেবা না করিয়া, বরঞ্চ ইহার কদর্য্যতা-সম্পাদন ও দুঃখভার বর্দ্ধন করিত, তাহাদিগের পক্ষে সমাজের কল্যাণোদ্দেশে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইত। এই আত্ম-বিসর্জ্জন স্বার্থ-প্রসূত না হইয়া যখন দেশের কল্যাণোদ্দেশেই সম্পন্ন হইত, তখন ইহা যে তাহাদের পক্ষে পুণ্যকর্ম্ম হইত তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের সম্মুখে ব্যক্তিগত জীবনের মূল্য, অনন্ত জীবনে বিশ্বাস, রুগ্ন ও আতুর সেবার মহত্ত্ব ও পবিত্রতা প্রকাশিত হওয়াতেই আমরা উক্ত আত্ম-বিসর্জ্জন বা হত্যাকার্য্যকে পুণ্যকর্ম্ম বলিতে পারিতেছি না, উচ্চতরের সহিত তুলনায় ইহা আমাদের পক্ষে ঘৃণিত হইয়া উঠিয়াছে।

২। শাস্ত্রান্ধতা ও শাস্ত্রনিষ্ঠা।

যে গ্রন্থে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ, সেই গ্রন্থের নাম শাস্ত্র। 'শাস্ত্র' শব্দের আরও ব্যাপক অর্থ আছে। জড়বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতিকেও 'শাস্ত্র' বলা হইয়া থাকে, কিন্তু শাস্ত্র বলিতে প্রধানতঃ অধ্যাত্ম শাস্ত্রই বুঝায়। আমরা এই অর্থেই 'শাস্ত্র' শব্দ ব্যবহার করিব। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা মূলে ত্রিবিধ, জ্ঞানগত. ভাবগত ও কর্ম্মগত। সুতরাং যে গ্রন্থে আত্মা ও ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান লিপিবদ্ধ, অথবা আধ্যাত্মিক জীবনের সুখ দুঃখ, প্রীতি ভক্তি প্রভৃতি বর্ণিত, অথবা ধর্ম্মানুষ্ঠানের সংবাদ বা উপদেশ বিবৃত আছে, তাহাই 'শাস্ত্র' পদবাচ্য।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের উপায়—প্রথম, সাক্ষাৎ অনুভূতি ; দ্বিতীয়, বুদ্ধির মূল নিয়ম সমূহ দ্বারা চালিত যুক্তি। যাহাকে অভিজ্ঞতা বলা হয়, যে জ্ঞান অনেক দেখিয়া শুনিয়া ও কার্য্য করিয়া পাওয়া যায়, তাহা হয় মার্জ্জিত আধ্যাত্মিক দৃষ্টির ফল, না হয় যুক্তিপরম্পরা-জাত মীমাংসা, সুতরাং অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানলাভের একটী স্বতন্ত্র উপায় বলা যাইতে পারে না। ধর্ম্মজীবনে উন্নত ব্যক্তিদিগের নিকট আমরা পরোক্ষভাবে যে জ্ঞান লাভ করি তাহা তাঁহারা অনুভূতি বা যুক্তিসহকারেই লাভ করেন, এবং উন্নত অবস্থায় তাহা সকলেরই লাভ করিবার অধিকার আছে। সুতরাং এরূপ জ্ঞানকে অনুভূতি ও যুক্তির শ্রেণী-বহির্ভূত একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। অনুভূতি এবং যুক্তিই জ্ঞানের মূল উপায়।

শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয় অনুভূতি-জাত, অথবা যুক্তিজাত অথবা উভয়জাত। ইহা অন্য তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কোন বস্তু হইতে পারে না। সুতরাং শাস্ত্রস্থিত জ্ঞান শাস্ত্রাধ্যায়ীর অনুভূতি ও যুক্তিদ্বারা পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হইতে পারে। পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হইতে পারে বলিয়াই ইহা 'জ্ঞান' পদবাচ্য। অনুভূতি ও যুক্তি উভয়ের অতীত হইলে ইহাকে আর জ্ঞান বলা যাইতে পারিত না। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে শাস্ত্রাধ্যায়ী

শাস্ত্রোক্ত প্রত্যেক বিষয়ই অনুভূতি বা যুক্তিগোচর করিতে পারিয়াছেন, এবং পারিয়াছেন বলিয়াই ইহাকে জ্ঞান বলিতেছেন। তাহা না হইতেও পারে। শাস্ত্রোক্ত বিষয়গুলিকে নিজ অনুভূতি ও যুক্তিগোচর না করিয়াও তিনি বিষয়গুলিতে বিশ্বাস করিতে পারেন। তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন যে সেই বিষয়গুলি শাস্ত্রকারদিগের অনুভব ও যুক্তির গোচর হইয়াছে। এই বিশ্বাসের ভিত্তি কি? স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ব্যতীত এই বিশ্বাসের আর কোন ভিত্তি নাই। বয়স্থ ব্যক্তির উপর অপ্রাপ্ত বয়স্কের, ধর্ম্মাভিজ্ঞ ব্যক্তির উপর ধর্ম্মে অনভিজ্ঞের, একপ্রকার স্বাভাবিক নির্ভর জন্মে। অল্পবয়স্ক ও অল্পাভিজ্ঞ ব্যক্তি স্বভাবতঃ পরিণত বয়স্ক ও পরিণত অভিজ্ঞতাযুক্ত ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস যখন সাক্ষাৎ জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না, তখন ইহাকে অন্ধ বলাতে কিছু অন্যায় বলা হয় না। কিন্তু ইহা অন্ধ বলিয়াই নিন্দনীয় নহে। উপযুক্ত সীমায় আবদ্ধ থাকিলে ইহা নিন্দনীয় নহে, বরং প্রশংসনীয়। উপযুক্ত সীমা অতিক্রম করিলেই ইহা নিন্দনীয়।

সেই উপযুক্ত সীমা কি? পিতা মাতা প্রতিবেশী প্রভৃতির উপর নির্ভর না করিলে শিশুর এক দিন, এক দিন কেন, এক মুহূর্ত্তও চলে না। ধর্ম্ম-জীবনে নির্ভরের পরিমাণ এ'টা না হউক, নিতান্ত কম নহে। শিশু এবং অধিকাংশ পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের অধিকাংশই শাস্ত্র, গুরু ও সমাজনেতৃগণের উপর নির্ভর হইতে প্রসূত। নিজের পরীক্ষিত স্বাধীন বিশ্বাসের উপর এই সকল ব্যক্তিকে দাঁড়াইতে গেলে তাহাদিগকে নীতি ও ধর্ম্মবর্জ্জিত বর্ব্বর বা নরাকৃতি পশু হইতে হয়। এই শ্রেণীর অধিকাংশ লোকেরই নিজ বিশ্বাসের বিপক্ষে কোন যুক্তি শুনার অভ্যাস নাই, সুতরাং তাহাদের বিশ্বাসের মধ্যে কোন অযৌক্তিকতা আছে, এই ধারণা তাহাদের আদতে নাই। এরূপ শাস্ত্রন্ধতাকে আমরা নিন্দনীয় বলিতে পারি না। সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ যতই কেন বাঞ্ছনীয় হউক না, যে স্থলে সেরূপ জ্ঞান লাভের আশা, সম্ভাবনা ও সুবিধা নাই, সে স্থলে এই শাস্ত্রান্ধতাই যখন নীতি ও ভক্তিলাভের নিদান, তখন ইহা নিন্দার বিষয় না হইয়া বরং প্রশংসারই বিষয়। বালকের পক্ষে বৃদ্ধের উপর নির্ভর ও বৃদ্ধের

বাধ্যতা যদি মঙ্গলকর ও প্রশংসনীয় হয়, তবে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা-সংবলিত শাস্ত্রের উপর ধর্ম্মানভিজ্ঞের নির্ভরও মঙ্গলকর এবং প্রশংসনীয়।

কিন্তু যেখানে অনুভব শক্তি বিকশিত হইয়াছে, সত্যাসত্য ও ন্যায়ান্যায় বিচারশক্তি প্রবল হইয়াছে, সেখানে শাস্ত্রে স্পষ্ট অনুভব-বিরুদ্ধ, যুক্তি-বিরুদ্ধ কথা দেখিয়াও যদি মন আত্যন্তিক শাস্ত্র-ভক্তি বশতঃ সেই কথাকে ভ্রম বলিয়া স্বীকার করিতে না চায়, অনুভব ও যুক্তি ইহার বিপক্ষে দাঁড়াইলেও যদি কষ্টকল্পনা দ্বারা ইহার প্রমাণান্তর অন্বেষণ করে, তবে এরূপ শাস্ত্রান্ধতা যে অতি অমঙ্গলকর ও নিন্দনীয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ শাস্ত্রান্ধতার মূলে এই একটা বিশ্বাস নিহিত থাকে যে শাস্ত্রকারগণ অভ্রান্ত, অথচ এরূপ বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নাই। যাঁহার পক্ষে জ্ঞান ও সত্তা এক, যাঁহার জ্ঞানে থাকাতেই বস্তুর সত্তা, তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ অভ্রান্ত পুরুষ ইহা অকাট্য সত্য। কিন্তু যাহার জ্ঞানের সীমা সত্তার সীমা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, যাহার জ্ঞানের বাহিরে অনেক, বস্তুতঃ অসংখ্য, বস্তু বর্ত্তমান, তাহারই ভ্রমের সম্ভাবনা রহিল। সসীম জ্ঞান মাত্রেরই যখন ভ্রমের সম্ভাবনা রহিল, আর অনুভূতি ও যুক্তি ছাড়া জ্ঞানের যখন তৃতীয় উপায় নাই, তখন অনুভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ শাস্ত্রবাক্যে অন্ধভাবে নির্ভর করিয়া থাকাকে নিন্দনীয় শাস্ত্রান্ধতা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

কিন্তু বর্ণিত শাস্ত্রান্ধতা ছাড়া আর এক প্রকার শাস্ত্রান্ধতা আছে, তাহাও অল্প নিন্দনীয় নহে। স্পষ্ট অনুভব ও যুক্তিকে অগ্রাহ্য করা, শাস্ত্র-বাক্যে আত্যন্তিক নির্ভর করা, যেমন নিন্দনীয়, নিজ অবিকশিত অনুভব ও বিচার-শক্তির উপর অযথা নির্ভর করিয়া শাস্ত্রবাক্যকে অগ্রাহ্য করাও তেমনই নিন্দনীয়। বিচার শক্তির প্রথমোন্মেষের সময়ে অহঙ্কার-প্রবণ অবিনীত প্রকৃতিতে এক প্রকার আত্যন্তিক আত্মনির্ভর জন্মে, ইহার লক্ষণ এই যে, যাহা কিছু নিজের অনুভবগোচর হয় নাই, তাহাই মিথ্যা, অস্তিত্ববিহীন, এবং যাহা কিছু নিজের অবোধ্য, তাহাই অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়, অথচ এরূপ অনেক বস্তু থাকিতে পারে, এবং থাকিবারই খুব সম্ভাবনা, যাহা অল্পাভিজ্ঞ ব্যক্তির অনুভবাতীত, এবং এমন অনেক কথাই যুক্তিযুক্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা যাহা অমার্জ্জিত বিবেক এবং গভীর চিন্তায় অনভ্যস্ত

ব্যক্তির বুদ্ধির অগোচর। এরূপ অবিনীত ভাব এবং আত্যন্তিক আত্মনির্ভরের সহিত যখন কোন শাস্ত্র, বিশেষতঃ কোন প্রাচীন শাস্ত্র, পাঠ করা যায়, তখন স্বভাবতঃই তাহাতে ভূরি ভূরি আপাত-মিথ্যা ও অযৌক্তিক কথা দেখিতে পাওয়া যায় এবং শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারগণের প্রতি গভীর অশ্রদ্ধার উদয় হয়। এরূপ অবস্থায় শাস্ত্রোক্ত বিষয় সমূহ সম্বন্ধে চিন্তা ও সাধন অসম্ভব হয়, এবং এরূপ ভাবাপন্ন ব্যক্তি হয় নিজের ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্র আশা, লইয়াই পড়িয়া থাকেন, অথবা সেই অল্পাভিজ্ঞ শাস্ত্রকারগণেরই আশ্রয় লন যাঁহারা যথাসাধ্য অন্য শাস্ত্রের সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার উপর শাস্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে শুষ্ক ও আত্যন্তিক স্থিতিশীল করিবার যদি কোন অব্যর্থ উপায় থাকে, তবে তাহা এই—মনকে নিজের ক্ষুদ্র চিন্তায় অথবা সেই ক্ষুদ্র চিন্তানুযায়ী সঙ্কীর্ণ শাস্ত্রে আবদ্ধ রাখা।

যাঁহাতে আত্মদৃষ্টি, বিনয়, শ্রদ্ধা ও শিষ্যভাব প্রবল, তিনি কখনও এই-রূপে, গুরুজনের অবাধ্য ও উদ্দাম স্বাধীনতাপ্রিয় শিশুর ন্যায়,শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করেন না। প্রস্ফুটিত বিচার-চক্ষুতে শাস্ত্রের ভ্রম দেখিতে পাইলেও তিনি শাস্ত্রের প্রতি হতশ্রদ্ধ হন না। তিনি জানেন, বিজ্ঞান ইতিহাসাদি বাহ্য বিষয়ে যেখানে অল্প অভিজ্ঞতা, সেখানেও গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা থাকিতে পারে, এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাতে দেশ কাল ও অবস্থাজনিত ভ্রমের সহিত মহামূল্য সত্য জড়িত থাকে। তারপর, চিন্তা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টি যতই সূক্ষ্ম হইতে থাকে, ততই দেখিতে পাওয়া যায়, মহাজনোক্তির এমন অনেক স্থান স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছে যাহা পূর্ব্বে রহস্যময় ছিল, এবং এমন অনেক স্থানে প্রদোষকালের ক্ষীণ আলোকের ন্যায় অল্প আলোক পড়িয়াছে যাহা পূর্ব্বে গভীর তমসাচ্ছন্ন ছিল। এরূপ অভিজ্ঞতাতে শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধা ঘনীভূত হয়, শাস্ত্রার্থ বুঝিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়, এবং ক্রমশঃ শাস্ত্রকারগণের সহিত দেশ কাল ও অবস্থাগত প্রভেদ অল্পতর হয়। এরূপ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলে প্রভূত উপকার লাভ করা যায়। শাস্ত্রকারদিগের গভীর চিন্তা ও সূক্ষ্ম অনুভবব্যঞ্জক বাক্যাবলী পাঠে আধ্যাত্মিক চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, তাঁহাদের আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা ও সরস ভাবের

সংস্পর্শে নিজ হৃদয়ের জড়তা ও শুষ্ক ভাব দূর হয়, তাঁহাদের প্রদর্শিত উচ্চ জীবনাদর্শ চক্ষুর সম্মুখে থাকাতে ক্রমাগতই নীচ বাসনায় আঘাত পড়ে এবং তাঁহাদের সঞ্চিত গভীর অভিজ্ঞতা সাধন পথের সহায় হয়।

শাস্ত্র সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুই প্রকার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম,—শাস্ত্র অভ্রান্ত ও আধ্যাত্মিক উচ্চ জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। যাঁহারা এই ভাবাপন্ন, তাঁহারা তাঁহাদের সমগ্র মনযোগ একটী বিশেষ শাস্ত্রের উপর অর্পণ করেন এবং তদধ্যয়নে প্রভূত উপকার লাভ করেন বটে, কিন্তু তাহাদের চিন্তা ও জ্ঞান অনেকটা সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকে। যে পরিমাণ অন্ধতার সহিত তাঁহারা শাস্ত্র-বচনানুসরণ করেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় ভাব এই—সকল শাস্ত্রই ভ্রমযুক্ত, কোন শাস্ত্রই বিশেষ অনুরাগের বিষয় নহে। এই ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা মুখে স্বীকার করেন বটে যে সকল শাস্ত্র হইতেই সত্য গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু কার্য্যতঃ শাস্ত্রের ভ্রমের দিকেই তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি, সত্যের দিকে তাদৃশ দৃষ্টি নাই। প্রাচীন নূতন কোন শ্রেণীর শাস্ত্রই তাঁহাদের নিকট আদর পায় না। এই শ্রেণীর লোকেরা কতকগুলি স্থূল ভ্রম হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রনিষ্ঠার অভাবে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবন অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভ্রমের প্রতি অধিক দৃষ্টি পড়াতে তাঁহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি শুষ্ক হইয়া যায়। শাস্ত্রান্ধ ব্যক্তি জগতের অন্য শাস্ত্রের সম্বন্ধে অনুদার হইলেও নিজের অবলম্বিত শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার অনুরাগ থাকে, এবং তদ্দ্বারা অনেক পরিমাণে তাঁহার হৃদয়ের প্রসার সাধিত হয়। কিন্তু আলোচ্য ব্যক্তি অত্যুদার হইতে যাইয়া বস্তুতঃ অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়েন। তাঁহার কাছে কোন শাস্ত্রই নিজের শাস্ত্র নহে। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই তাঁহার পক্ষে পরধর্ম্মের শাস্ত্র কোনও শাস্ত্রকেই তিনি আপনার বলিয়া আদর করিতে পারেন না। এইরূপে উচ্চ সাহিত্যের আলোচনা হইতে বঞ্চিত থাকাতে, আত্মার সমক্ষে মহাজন-প্রদর্শিত উচ্চ আদর্শ সর্ব্বদা বর্ত্তমান না থাকাতে, আধ্যাত্মিক জীবনে যেরূপ মৃতভাব আসিতে পারে, অসংখ্য লোকের জীবনে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরি-উক্ত উভয় ভাবকে আমরা শাস্ত্রান্ধতা বলিয়াছি। প্রথম শ্রেণীর

ব্যক্তিগণ শাস্ত্রের গুণ দেখিয়া দোষ সম্বন্ধে অন্ধ, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা শাস্ত্রের দোষ দেখিয়া গুণ সম্বন্ধে অন্ধ। উভয় শ্রেণীই মানসিক সমতাশূন্য। উভয় শ্রেণীরই মনের ভাব এই—শাস্ত্রের হয় সমগ্র লইতে হইবে, না হয় কিছুই লইতে হইবে না। শাস্ত্র যেন নিজ চিন্তা ও আধ্যাত্মিক পরিশ্রম বাঁচাইবার একটা উপায়। যদি তদ্দ্বারা চিন্তা ও পরিশ্রম হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, তবেই তাহা আদরের বস্তু। আর যদি নিজ চিন্তা ও পরিশ্রম দ্বারাই শাস্ত্রোক্ত সত্য আবিষ্কার ও হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়, তবে আর এই শাস্ত্ররূপ অতিরিক্ত ভার বোঝা কেন? চিন্তা ও পরিশ্রমের শক্তি ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই আছে।

প্রকৃত শাস্ত্রনিষ্ঠার গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃত শাস্ত্রনিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি আত্মার অনুভব শক্তি ও চিন্তার মৌলিক নিয়মসমূহে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হস্ত দর্শন করেন, এবং শাস্ত্র অনুভব ও চিন্তা-প্রসূত সত্যের আধার বলিয়াই শাস্ত্রকে সম্মান করেন। তাঁহার পক্ষে শাস্ত্র আধ্যাত্মিক পরিশ্রম বাঁচাইবার উপায় নহে, বরঞ্চ আধ্যাত্মিক পরিশ্রমের সহায় ও পরিচালক। সাক্ষাৎ অনুভব ও চিন্তার অনুসরণ করিতে যাইয়া যদি তিনি শাস্ত্রে ভ্রম দর্শন করেন, সেই ভ্রম দর্শনেও তাঁহার শাস্ত্রের প্রতি অনাদর জন্মে না। শিক্ষক ও বন্ধুর ভ্রম ও দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইলেও যেমন তাঁহারা শিক্ষক ও বন্ধুই থাকেন, তেমনি শাস্ত্রে ভ্রম ও দোষ আবিষ্কৃত হইলেও শাস্ত্র শাস্ত্রই থাকে। সকল দেশে, সকল সমাজেই শ্রদ্ধেয়, মান্য ও শিক্ষাদানে সক্ষম ব্যক্তি আছেন। ইহা জানিলেও যেমন নিজের সাক্ষাৎ শিক্ষাদাতা গুরুজনের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা সাধারণ হইয়া যায় না, বিশেষই থাকে, তেমনই সকল শাস্ত্রকে ভক্তির বস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেও, এবং সাধ্যানুসারে সকল শাস্ত্রাধ্যয়নে উৎসাহ জন্মিলেও, যদ্দ্বারা সাধকের ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত ও জাতিগত জীবন বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, সেই শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ নিষ্ঠা স্বাভাবিক, যুক্তিযুক্ত ও মঙ্গলকর। শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভক্তি প্রভৃতি ভাবের প্রকৃতিই এই যে, এই সকল ভাব অগ্রে বিশেষ বিশেষ বস্তুতে ঘনীভূত ও তৎপরে সাধারণভাবে ব্যাপ্ত হয়। এই সকল ভাবের সাধন ও বিকাশ এই প্রণালীর উপরই নির্ভর করে। শাস্ত্রনিষ্ঠার সাধনও

এই প্রণালীতেই সম্ভব। বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র বিশেষ অনুরাগ অথচ উদারতার সহিত অধ্যয়ন করিতে করিতে করিতে হৃদয়ে সত্যানুরাগ বর্দ্ধিত হইলে তৎপরে শাস্ত্র মাত্রই শ্রদ্ধা ও অনুরাগের বিষয় হইয়া উঠে। পাশ্চাত্য উদার খ্রীষ্টীয়ানগণ এই কথার সাক্ষী। তাঁহারা বাইবেলকে অভ্রান্ত মনে করেন না, অথচ ইহাকে ব্যক্তিগত ও জাতীয় আধ্যাত্মিক উন্নতির মহান্ সহায় জানিয়া পরম আদরের সহিত অধ্যয়ন করেন। এই অধ্যয়নের ফলে ইহাদের ধর্ম্মজীবন পরিপুষ্ট হইয়াছে এবং হৃদয় উদার হইয়াছে। সেই উদারতার ফলে ইহারা প্রাচ্য শাস্ত্রের আলোচনায় অনুরাগী হইয়াছেন, এবং ইহাদের বিস্ময়কর যত্ন ও পরিশ্রমে এই সকল শাস্ত্র ভাষান্তরিত হইয়া নানা দেশে প্রচারিত হইতেছে। এই প্রণালী অবলম্বন না করিয়া একটা উৎকট অন্তঃসারশূন্য উদারতার বশবর্ত্তী হইয়া কেবল মুখে সর্ব্ব শাস্ত্রের গুণকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইলে কি ফল হয়, তাহা আমরা ঘরে বাহিরে চারিদিকে প্রত্যক্ষরূপেই দেখিতেছি। আমাদের মধ্যে এমন অনেক গৃহ আছে, বোধ হয় অধিকাংশের সম্বন্ধেই এই কথা খাটে, যেখানে শাস্ত্রালোচনার নাম গন্ধ মাত্র নাই। আমরা এস্থলে কোন বিশেষ একটা শাস্ত্রের পক্ষসমর্থন করিতেছি না। আমরা কেবল এই কথাই বলিতেছি যে শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা উপকার লাভ করিতে হইলে প্রথমে কোন একটা, সে যাহাই হউক, শাস্ত্রের উপর বিশেষ মনোযোগ অর্পণ করিতে হইবে। সেই শাস্ত্র বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি সম্প্রদায় বা জাতির উপযোগিতা দেখিয়া মনোনীত করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। আমাদের বোধ হয় যে আমাদের ধর্ম্মনেতৃগণ, যাঁহারা জীবনের প্রথমাংশে অনেক পরিমাণে খ্রীষ্টীয় ভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁহারা যদি এই উৎকট উদারতা প্রচার না করিয়া খ্রীষ্টশাস্ত্রানুরাগ সমাজমধ্যে বিশেষ ভাবে সঞ্চারিত করিতে পারিতেন, যদি ধর্ম্মানুরাগী দেশীয় শিক্ষিত লোকদিগকে সাক্ষাৎ জ্ঞানের সম্মান রক্ষা করিয়া বিশেষভাবে বাইবেল পাঠে অনুরাগী করিতে পারিতেন, তবে তদ্দ্বারা সমাজের বিশেষ উপকার হইত, তবে আর বর্ত্তমান্ স্বেচ্ছাচার ও অরাজকত্বের দৃশ্য দেখিতে হইত না। এদেশীয় ব্রহ্মবাদিদিগকে খ্রীষ্টীয়ান শাস্ত্র ধরান সম্ভব ছিল কি না, সে বিষয় আমরা কিছু বলিতেছি না। আমরা কেবল এই কথাই

বলিতেছি যে যদি তাহা সম্ভব হইত, তাহা হইলে উক্ত উৎকট উদারতা ও উহার অবশ্যম্ভাবী ফল শাস্ত্র-বিমুখিতা অপেক্ষা খ্রীষ্টীয়ান শাস্ত্রের বিশেষ অধ্যয়ন সহস্রগুণে উপকারপ্রদ হইত। আজকাল দেশ মধ্যে দেশীয় শাস্ত্র-চর্চ্চার যেরূপ পুনরুত্থান হইয়াছে, উক্ত বাইবলানুরাগ সেই পুনরুত্থানকে বাধা দিতে পারিত না। খ্রীষ্টীয় দেশেই যখন আর্য্যশাস্ত্র পরমাদরে গৃহীত হইতেছে, তখন এ দেশে এ দেশীয় শাস্ত্রের আদর ও প্রচার কিছুতেই প্রতি-রোধ করিতে পারিত না। বিশেষ লাভ এই হইত যে, এখন যেমন কতক-গুলি লোক শাস্ত্র মাত্রেরই বিরোধী, অত্যুদারতা যেমন তাঁহাদিগের শাস্ত্র-নিষ্ঠা বিনাশ করিয়াছে, তখন সেরূপ লোক দেখিতে হইত না, অথবা অতি অল্পই দেখিতে হইত। সেদিন দেখিলাম; একজন উপযুক্ত ধর্ম্মপ্রচা-রক পাশ্চাত্য একেশ্বরবাদী (ইউনিটেরিয়ান) খ্রীষ্টীয়ানদিগের উপর এই বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন যে তাঁহারা খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের বিশেষ পক্ষ-পাতী। তাঁহার মনের ভাব বোধ হয় এই যে তাঁহারাও এদেশীয় উৎকট উদারতাগ্রস্ত একেশ্বরবাদিদিগের ন্যায় ঘর বাড়ীতে না থাকিয়া প্রান্তর-বিহারী বেদিয়াদিগের ন্যায় হউক। যাহা হউক, খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের কথা যে তুলিলাম, তাহা কেবল বিশেষত্বের দৃষ্টান্ত দিবার জন্য।

যাঁহারা আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রনিরপেক্ষ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকেও প্রাকারান্তরে শাস্ত্রের দোহাই দিতে হয়। কোন মতকে যখন তাঁহারা নিজ ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বা বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করেন, তখন কোন্ প্রমাণের উপর দাঁড়াইয়া সেরূপ করেন? কোন মত তাঁহাদের ধর্ম্মের স্বপক্ষ কি বিপক্ষ, ইহা কে মীমাংসা করিবে? অনেকেই এরূপ স্থলে নিজ নিজ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক গৃহীত লিপিবদ্ধ "মূল সত্যে"র দোহাই দেন। তাহা হইলে সেই লিপিবদ্ধ "মূল সত্য"ই প্রকারান্তরে শাস্ত্র বলিয়া স্বীকৃত হইল। প্রভেদ এই যে শাস্ত্র বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত-সংবলিত সরস বস্তু, আর উক্ত মূলসত্য-সংবলিত লিপি শুষ্ক অস্থি মাত্র। এস্থলে আপত্তি উঠিতে পারে যে 'মূলসত্য' সম্প্রদায় কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছে,সুতরাং তাহা শাস্ত্রপদ-বাচ্য নহে। এই আপত্তির উত্তর এই যে শাস্ত্রও এইরূপে সম্প্রদায় বা জাতি-বিশেষ দ্বারা মনোনীত বস্তু, তবে প্রাচীন ও আধুনিক মনোনয়ন-প্রণালী

সম্পূর্ণরূপে একরূপ নহে এইমাত্র প্রভেদ। বাইবলের নিউটেষ্টেমেণ্ট কোন্ সময়ে এবং কি প্রণালীতে খৃষ্টীয় সমাজের শাস্ত্ররূপে মনোনীত হয়, তাহা উক্ত সমাজের ইতিহাস-পাঠক মাত্রই জানেন। সেরূপ প্রত্যেক শাস্ত্রই কোন না কোন প্রণালীতে সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষ-কর্ত্তৃক নিজধর্ম্মের লিপি বা ব্যাখ্যা রূপে গৃহীত হইয়াছে। তার পর দেখুন, শাস্ত্র-নিরপেক্ষ অত্যুদার ধর্ম্মাবলম্বীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনার অবলম্বিত ধর্ম্মমত কোন্ পুস্তক পাঠ করিলে জানা যায় বা বুঝা যায়? তিনি নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসুকে তাহার ধর্ম্মের ব্যাখ্যাকার কোন উপযুক্ত লেখক-প্রণীত পুস্তক পাঠ করিতে বলিবেন। ইহাতে প্রকারান্তরে শাস্ত্র স্বীকার করা হইল। শাস্ত্রবাদীর পক্ষে শাস্ত্র যাহা, তাঁহার পক্ষে উক্ত পুস্তক তাহাই। তিনি বলিতে পারেন যে তিনি উক্ত পুস্তকের সকল কথা মানেন না, কেবল মূল মতগুলি মানেন, সুতরাং উহা তাঁহার পক্ষে শাস্ত্র-স্থানীয় নহে, ইহা তাঁহার ধর্ম্মমতের সাহিত্য মাত্র। এই কথার উত্তর এই যে জ্ঞানী এবং উদার শাস্ত্রবাদীও শাস্ত্রকে ভ্রমের অতীত বলিয়া মনে করেন না, এবং শাস্ত্রের প্রত্যেক উক্তিই মাননীয় বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার পক্ষেও শাস্ত্র নিজ ধর্ম্মের মূল সত্যের লিপি ও ব্যাখ্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে,—ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উচ্চ সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং শাস্ত্রস্বীকার সম্বন্ধে শাস্ত্রবাদী ও শাস্ত্রবিরোধীর মধ্যে মৌলিক প্রভেদ কিছুই নাই। অবান্তর প্রভেদ এই যে শাস্ত্রের দোহাই দিবার প্রয়োজন হইলে শাস্ত্রবাদী অধিকাংশ স্থলেই প্রাচীন শাস্ত্রের দোহাই দেন, শাস্ত্রবিরোধী নূতন শাস্ত্রের দোহাই দেন। কেহই শাস্ত্রনিরপেক্ষ হইতে পারেন না।

শাস্ত্রবিরোধী প্রাচীন ধর্ম্ম-সাহিত্যের সহিত নিজমতের বহুল অনৈক্য দেখিয়া তৎপ্রতি আস্থাহীন। তাঁহার যাহা কিছু আস্থা নূতন ধর্ম্মসাহিত্যের প্রতি। প্রাচীন শাস্ত্রের সহিত আধুনিক চিন্তার অনৈক্যের কারণ ইতিপূর্ব্বে কিয়ৎ পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর একটী বিশেষ কারণ—মূল সত্য ও অবান্তর মতের প্রভেদ করিতে না পারা। আধুনিক পাঠক অনেক স্থলেই প্রাচীন শাস্ত্রে অবৈজ্ঞানিক মতের বাহুল্য দেখিয়া চটিয়া যান, চটিয়া গিয়া শাস্ত্রোক্ত মূল সত্যের সহিত আপনার গৃহীত মতের মৌলিক ঐক্য দেখিতে

পান না। অবান্তর মতে অনৈক্য থাকিলে যদি ধর্ম্মসাহিত্য অগ্রাহ্য করিতে হয়, তবে প্রাচীন বা আধুনিক কোন ধর্ম্ম-সাহিত্যই গ্রহণযোগ্য নহে। আর যদি ধর্ম্ম-সাহিত্য গ্রহণে মূলমতের ঐক্যই দ্রষ্টব্য হয়, তবে যে ভাবে আধুনিক সাহিত্য গ্রহণ করা যায়, সেই ভাবে প্রাচীন সাহিত্যও গ্রহণ-যোগ্য।

এদেশে স্মরণাতীত কাল হইতে উপনিষদ্ শাস্ত্র ব্রহ্মবাদিদিগের শাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে, এবং ইহার অধ্যয়ন, চিন্তন ও এতদুক্ত সত্য সাধন দ্বারা ব্রহ্মসাধকদিগের আধ্যাত্মিক জীবন পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছে। উপনিষদ্ প্রণয়নের পরে, যুগে যুগে, কালে কালে, ব্রহ্মসাধন সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রণীত হইয়াছে, তৎসমস্তই উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দেশের আধুনিক ব্রহ্মবাদিদের অনেকে এই চির মান্য শাস্ত্রকে পরি-ত্যাগ করিয়াছেন। অন্ততঃ তাঁহারা ইহাকে আর নিজ ধর্ম্মের শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন না। ইহার প্রধান কারণ, উপনিষদুক্ত মতের সহিত তাঁহা-দের অনৈক্য। অবান্তর অনৈক্যের কথা ছাড়িয়া দিলাম। অনৈক্য যদি মূল-বিষয়ক হয়, ব্রহ্মবাদ-বিষয়ক হয়, তবে বলিতে হইবে যে হয় উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদ প্রকৃত ব্রহ্মবাদ নহে, না হয় উপনিষদ্-পরিত্যাগী ব্রহ্মবাদিদিগের ব্রহ্মবাদ প্রকৃত ব্রহ্মবাদ নহে। আমাদের বোধ হয় শেষোক্ত কথাই ঠিক। উক্ত ব্রহ্মবাদিগণ ইউরোপীয় এক প্রকার একেশ্বরবাদ বা একদেববাদকে ব্রহ্মবাদ নাম দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। "ব্রহ্ম" "ব্রহ্মজ্ঞান," "ব্রহ্মযোগ," "ব্রহ্মোপাসনা," "ব্রহ্মপ্রাপ্তি" প্রভৃতি শব্দ যে অর্থে এদেশে স্মরণাতীত কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, ইহাঁরা এই সকল শব্দ সেই অর্থে গ্রহণ না করিয়া অত্যন্ত ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিতেছেন। শব্দের চির-প্রচলিত অর্থ পরিত্যাগ করিয়াও শব্দগুলি ব্যবহার করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত, তাহা ইহাঁদের বিবেচনা করা উচিত। যাঁহারা এই সকল শব্দ উপনিষদুক্ত অর্থে গ্রহণ করেন, এবং এই সকল শব্দ-নির্দ্দিষ্ট মূল বিষয় সমূহে উপনিষদের সহিত আপনাদের ঐকমত্য দেখিতে পান, তাঁহারা এই ব্রহ্মপ্রতিপাদক চিরমান্য শাস্ত্রকে নিজধর্ম্মের শাস্ত্র বলিতে এবং আপনাদিগকে ভারতীয় প্রাচীন ব্রহ্মবাদিদিগের আধ্যাত্মিক সন্তান, শিষ্য ও সমধর্ম্মী বলিয়া স্বীকার করিতে

কুষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং ইহাতে আপনাদিগকে সম্মানিত ও গৌরবান্বিতই বোধ করিবেন।

বৌদ্ধ দর্শন।

১

আত্মা ও ঈশ্বর, সাধারণতঃ এই দুই লইয়া ধর্ম্ম। বর্ত্তমান বৌদ্ধদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণী এই দুইটিই বিশ্বাস করেন, অপর শ্রেণী এ দুটীর কোনটী বিশ্বাস করেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক সংখ্যা অল্প। এ দুটির কোনটীতে বিশ্বাস নাই, এমন লোক কেমন করিয়া কোন ধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারে, বুঝা কষ্ট।

শিষ্যেরা যাহাই বিশ্বাস করুন্, বুদ্ধদেব স্বয়ং কি বিশ্বাস করিতেন? বুদ্ধদেব আত্মা ও ঈশ্বর বিশ্বাস করিতেন না। বৌদ্ধধর্ম্ম দার্শনিক ধর্ম্ম। অথচ পণ্ডিত ও মূর্খ সহস্র লোকে বৌদ্ধধর্ম্ম আদরে গ্রহণ করিয়াছে এবং দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছে।

মহাপরিনির্ব্বাণ-সূত্রে একটী আখ্যায়িকা আছে। কুশীনগরের শালমূলে বুদ্ধদেব মৃত্যুশয্যায় শয়ান। সেই সময় আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, আত্মা কি আছে?" বুদ্ধদেব বলিলেন "আমি কি কখন বলিয়াছি আত্মা আছে?" আনন্দ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আত্মা কি নাই?" বুদ্ধদেব বলিলেন "আমি কি বলিয়াছি আত্মা নাই?" এইরূপ ঈশ্বর সম্বন্ধে আনন্দ প্রশ্ন করিলেন, বুদ্ধদেব সে সম্বন্ধেও এইরূপই উত্তর দিলেন। আনন্দ বুঝিতে পারিলেন না আত্মা ও ঈশ্বর আছেন কি না, তখন বুদ্ধদেব আনন্দকে নিকটস্থ শালবৃক্ষ হইতে কয়েকটী পত্র সংগ্রহ করিতে বলিলেন। আনন্দ তাহাই করিলে বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "আনন্দ! তোমার হাতে বেশী পাতা না গাছে?" আনন্দ বলিলেন "গাছে"। তখন বুদ্ধদেব বলিলেন "আনন্দ, আমি তোমাদিগকে যাহা শিখাইয়াছি তাহার তুলনায় যাহা শিখাই নাই তাহার পরিমাণ অনেক অধিক।"

বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যগণকেআর একটী কথা অনেকবার বলিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশে "ভিতরের কথা" ও বাহিরের কথা নাই। তিনি সাধারণ

শিষ্যদিগকে যে উপদেশ দিতেন, সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ণের ন্যায় উন্নত শিষ্যদিগকেও তাহাই বলিতেন। উচ্চ নীচ অধিকার ভেদে উপদেশ ভিন্ন করিতেন না। এবং যাহা বলিতেন তাহার প্রকাশ্য অর্থ ভিন্ন কোন গুপ্ত অর্থ থাকিত না। *

বৌদ্ধদর্শন বুঝিতে হইলে সেই সময়ে বা তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষে ধর্ম্ম ও দর্শনের কি অবস্থা ছিল একবার বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। বৌদ্ধ দর্শন সাংখ্য দর্শনে কি বেদান্ত দর্শনে প্রভাবিত, এই লইয়া বৌদ্ধ গ্রন্থবিৎগণের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে। সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে কে পূর্ব্বতন, একথার অদ্যাপিও মীমাংসা হয় নাই।

আচার্য্য মোক্ষমুলর বেদ ও উপনিষদের রচনা কাল যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এই ত্রিশ বৎসর মানব-প্রকৃতির ক্রমবিকাশের পর্য্যালোচনায় প্রমাণ হইয়াছে আর্য্য সভ্যতার আরম্ভ মোক্ষমূলরের নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বতন। বৈদিক যুগ ও উপনিষদ-যুগের মধ্যে শত শত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। বৈদিক যুগের আর্য্যপ্রকৃতি প্রফুল্লতাময়, উপনিষদে বিষাদের কালিমার নিদর্শন পাওয়া যায়; তখন আর্য্যপ্রকৃতির পৃষ্ঠাস্থি চূর্ণ হইয়াছে। নচিকেতা সংবাদ এই প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের ইতিহাস। এখন ধন ধান্য গো অশ্ব শতায়ুষ ও বীর সন্তান আর্য্যপুত্রের প্রার্থনীয় নহে; তাহাতে কি হইবে—"যেনাহং নামৃতঃস্যাম্"। বৈদিক জীবন আনন্দময়; সাংখ্য ও পাতঞ্জল জীবনকে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বুদ্ধদের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তয়িতা নহেন। তাঁহার সময়ে এক একজন গুরুর অধীনে অনেক সন্ন্যাসীদল ভারতবর্ষে বিচরণ করিত। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত ছিলেন।

আপন মতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া ক্রমে এই সকলকে তথাগত আপন দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের সময় ভারতবর্ষে

---

*"I have preached the truth without making any distinction between exoteric and esoteric doctrine, for in respect of the truth, Ananda, the Tathagata has no such thing as the closed fist of a teacher who keeps something back."

বাবট্টিটি দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল। ইহাদের সকলেরই মধ্যে অল্লাধিক অনৈক্য ছিল। এই সকল মতকে সাধারণভাবে সাংখ্য, বেদান্ত, পঞ্চরাত্র, লোকায়ত ও জৈন এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভেদ সামান্য এবং পঞ্চরাত্রগণ স্বাধীনভাবে বৈদান্তিক-দিগের ন্যায় অদ্বৈতবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সাংখ্য ও বেদান্ত বৌদ্ধ দর্শনের পূর্ব্বতন মানিয়া ইহারা কে কি প্রকারে বৌদ্ধদর্শন প্রভাবিত করিয়াছিল, অনুসন্ধান করা যাইতে পারে।

'কেন,' 'কঠ' প্রভৃতি কয়েকখানি উপনিষদ্ বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বতন। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের পরে, খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে, কয়েক শত বৎসর ভারত-বর্ষে সাংখ্য দর্শনের প্রভাবে বেদান্ত হীনপ্রভ হইয়াছিল। প্রেতবিশ্বাস হইতে কিরূপে প্রকৃতি পূজায় এবং প্রকৃতি পূজা হইতে কিরূপে দেবপূজায়, এবংক্রমে আর্য্যসন্তান কিরূপে অদ্বৈতবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন এখানে তাহার অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা নাই। সহস্র সহস্র বৎসরের ক্রম-বিকাশে আর্য্য-সন্তান বৈদিক প্রকৃতি পূজা এবং তাহার শত শত বৎসর পরে উপনিষদের অদ্বৈতবাদ আবিষ্কার করেন। প্রাচীন উপনিষদে দ্বৈতবাদ নাই, বা ঋগ্বেদে অদ্বৈতবাদ নাই এমন নহে। তথাপি উপনিষ-দের দর্শনকে অদ্বৈতবাদ বা বেদান্তদর্শন বলা যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে সাংখ্য দর্শনের শ্রীবৃদ্ধি বৌদ্ধধর্ম্মের পরন্তন হইলেও সাংখ্য দর্শনের আরম্ভ বৌদ্ধ ধর্ম্মের পূর্ব্বতন। অথর্ব্ব বেদের একটি সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—পুণ্ডরীকং নবদ্বারং ত্রিভির্গুণেভিরাবৃতং—ইহা সাংখ্য-মত না হইলেও কঠোপনিষদে সাংখ্য দর্শনের আভাস পাওয়া যায়। আচার্য্য বেবর সাংখ্য দর্শনকে বেদান্তের পূর্ব্বতন বলিয়াছেন। এ কথা ঠিক নহে। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ঋগ্বেদে দেখা যায়। অদ্বৈতবাদ নিরাকরণ মানসে কপিল সাংখ্য দর্শন প্রচার করেন। অদ্বৈতবাদে এক ব্রহ্ম পরমাত্মা ভিন্ন জগতে কিছু নাই—সাংখ্য দর্শন পরমাত্মা অস্বীকার করিয়া প্রকৃতি ও আত্মার—অসংখ্য আত্মার—সত্তা স্বীকার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদর্শনে আত্মা ও পরমাত্মা কিছুই স্বীকার করা হয় নাই। সাংখ্যদর্শন প্রকৃতি ও আত্মাকে অনাদি—সুতরাং অনন্ত বলিয়া স্বীকার করেন। বৌদ্ধদর্শনে

প্রকৃতিকে অস্থির প্রপঞ্চময় মায়া বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। বেদান্ত প্রকৃতির সত্তা স্বীকার করেন না। সুতরাং প্রকৃতির অবিশ্বাসে বেদান্ত ও বৌদ্ধ একমত, পরমাত্মার অবিশ্বাসে সাংখ্য ও বৌদ্ধ একমত, এবং আত্মার অবিশ্বাসে বৌদ্ধ স্বতন্ত্র ও একাকী।

সাংখ্যদর্শন বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বেদান্তের ন্যায় আর্য্য সাধারণের আদরণীয় ছিল না। অনার্য্য প্রদেশে এবং বিশিষ্ট আর্য্য সম্প্রদায়ে ইহা প্রচারিত হইয়াছিল। বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলবস্তু। এই নামটী হইতে অনুমান করা যায় শুদ্ধোদনের রাজ্যে সাংখ্য-প্রণেতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ শাক্যসিংহ জন্মভূমিতে সাংখ্যতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন।

পুনর্জন্ম, অদৃষ্টবাদ বা কর্ম্মফলে বিশ্বাস উপনিষদ্, বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনে সমানভাবে দেখা যায়। সুতরাং এটী আর্য্য সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ অনুমান করেন অনার্য্যদিগের নিকট আর্য্যসন্তান এই মতটী শিক্ষা করিয়াছিলেন। এ কথা সত্য নহে। অনার্য্য বিশ্বাস এই যে কেহ মরিলে তাহার আত্মা বৃক্ষ লতায় বা পশু পক্ষীর দেহে আশ্রয় লয়। কিন্তু বৃক্ষ হইতে অন্য জীবে আত্মার পর্য্যায়ক্রমে উন্নতি বা অবনতিতে অনার্য্যের বিশ্বাস নাই। জন্মান্তরবাদ আর্য্যদিগের নিজস্ব ধন—ভারতবর্ষে অভ্যুদিত হইয়া এ মত ক্রমে গ্রীস ও মিসরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

বৌদ্ধদিগের আত্মায় বিশ্বাস নাই, কিন্তু পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস আছে। পুনর্জ্জন্ম কাহার? বেদান্তের মতে আত্মার দুইরূপ—স্বরূপ ও প্রবাহরূপ। বৌদ্ধেরা জীবের প্রবাহরূপ বিশ্বাস করে। এক একটী ফুল ভিন্ন হইলেও যেমন এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া একটী মালা হয়, তেমনি জন্মে জন্মে জীবের নামরূপ ভিন্ন হইলেও এক কর্ম্মসূত্রে সহস্র জন্মেও সে সেই একই জীব। মানুষ মরিলে তাহার কর্ম্মফল রহিয়া যায়। সেই কর্ম্মফলে, অবিদ্যা হইতে বাসনা, বাসনা হইতে জন্ম, জন্ম হইতে জরা মৃত্যু।

সাংখ্যদর্শনে জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়। যাহা সুখ বলিয়া কল্পনা হয়, বিজ্ঞের নিকট তাহারও দুঃখময়ত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির নাম মুক্তি। মুক্ত আত্মার সুখ দুঃখ অনুভূতি থাকে না। বৌদ্ধে-

রাও জীবনকে দুঃখময় বলেন। দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির নাম নির্ব্বাণ। অনুভূতিশূন্য আত্মার অস্তিত্ব নির্ব্বাণ হইতে বড় দূর নহে। যে সময়ে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন তখন ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব মহৎ হইলেও তাহা সীমাবদ্ধ ছিল। ঈশ্বর কর্ম্মফল ভোগ হইতে কাহাকেও রক্ষা করিতে পারিতেন না। এমন দুর্ব্বল ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে তথাগত স্বীকার করেন নাই। এবং যে আত্মার সুখ সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা সুখ-দুঃখানুভূতি-শূন্যতা—সে আত্মা লইয়াই বা তিনি তৃপ্ত হইবেন কেন?

যজ্ঞফলের অকিঞ্চিৎকারিতায় সাংখ্য ও বৌদ্ধের একই মত। তথাপি সাংখ্যকার যজ্ঞের প্রতি যেন একটু স্নেহের চক্ষে দৃষ্টি করিয়াছেন। যে যজ্ঞে বলিদান হয় তাহা ক্ষতিকারক—যে যজ্ঞে বলিদান হয় না—জীবহত্যা হয় না, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তবে উপকারও বিশেষ নাই। জ্ঞানই মুক্তির সোপান। তথাগত যাগযজ্ঞের অপকারিতা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছেন। সকল বিষয়েই দেখা যায় সাংখ্য বৃদ্ধের ন্যায় উচ্ছেদ সাধনে কোমল-হৃদয়—বৌদ্ধ যুবার ন্যায় উচ্ছেদে অগ্রহস্ত। সাংখ্যকার এক একটু চক্ষুলজ্জা করিয়াছিলেন। তথাগতের চক্ষুলজ্জা লেশমাত্র ছিল না।

মুক্তি বা নির্ব্বাণ সঞ্চয়ে কৃচ্ছ্র সাধনের আবশ্যকতা নাই, এ কথা সাংখ্য ও বৌদ্ধ উভয় দর্শনের অনুমত। "স্থির সুখমাসনং" ইহাতে উভয়ের মতভেদ নাই। অবিদ্যা হইতে বাসনা—বাসনা হইতে জন্ম জরামৃত্যু—এই উৎপত্তিবাদ বোধ হয় সাংখ্যকারের নিকট বৌদ্ধ দর্শন গ্রহণ করিয়াছে।

বৌদ্ধ দর্শনে কাহারই নিত্যতা স্বীকার করা হয় না। জগতে সকলই হইতেছে, কিছুই হয় না। সকলই ভাব মাত্র, সৎ কিছুই নাই। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" এ কথা বৌদ্ধ বলিবেন না। পরমাণু হইতে পরম দেবতা পর্য্যন্ত সকলই পরিবর্ত্তনশীল। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মরণ, সত্তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন। হ্রাস ও বৃদ্ধি, ক্ষয় ও উন্নতি, সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। নিমেষ পরে কাহাকেও পূর্ব্বাবস্থায় দেখা যায় না। সুতরাং সকলই হইতেছে, কিন্তু কিছুই হয় না। কেহ এক মুহূর্ত্ত থাকে, দেবতারা লক্ষ বৎসর বাঁচিতে পারেন, কিন্তু জরা, মরণ, ক্ষয় হইতে নিষ্কৃতি কাহারও নাই।

নিম্ন শ্রেণীর পদার্থে আকার ও জড়ধর্ম্ম আছে, উচ্চ শ্রেণীতে আকার, জড়ধর্ম্ম ও মানস ধর্ম্ম আছে। এই গুণের সমুচ্চয়ে পদার্থের উৎপত্তি। দুই, তিন বা ততোঽধিক গুণের সমাবেশ না হইলে কিছুরই উৎপত্তি হয় না সুতরাং জড় মাত্র মিশ্রিত পদার্থ। এই জন্য বৌদ্ধ দর্শনে পদার্থ মাত্রকে 'সংখার' বলা হইয়াছে। বোধ হয় সাংখ্য দর্শনের 'সংস্কার' শব্দ হইতে 'সংখার' শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছিল। সমবেত গুণের প্রত্যেকটীর নিরন্তর পরিবর্ত্তন হইতেছে, সুতরাং কোন সংখার দুই মুহূর্ত্তে একরূপ থাকে না। সংখারের উৎপত্তির সহিত অসমতার পরিবর্ত্তন ও মৃত্যুর উৎপত্তি হয় সুতরাং বিশিষ্টতার সহিত বিভিন্নতার জন্ম—নিত্যত্ব নাই—এখনই বা চিরদিনে সকলকেই লয় পাইতে হয়। বৌদ্ধ দর্শনের এ কথায় কাহারও ভিন্নমত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সংখারের অতীত অপরিবর্ত্তনশীল নির্ব্বিকার এক আত্মা সংখারের অন্তরালে বিদ্যমান আছে, অথবা এক অপরিবর্ত্তনীয় নির্ব্বিকার জরা মরণের অতীত পরমাত্মা এ জগতের অন্তরালে বিদ্যমান আছেন, এ কথা সাংখ্যকার বা বেদান্তকার স্বীকার করেন। বৌদ্ধ এরূপ কথা স্বীকার করেন না। বৌদ্ধ মতে জরা মরণের অতীত নিত্য কিছুই নাই।

সংখারের উৎপত্তির সহিত দুঃখের সূচনা। ষড়েন্দ্রিয় দ্বারে বহির্জগৎ সংখারকে প্রভাবিত করে। তাহাতে সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, সংজ্ঞার উৎপত্তি হইলে কোন পদার্থের প্রতি অভিলাষ, কাহারও প্রতি বিদ্বেষ জন্মে। যাহার প্রতি অভিলাষ তাহা পাইবার বাসনা হয়, যাহার প্রতি বিদ্বেষ জন্মে তাহা দূর করিবার অভিলাষ হয়। বাসনা হইলে বাসনা পূর্ণ করিবার চেষ্টা জন্মে। একটী বাসনা পূর্ণ করিবার শক্তি থাকিলে শতটী পূর্ণ করিবার শক্তি থাকে না। বাসনার অপূরণে শোক জন্মে। সুতরাং জীবন মাত্রই দুঃখ-সম্বলিত। বাসনা পূরণের অনিয়মিত চেষ্টায় পীড়া জন্মে; পীড়া হইতে ক্ষয় ও মৃত্যু ঘটে। সুতরাং সংসার মাত্রই জরা মরণশীল।

জীব আপন বিশিষ্টতা রক্ষা করিবার জন্য নিয়ত প্রয়াস করে। আপন স্বত্বের অভিমান তাহার এত হয়, সে অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল পদার্থ হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝে। মনে করে জগতে আর কাহারও

সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। ইহলোক ও পরলোক তাহারই জন্য, ইহলোকে ও পরলোকে চিরদিন আপন স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিবার জন্য তাহার উদ্যম ও উৎসাহ। সমুদ্রের ফেণ-বুদ্‌বুদের ধারণা যে সে সমুদ্র হইতে স্বতন্ত্র— জীবের ধারণা যে সে আর সব হইতে স্বতন্ত্র। এই মায়া, এই মোহ, এই অবিদ্যা তাহার প্রয়াসের নিদান, এই প্রয়াসের ফলে তাহার কর্ম্ম। পর্ব্বত-শিখরে দাঁড়াইলে দেখা যায় কেহ রথে অশ্ব যোজনা করিয়া চলিয়াছে, রথী ভাবিতেছে সে বড় দ্রুত যাইতেছে, অশ্ব ভাবিতেছে সে পৃথিবীকে পদাঘাত করিয়া সদর্পে পাদক্ষেপ করিতেছে, পৃথিবী, রথ, বা সারথী কাহারও সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। কিন্তু পর্ব্বতবাসী দেখিতেছে তাহারা শুক্তির ন্যায় বিলম্বিতগতি, অশ্বের কেশর যেমন অশ্বের অংশ তাহারা তেমনি পৃথিবীর অংশ। শিশুর শ্রীবৃদ্ধির সহিত দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় জগত শিশুর মানসে প্রতিবিম্বিত হয়—অজ্ঞাতসারে শিশুর হৃদয়ে অভিমান জন্মে সে এই সংসারচক্রের কেন্দ্র, তাহারই জন্য সংসার, সে সংসারে প্রভু, সে সংসার হইতে স্বতন্ত্র। এই অভিমান হইতে জীব সহজে নিষ্কৃতি পায় না। এই অভিমান হইতে বাসনা, বাসনা হইতে নূতন বাসনা। কেহ মোক্ষের লোভে কর্ম্ম করে। মূলে সকলের অভিমান, অভিমান বাসনার মূল, বাসনা কর্ম্মের মূল, কর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, ও জরা মরণের মূল। এই অহঙ্কার, আত্মাভিমান, আত্মার স্বতন্ত্রতা ও সত্তার বিশ্বাস যাবতীয় দুঃখের মূল। এজন্য বৌদ্ধদর্শনে নিরাত্মবাদের এত প্রশংসা।

মনুষ্য কর্ম্মের ফল। কোটী কোটী জন্মের কর্ম্মফল। নিজ কর্ম্মফল, পিতৃ পিতামহের কর্ম্মফল, অনন্ত জগতের কর্ম্মফল, সকলের সমবেত ফলে মনুষ্যজন্ম। কীটাণু হইতে প্রস্তর, বৃক্ষ, লতা, দেব দানব সকলের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ। কাহাকে উপেক্ষা অবজ্ঞা করিবার মনুষ্যের সাধ্য নাই। যে ঘৃণিত কুকুরকে লাঠি মারিতে উদ্যত হইয়াছ, স্মরণ কর সে তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, হইতে পারে। আর হিংসা ঘৃণা দ্বেষ কোথায় থাকিবে? তোমার সহিত সম্বন্ধ অতীত ও ভবিষ্যতের, অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যতের। বিশ্বচক্রের ধূলিকণা, বিশাল বারিধির ফেণ বুদ্‌বুদ্ তুমি। আপন অকিঞ্চিৎকরতা বুঝিতে পারিবে, অভিমান লয় হইবে,

বিশ্বপ্রেমে হৃদয় প্লাবিত হইবে। কারণের কার্য্য তুমি—কারণ বিশ্বসংসার শৃঙ্খলের এক গ্রন্থি তুমি, কাহা হইতে তোমার স্বতন্ত্রতা নাই—শৃঙ্খলের এক এক গ্রন্থি অতীত কোটী বৎসরের কোটী জীবের কর্ম্মফল—আবার এই এক গ্রন্থি হইতে ভবিষ্যতের কোটী বৎসর প্রভাবিত হইবে। তোমার কর্ম্মফলে তুমি, তোমার সন্তান সন্ততি অনন্ত বিশ্ব সংসার কোটী কোটী বৎসর প্রভাবিত হইবে। তুমি কার্য্য ও কারণরূপে অতীতে ছিলে ভবিষ্যতে থাকিবে। এই কার্য্য কারণ ক্রমানুসারে জীব কোটী কোটী বৎসর থাকে। আত্মার সত্তায় বিশ্বাস করিবার আবশ্যক হয় না। দুই মাসের বালকের সহিত অশীতিপর বৃদ্ধের আকৃতি প্রকৃতি কিছুরই সমতা নাই—দেহের সে পরমাণু রক্ত, মেদ, মাংস ও অস্থির চিহ্ন নাই—তথাপি সেই দুই মাসের শিশুই যে এই অশিতিপর বৃদ্ধ সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হয় না। তবে জন্মান্তরে রূপান্তরে নামান্তরে জীবের ক্রম পর্য্যায়ের অবসান কেন হইবে? বস্তুতঃ ডারবিণের ক্রম বিকাশ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তথাগত আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সুখ দুঃখের এমন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আর কোন দেশে কেহ কখন দিতে পারে নাই।

"অনিত্যং দুঃখম্ অনাত্মং" তথাগত আত্মার সত্তা, কোন পদার্থের নিত্যতা স্বীকার করিতেন না এবং জীবন মাত্র দুঃখময় ঘোষণা করিয়াছিলেন। তবে নির্ব্বাণ কি? কিসের নির্ব্বাণ?

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

ব্রহ্মসঙ্গীতে ব্রহ্মতত্ত্ব।

ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্য দিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের কিরূপ অভিব্যক্তি হইয়াছে, এই বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে, ব্রহ্মতত্ত্বের অভিব্যক্তির সাধারণ ক্রম কি, সর্ব্বাদৌ তাহার বিচার করা প্রয়োজন। কারণ ঐ ক্রমকে অতিক্রম করিয়া কুত্রাপি প্রকৃতভাবে ব্রহ্মতত্ত্বের অভিব্যক্তি সম্ভব নহে।

ব্রহ্মতত্ত্বের অভিব্যক্তির সাধারণ ক্রম, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ objective, subjective, এবং universal, এই ত্রিবিধ সোপান দ্বারা

নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমাদিগের প্রাচীন ঋষিদিগের পদানুসরণ করিয়া ইহাকে অন্নময়, প্রাণময়, জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময়, এবং আনন্দময়,* এই পঞ্চবিধ সোপান দ্বারাও নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য চিন্তার যে সোপানত্রয় objective, subjective, এবং universal, তাহার সঙ্গে, মোটামুটী, আমাদের শাস্ত্রীয়, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, এবং বিজ্ঞানময়, এই সোপান চতুষ্টয়ের সম্পূর্ণ সমন্বয় আছে, ইহাও বলা অসঙ্গত নহে। আমাদের শাস্ত্রের আনন্দময় সোপানের আভাস পাশ্চাত্য জ্ঞানীগণ কোথাও কোথাও পাইয়া থাকিলেও, এই শ্রেণীর ভাব সেখানে এখনও তত গাঢ়রূপে আয়ত্ত হয় নাই বলিয়া, তাহার স্বতন্ত্র নামকরণের সময় উপস্থিত হয় নাই। নতুবা, আমাদের সোপান পঞ্চকের সঙ্গে, তাঁহাদের সোপান ত্রয়ের যে বিশেষ কোন বিরোধ আছে, তাহা নহে।

ব্রহ্মতত্ত্বের প্রথম, আদি, বা objective, কি অন্নময় এবং প্রাণময় অভিব্যক্তিতে, মানব জ্ঞানে ব্রহ্ম বস্তু অপরাপর বিষয়ের ন্যায় একটা বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়। মানব তখন আপনাকে যেমন দশটা বিষয়ের মধ্যে একটা বিষয় বলিয়া ভাবে, দেহাত্মাধ্যাস প্রযুক্ত দেহকেই দেহী বলিয়া মনে করে, সেইরূপ ব্রহ্ম বস্তুকেও দশটা বিষয়ের একটা বিষয়, নিসর্গ বা জড় জ্ঞান করিয়া থাকে। ইহাই "অন্ন ব্রহ্ম।"

ব্রহ্মতত্ত্বের দ্বিতীয় বা subjective কি মনোময় অভিব্যক্তিতে, মানব জ্ঞানে ব্রহ্মবস্তু, বিষয়ের অতীত, বিষয় হইতে স্বতন্ত্র, অতি বৃহৎ বিষয়ীরূপে প্রকাশিত হয়। জ্ঞান বিকাশে তখন মানুষ যেমন আপনাকে আর দশটা বিষয়ের মত একটা বিষয় না ভাবিয়া, বিষয়কে আপনার জ্ঞেয়, ও আপনাকে, বিষয় হইতে স্বতন্ত্র, বিষয়-নিরপেক্ষ, বিষয়ের জ্ঞাতা বা বিষয়ী বলিয়া জানিতে পারে, তেমনি ব্রহ্মকেও আপনারই অনুরূপ, কিন্তু আপনা হইতে অনন্তগুণে বড় ও অতিপ্রাকৃত, বিষয়ী বলিয়া অনুভব করে। এই ক্ষেত্রে ব্রহ্মতত্ত্বের অভিব্যক্তি মানব জ্ঞানে দ্বিবিধ আকারে প্রকটিত হইয়াছে। এক ইহুদীদিগের জিহোবা, অপর ভারতীয় আর্য্যগণের ব্রহ্ম। জিহোবা সোপাধিক, সগুণ, কর্ম্মশীল, পাপপুণ্যফলদাতা,—একজন অনন্তীকৃত

* তৈত্তিরীয় উপনিষদ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বল্লী দ্রষ্টব্য। ব্রঃ তঃ সঃ।

ও অতিপ্রাকৃত, (magnified and non-natural) মানুষ; ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরুপাধি, নিষ্ক্রিয়, অজ্ঞেয় বা শুদ্ধ সত্তা মাত্র জ্ঞেয়। যদি প্রথম অভিব্যক্তিকে objective বা অন্নময় অভিব্যক্তি বলা যায়, তবে এই দ্বিতীয় অভিব্যক্তিকে subjective বা মনোময় অভিব্যক্তি কহা অসঙ্গত নহে।

ব্রহ্মসত্তার তৃতীয় বা universal বা বিজ্ঞানময় অভিব্যক্তিতে মানব জ্ঞানে ব্রহ্মবস্তুর অপরিচ্ছিন্ন একত্ব প্রতিভাত হয়। মানব যখন আপনার জ্ঞানে বিষয় বিষয়ীর স্বাতন্ত্র্য ও পরস্পর নিরপেক্ষতা নষ্ট করিয়া, উভয়ের একাঙ্গতা সম্পাদন ও পরস্পরের অঙ্গাঙ্গিভাব হৃদয়ঙ্গম করে, তখন ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডকেও একীভূত করিয়া, ব্রহ্মের বিরাটত্ব বা বিশ্বরূপত্ব সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে। ব্রহ্ম তখন স্বতন্ত্র বিষয় বা বিষয়-নিরপেক্ষ বিষয়ী থাকেন না; কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ের সঙ্গে, সর্ব্ব বিষয়ের মধ্যে, স্বপ্রকাশিত বিষয়ীরূপে প্রকাশিত হন। তখন নিরাকার চিন্ময় ব্রহ্মের অনন্ত বিরাট বিশ্বাকার দর্শন করিয়া সে স্তব্ধ, অভিভূত, শ্রদ্ধাবনত হইয়া পড়ে। এই অভিব্যক্তিকে ব্রহ্মের বিজ্ঞানময় অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। মনের ধর্ম্ম ইন্দ্রিয় সাহায্যে বিষয়ের ভেদ ও বিরোধ সৃষ্টি। এই বিরোধ সৃষ্টি করিয়াই এই বিরোধ হইতেই, মনোময় বা subjective ব্রহ্মতত্ত্বের উৎপত্তি। বিজ্ঞানের ধর্ম্ম মনঃকৃত বিরোধ ভঞ্জন করিয়া, ইন্দ্রিয়ানুভূত ভেদাভেদ অতিক্রম করিয়া, একত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং ব্রহ্মসত্তার অভিব্যক্তির যে সোপানে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডের, সৃষ্টি ও স্রষ্টার, জীব ও ব্রহ্মের, অতিক্রমনীয় একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকে বিজ্ঞানময় বিশেষণ প্রদান করাই শ্রেয়ঃ।

এই সোপানেও ব্রহ্মের অভিব্যক্তি ত্রিবিধ আকার ধারণ করিয়াছে। এক দিকে প্রচলিত অদ্বৈতবাদ, অপর দিকে অবতারবাদ; তৃতীয় দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। এক দিকে মানব-জ্ঞান বিষয়কে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়া, বিষয়িকেই সর্ব্বে সর্ব্বা করিয়াছে; অপর দিকে শব্দ ব্রহ্মবাদ বা doctrine of Logos এর ভাব অবলম্বন করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মের অভিব্যক্তি রূপে গ্রহণ করিয়া, সাধুআত্মা, মহাপুরুষকে ব্রহ্মেরই অবতাররূপে গ্রহণ করিয়াছে। তৃতীয়তঃ জীব ব্রহ্মের মৌলিক একত্ব গ্রাহ্য করিয়া, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, উভয়ের ভেদও স্বীকার করিয়াছে; এবং মানবে ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ

প্রকাশ, সাধু আত্মা মহাপুরুষে তাঁহার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ মানিয়াও, প্রচলিত অবতারবাদের ভ্রান্তি ও কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়াছে।

ব্রহ্মতত্ত্বের এই অভিব্যক্তির ক্রম অনুসরণ করিয়া, ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্য দিয়া, তাহার কিরূপ প্রকাশ হইয়াছে, এখন তাহার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

ব্রহ্মসঙ্গীত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম রাজা রাম-মোহন রায়ের সময়ের ব্রহ্মসঙ্গীত; ২য় আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত; ৩য় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত; ৪র্থ নববিধান সঙ্গীত। ভারতবর্ষীয় সমাজের দুইটা বিভাগ করিলাম, কিন্তু সাধারণ ব্রহ্মসামাজের কোনও স্বতন্ত্র বিভাগ করিলাম না কেন, একথা উঠিতে পারে। ইহার কারণ এই যে নববিধানের প্রচারের পূর্ব্বে, ভারতবর্ষীয় সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিবার সময়, সাধারণ সমাজ যে সকল ভাব ও আদর্শ লইয়া আসিয়াছিলেন, এই সপ্তদশ বৎসর কাল, তাহাই অনেকে সযতনে পোষণ করিতে-ছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববিদ্যার এক নূতন অধ্যায় উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা এবং আয়োজন করিয়া থাকিলেও, এই নূতন তত্ত্ব ব্রহ্ম সঙ্গীতের মধ্যে এখনও সম্যক্ পরিস্ফুট হয় নাই। ফলতঃ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নিজস্ব একখানি অতি উপাদেয় সঙ্গীতপুস্তক থাকিলেও, নিজস্ব সঙ্গীত অতি অল্পই আছে। এই কারণেই ব্রহ্মসঙ্গীতের শ্রেণী বিভাগে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আজিও কোনও স্থান লাভের অধিকারী হন নাই।

১। রাজা, রামমোহন রায়ের সময়ের ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাজার মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ১১৬টী সঙ্গীত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে ছয়টী দুইবার মুদ্রিত হইয়াছে; সুতরাং রাজার সময়ের ব্রহ্মসঙ্গীত সর্ব্বশুদ্ধ ১১০টী মাত্র আমাদের নিকট আসিয়াছে। এই ১১০টী সঙ্গীতের মধ্যে ১০৬টী উদ্বোধন ও উপদেশ সূচক; চারিটী মাত্র আরাধনা কালে গীত হইতে পারে, প্রার্থনা সূচক সঙ্গীত একটী ও নাই।

আরাধনা-সূচক সঙ্গীত চারিটীর মধ্যে, একটীকে স্তোত্র বলা যাইতে পারে। সেটী এই—

"নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ, বিভু বিশ্ব নিকেতন। বিকার বিহীন, কাম ক্রোধ হীন, নির্ব্বিশেষ সনাতন।

অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর, অন্তরাত্মা অগোচর। সর্ব্ব শক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান, ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর।

অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়, একমাত্র নিরাময়। উপমা রহিত, সর্ব্ব জন হিত, ধ্রুব সত্য সর্ব্বাশ্রয়।

সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল, বিশুদ্ধ নিশ্চল, পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা, সর্ব্ব সাক্ষী অবিনাশ।

নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন, ভ্রমেন নিয়মে যাঁর। জল বিন্দুপরি, শিল্প কার্য্য করি, দেন রূপ চমৎকার।

পশু পক্ষি নানা, জন্তু অগননা, যাঁহার রচনা হয়। স্থাবর জঙ্গম, যথা যে নিয়ম, সেইরূপে সব রয়।

আহার উদরে, দেন সবাকারে, জীবের জীবন দাতা। রস রক্ত স্থানে, দুগ্ধ দেন স্তনে, পান হেতু বিশ্ব পাতা।

জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ, হয় যাঁর নিয়মেতে। সেই পরাৎপর, তারে নিরন্তর, ভাব মনে বিধি মতে।"

দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং ৩৫ ও ১০০ সংখ্যক সঙ্গীতে সামান্য ভাবে স্বরূপ বর্ণনা রহিয়াছে। কেবল মাত্র একটীতে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ ভাবে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

অবশিষ্ট সঙ্গীত মধ্যে ২৯টীতে বিশেষ ভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ১৩টী আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয়; ৩৫টীতে বৈরাগ্য ও দীনতা সম্বন্ধীয় উপদেশ, এবং ১৫টীতে সাধনতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। একটী সঙ্গীতে বিশেষভাবে পরমেশ্বরকে 'পুনর্জননহরণ' বলা হইয়াছে।

মোটামুটি বলিতে গেলে, রাজা রামমোহন রায়ের সময়ের ব্রহ্ম সঙ্গীতের ব্রহ্মকে বেদান্তের তটস্থ লক্ষণা-নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে ব্রহ্মকে আমরা যে বিশেষ ভাবে জানিতে পারি, তাঁহার সঙ্গে যে কোনও প্রেমের যোগে আবদ্ধ হইতে পারি, তিনি যে পাপপুণ্যফলদাতা, এসকল ভাব কুত্রাপি এই সকল সঙ্গীতে পরিস্ফুট হয় নাই।

* বেদান্তের সঙ্কেত যেমন "নেতি নেতি" রামমোহন রায়ের সময়ের ব্রহ্ম সঙ্গীতের প্রধান সূত্রও সেইরূপ "নেতি নেতি"। যথা, ৭৯ সংখ্যক সঙ্গীতে—

"সৃজন পালন লয়, ইচ্ছায় যাঁহার হয়, স্বরূপ না জানে দেব ঋষিমুনিগণ। অভ্রান্ত বেদান্ত সাস্ত, কহে না পাইয়া অন্ত, এ নহে এ নহে হয় এই নিরূপণ॥"

একটী সঙ্গীতে বলিতেছেন :—

অন্তহীনে ভ্রান্তমন কেন দাও উপাধি। জলচর খেচর ব্যাপ্ত ভূধর অবধি।

কাম ক্রোধ নাহি যাঁর, নির্দ্বন্দ্ব নির্ব্বিকার, না দিবে উপমা তার এই সত্য বিধি।

তিনি যে গুণাতীত, অখণ্ড অপরিমিত, শব্দাতীত, স্পর্শতীত, বেদে বলে নিরবধি।

মনে করে না যায় পাওয়া, বাক্যেতে না হয় কওয়া, সন্তরণে পার হওয়া, হয় কি জলধি।"

আর একটী সঙ্গীতে (৭৬) পরমেশ্বরকে জানিবার জন্য শ্রম করা বৃথা ইহাও বলা হইয়াছেঃ—যথা,

"জানিতে তাঁয় পরিশ্রম, করিছ সে বৃথা শ্রম,
সে সব বুদ্ধির ভ্রম, দুঃসাধ্য সূচনা।
বিচিত্র বিশ্বনির্ম্মাণ, কার্য্য দেখে কর্ত্তা মান,
আছে এই মাত্র জ্ঞান, অতীত ভাবনা।"

উপরি উল্লিখিত সংগীতগুলি রাজার সহচরদিগের, কিন্তু তাঁহার স্বরচিত বলিয়া যে সকল সঙ্গীত জানা আছে, তাহাতেও ইহার অনুরূপ ভাব বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা, ৫ম সঙ্গীতে "নিরঞ্জনে নিরূপণ, কিসে হবে বল মন, সে অতীত ত্রৈগুণ্য। নষণ্ড পুমান শক্তি, সে অগম্য বুদ্ধি যুক্তি, অতিক্রান্ত ভূত পংক্তি, সমাধান শূন্য।" ইত্যাদি।

অন্যত্র রাজা করিতেছেনঃ—

"যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাকে,
তুমি কেবা আন কাকে, এ কি চমৎকার।"

* এই সকল অভাব বেদান্ত শাস্ত্র-ঘটিত নহে, সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা ঘটিত। ব্রঃ তঃ সঃ।

কোথাও কোথাও উপনিষদের কথা পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে সঙ্গীতের মধ্যে গ্রথিত করা হইয়াছে। যথা, রাজার স্বকৃত একাদশ সঙ্গীতে বলা হইয়াছে :—

"হংস রূপে সর্ব্বান্তরে, ব্যাপিল যে চরাচরে,
সে বিনা কে আছে ওরে এ কোন নিশ্চয়।
স্থাবরাদি জঙ্গম, বিধি বিষ্ণু শিব যম, প্রত্যেকেতে যথা ক্রম, যাঁতে লীন হয়।"

'হংস' শব্দ এস্থলে স্পষ্টতঃ উপনিষদ্ হইতে গৃহীত।* এই সঙ্গীতে আর একটী রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। সেটী এই যে রাজা রামমোহন রায় ঈশ্বরের একত্ব ও চিন্ময়ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া, দেবতাবাদকে অসত্য বলিয়া প্রমাণ করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। রাজার স্বরচিত "ভাব সেই একে" সঙ্গীতেও ইহার প্রমাণ আছে।

কিন্তু রামমোহন রায়ের সময়ের সঙ্গীতে নিরুপয়াধি ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশিত হইলেও, স্থানে স্থানে যে সগুণ ব্রহ্মের ভাব পাওয়া যায় না, তাহা নহে।† উপরি=উদ্ধৃত ২৫ সংখ্যক সঙ্গীত দেখুন্। সেটি রাজার স্বরচিত সঙ্গীত। কাঃ রাঃ সাক্ষারিত আর একটী সঙ্গীতেও ইহার অনুরূপ ভাব দৃষ্ট হয়। নিঃ মিঃ স্বাক্ষরিত একটী সঙ্গীতে ঈশ্বরকে নিয়ন্তা বলা হইয়াছে। সে সঙ্গীতটী অনেকেই জানেন।—"কেন ভোল মনে কর তাঁরে" (৬২)

যে একটী মাত্র সঙ্গীতে পরমেশ্বরকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া, তাঁহার ব্যক্তিত্ব প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাও রাজার স্বরচিত বলিয়া বোধ হয়। সে সঙ্গীতটী অনেকেই জানেন। সেটী—"কি স্বদেশে কি বিদেশে" ইত্যাদি (১০২)

রাজা রামমোহন রায়ের সময়ের ব্রহ্মসঙ্গীতের ব্রহ্মতত্ত্ব যেমন বেদান্ত-সম্মত, তাঁহার সাধনতত্ত্বও সেইরূপ বেদান্তেরই অনুশাসনের উপরে প্রতি-ষ্ঠিত। রাজার স্বকৃত ২০ সংখ্যক সঙ্গীতে আছে :—

"যদ্যপি চাহ জানিতে, ঐক্যভাব করি চিতে, চিন্তহ তাঁহার।"

---

* কঠ, ৫। ২; শ্বেতাশ্বতর, ৬। ১৫—ব্রঃ তঃ সঃ।

† ইহার কারণ এই যে বেদান্তের ব্রহ্ম কেবল নির্গুণ নহেন; তিনি একদিকে নির্গুণ, আর এক দিকে সগুণ। ব্রঃ তঃ সঃ।

অন্যত্র (২৪) উপনিষদের অনুজ্ঞা ('তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ') স্মরণ করিয়াই যেন বলা হইয়াছে :—

'সঙ্গ করি আত্মজ্ঞানী, আছে মাত্র এই জানি, বিশ্বময়
তাঁরে জানি, ত্যজ আশা অহঙ্কার।'

অন্যত্র (৬৪) 'আসন' সম্বন্ধেও উল্লেখ আছে :—

"সর্ব্বকর্ম্ম ত্যজিয়া একের লও শরণ।
নাশিবে কলুষরাশি, নিরর্থক শোক কেন?
স্বচ্ছন্দ আসনে বসি, ভাব সেই অবিনাশী,
জলতে যাদৃশ শশী, সর্ব্বভূতে নিরঞ্জন।
বশীভূত কর মায়া, সর্ব্ব জীবে রাখ দয়া,
পুনশ্চ না হবে কায়া, আনন্দেতে হবে লীন।"

"বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।"

"বিবেক বৈরাগ্য দ্বয়, আত্মজ্ঞানের সহায়।" (৮৯)

"শ্রবণ মনন তাঁর কর পুনঃ পুনঃ" ("আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ")।

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত"—এই বেদান্ত-বাক্য প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিতেছেন :—

"আত্মউপাসনা বিনা কিছু নহে মন,
আত্মাতে আত্মতা করা ব্রহ্মের সাধন।
দেখ সত্যের সত্তা বই তুমি আমি কেহ নই।" (৯০)

অন্যত্র—"মাজিয়া মন দর্পণ কর তাঁরে দর্শন।" (৪০)

বৈরাগ্য সম্বন্ধে অনেক সঙ্গীত আছে। তার একটী মাত্র এ স্থলে উদ্ধার করিলাম :—

"ইন্দ্রিয় বিষয় দানে নহে ইন্দ্রিয় দমন। ঘৃতাহুতি দিলে বহ্নি না হয় বারণ। বৃত্তিহীন করে মনে, রাখ ইন্দ্রিয় শাসনে, জীব ব্রহ্ম এক জ্ঞানে, থাক যোগ পরায়ণ। উপভোগে সুঁপে বিরাগ। ব্রহ্মে রাখ অনুরাগ, তবে তো হইবে ত্যাগ, ভেদ দৃষ্টি মিথ্যা জ্ঞান। এক ব্রহ্ম ন দ্বিতীয়, বিশ্বাস কর নিশ্চয়, নাশিবেক সর্ব্বভয়, আত্মায় কর প্রাণার্পণ।" (৮৮)

ব্রহ্মতত্ত্বের অভিব্যক্তি সোপানে এই সকল সঙ্গীতের মধ্যে প্রকাশিত তত্ত্ব যদিও দ্বিতীয় সোপানেরই অন্তর্গত, অর্থাৎ যদিও ইহা মনোময় কোষেতেই আবদ্ধ, তথাপি ইহার মধ্যে কুত্রাপি যে বিজ্ঞানময় কোষের অধিকার ভুক্ত একত্ব তত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই তাহা নহে। স্থানে স্থানে এই সকল সঙ্গীত যেন antithesis (ভেদ) এর অবস্থা অতিক্রম করিয়া synthesis (ভেদাভেদ) এর উন্নত ভূমিতে সভয়ে, সন্তর্পণে পাদক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতেছে। যথা :—

পাত্রে পাত্রে রাখি অম্বু, দেখ রবি প্রতিবিম্বু,
তেমতি প্রত্যক্ষ আত্মা সর্ব্বভূত চরাচরে।
দেখ গাভি নানা বর্ণ, দুগ্ধ সবে একবর্ণ,
সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠান, এই বোধে ভাব তাঁরে। (৬৬)

একটী মাত্র সংগীতে (১০০) 'বিশ্বরূপ' কথাটি দৃষ্ট হয়। এই বিশ্বরূপও বেদান্তেরই বিশ্বরূপ। পুরাণে ইহার যে অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়, এই সঙ্গীতে তাহার কোনও আভাস নাই। অতএব রামমোহন রায়ের সময়ের ব্রহ্ম-সঙ্গীতে যে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় তাহাকে এক কথায় বলিতে গেলে বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব বলা যায়। ব্রহ্মতত্ত্বের উপরি-উল্লিখিত অভি-ব্যক্তি সোপানে, ইহা দ্বিতীয় সোপানে স্থিত। কিন্তু ইহাতে পরবর্ত্তী সোপানে আরোহণের জন্য একটি চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

এই সঙ্গীতগুলি সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়াই ইহাদের আলোচনা শেষ করিব। সে কথাটী এই যে, এ সকল সঙ্গীত সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান প্রধান। জ্ঞান লাভের উপকরণরূপে বৈরাগ্যের কথা ইহাতে বিস্তর আছে, কিন্তু ভক্তির ভাব নাই বলিলেই হয়। ঈশ্বরের করুণার বর্ণনাও অতি অল্প, কেবল একটী মাত্র সঙ্গীতে ঈশ্বরের প্রীতি ও ঈশ্বরের করুণার যৎসামান্য উল্লেখ আছে, সেটী রাজার স্বরচিত। যথা—

"ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যের ভয়।
যাহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়।
জড় মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমায়।
সকল ইন্দ্রিয় দিলে তোমার সহায়।
কিন্তু তুমি ভুল তারে এত ভাল নয়।" (৪৫)

২। আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গীত।

ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে মোটামোটী আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গীত রামমোহন রায়ের সময়ের ব্রহ্মসঙ্গীতেরই সম শ্রেণীতে রহিয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গীতও সাধারণভাবে সেই বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্বকেই অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। তবে রামমোহন রায়ের সময়ের সঙ্গীতের উপরে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রাধান্য এই যে. ইহাদের মধ্যে সেই প্রাচীন ব্রহ্মতত্ত্বই নবীন ও প্রগাঢ় প্রীতি-সংযুক্ত হইয়াছে। এই নবীন প্রীতির সংযোগে সেই প্রাচীন তত্ত্ব কিঞ্চিৎ বিকশিতও হইয়া উঠিয়াছে। রাম-মোহন রায়ের সঙ্গীতের নির্গুণ, সত্তামাত্র জ্ঞেয় ব্রহ্ম এখানে সগুণ হইয়াছেন। প্রীতির তৃপ্তি শক্তিতে নহে, ব্যক্তিতে; অতএব প্রাচীন সঙ্গীতের ব্রহ্মশক্তি, বা শুদ্ধ জ্ঞানরূপী ব্রহ্ম, এখানে ব্যক্তিরূপে, পুরুষরূপে, পূজিত হইয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজকে যদি একজন দেহী, organism, ও একজন সাধকরূপে কল্পনা করা যায়, তবে ইহাই বলিতে পারা যায় যে রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাহ্মসমাজরূপ সাধক বিবেক বৈরাগ্যাদির সহকারে, "নেতি নেতি" সাধন করিয়া, দেবেন্দ্রনাথের সময়ে প্রীতির প্রথম সোপানে পাদক্ষেপ করিয়া উত্তরোত্তর ভক্তিমার্গে আরোহণ করিয়াছেন। মহর্ষির বর্ত্তমান জীবনের ইতিহাস এখনও সাধারণের অজ্ঞাত; নতুবা আমি স্বকর্ণে তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা জানিলে, সাধারণে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন যে ব্রাহ্মসমাজের এই প্রাচীন সাধক ও সাধু-পুরুষ প্রথমে জ্ঞান, তৎপরে প্রীতি, ক্রমে ভক্তি সাধন করিয়া, এক্ষণে জীবনের শেষপাদে রাগমার্গে পাদচারণ করিবার আয়োজন করিতেছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজে এই প্রীতির প্রভাব এত প্রবল যে, এমন কি স্থানে স্থানে রামমোহন রায়ের সময়ের ব্রহ্মসঙ্গীতকেও এই নবীনা প্রীতির কোমল-কঠোর শাসন স্বীকার করিয়া, তাহার অনুরোধে, আপনার অঙ্গাভরণকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছে। রামমোহন রায়ের একটী সঙ্গীতে ছিল;—

"সঙ্গের সঙ্গী রে মন, কোথা কর অন্বেষণ,
অন্তরে না দেখে তাঁরে কেন অন্তরে ভ্রমণ।

যে বিভু করে যোজন, কর্ম্মেতে ইন্দ্রিয়গণ,
মাজিয়া মন দর্পণ, তাঁরে কর দর্শন।" (পৃঃ ৪০)

আদি সমাজে, প্রীতির শাসনে, শেষের দুই পদ এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে :—

"যেই বিভু সনাতন, জীবের হৃদয়ধন,
মাজিয়া মন দর্পণ, তাঁরে কর দর্শন।" (৩৫)

ফলতঃ পূজার ভাব আদি সমাজের সঙ্গীতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। রামমোহন রায়ের সময়ে যিনি সত্যং জ্ঞানম্, মহর্ষির সময়ে তিনি আনন্দম্। রাম-মোহন রায়ের সময়ে শুনিয়াছিলাম, "কার্য্য দেখি কর্ত্তা মান," মহর্ষির সময়ে শুনিলাম ;—

"তপন প্রকাশ পায় যাঁহার প্রকাশে
তিনি প্রাণের প্রাণ।"

ব্রহ্মের সত্তা মাত্র জ্ঞান, "অস্তীতি" ইহাই রামমোহন রায়ের সময়ের সঙ্গীতের প্রধান অবলম্বন, আদি সমাজের সঙ্গীতে তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম-জ্ঞানের সূচনা ও বিকাশ। রামমোহন রায় মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি স্মরণ করাইয়া মনকে উপাসনায় উদ্বুদ্ধ করিতেন, আদি সমাজ তার পরিবর্ত্তে বলিতে লাগিলেন :—

"নয়ন খুলিয়ে দেখ নয়নাভিরামে।
হৃদয় কমল বিকাশে যাঁর নামে।
গগনে ভানু সহস্র কর বিস্তারি জগত মন্দিরে
বিরাজেন স্বপ্রকাশ।
দেখ দেখ প্রেমাকরে, দিবাকর জিনিয়ে
উজ্জ্বল সুন্দর অনুপম।"

আবার গাহিলেন :—

"অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভোলনা রে তায়।"

আবার :—

"আজ সবে গাও আনন্দে, তাঁর পবিত্র নাম লয়ে, জীবন কর সফল।

সরল হৃদয় লয়ে চল সবে অমৃতের দ্বারে, কত সুধা মিলিবে।
দুর্ব্বল সবল, ভীরু অভয়, অনাথ গতি হীন হয় সনাথ,
সেই প্রেমশশী যবে, মধু বরষে সাধুর হৃদয়াধারে।"

আবার ডাকিলেন :—

"জনম এমন বৃথা চলে গেল।
মোহে অন্ধ হয়ে কত আর থাকবে বল।
চারি দিনের সুখেরি কারণ ভুলিয়ে গেলে সেই প্রাণ সখারে ; এখনো নাহি চেতন, এত অচেতন।"

যখন এতেও প্রাণ জাগিল না, তখন বলিলেন :—

"ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে
ডাকিতে এসেছি তাই, চল ত্বরা করে।
তাপিত হৃদয় যারা, মুছিবে নয়নধারা।
ঘুচিবে বিরহ তাপ, চিরদিন তরে।"

রামমোহন রায় দেখাইয়াছিলেন ভয়,—"এমন দিন রবে না। মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" ইত্যাদি ইত্যাদি। মহর্ষি দেখাইলেন লোভ,—"কেন অচেতন চির জীবন। মোহ নিদ্রা হতে উঠ, এত কেন অচেতন। দেখ আনন্দকর, জ্ঞাননেত্র খুলিয়ে, সুখ হইবে অপার।"—লোভ হইতে ভক্তি। এই লোভ যেই জাগিয়া উঠিল, অমনি ব্রাহ্মসমাজ ধীরে ধীরে ভক্তির পথে পা ফেলিতে আরম্ভ করিল। ভক্তের ভগবান না হইলে প্রাণ বাঁচে না ; ব্রাহ্মও ব্রহ্মের জন্য ব্যাকুল হইলেন। গাহিলেন :—

"তুমি জ্যোতির জ্যোতি দেখা দাও হে।
রবি শশী তারা শোভে না আমার কাছে যবে হারাই তোমারে।
কিসের সে জীবন যৌবন তোমা বিহনে, কি হবে,
সে জ্ঞানে যাতে তোমায় না পাই।" (পৃঃ ৪১)

আবার গাহিলেন ;—

"দরশন দাও হে কাতরে, দীন হীন আমি।
রোগে আতুর, শোকে আকুল, মলিন বিষাদে। (পৃঃ ৪৬)

আবার ;— "অন্তরের অন্তর, ডাকি তোমায় ;

ডাকি তোমায়, প্রাণদাতা, রাখ রাখ আমায় ।
দুস্তর ভবার্ণবে তুমি ভেলা, অন্ধকার জগতের তুমি আলো।"(৪৭
আবার ;— "দেখা দাও আঁখিরঞ্জন"। (পৃঃ ৬৭)
ডাকিয়া যখন দেখা পাইলেন না, তখন অধীর হইয়া ইতি উতি উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ভক্তিরস আস্বাদনে বিষয় তিক্ত হইয়াছে। কালের কয়াল গর্জ্জনে যে বিষয়-বিরক্তি জন্মাইতে পারে নাই, প্রীতির মৃদুল মোহন বংশী রবে তাহা জন্মিয়াছে, তাই বিষয় সুখে আর তৃপ্তি না মানিয়া ব্রাহ্ম ব্যাকুলচিত্তে গাহিতেছেন :—

"আহা কে দিবে আনিয়ে তাঁরে।
হারায়ে জীবন শরণে জীবনে কি কাজ আমার।
ঐহিকের সুখ যত, জানি তা, কাজ নাই সে সুখে সে ধনে।
হারায়ে জীবন শরণে জীবনে কি কাজ আমার।" (পৃঃ ৬৫)।

যখন তাঁহার দর্শন পাইলেন, তখন গাহিলেন ;—

"প্রেম সিন্ধু উথলে দেখে তোমায়
আনন্দ না ধরে হৃদয়ে।
ওরূপ দেখিয়ে ভুলিতে কে পারে, নয়ন না ফেরে
আর কোথায়, আনন্দ না ধরে হৃদয়ে।" (৫৪ পৃঃ)।

তার পরে ক্রমে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর, মধুর হইতে মধুরতর হইতে লাগিল। রামমোহন রায়ের সময়ের নির্গুণ ব্রহ্মই আদি সমাজের পিতা, সখা, মাতা হইলেন। সম্বন্ধ আরো ঘনিষ্ঠ, আরো মধুর হইল। ব্রাহ্ম ডাকিবলেন :—

"স্বামী তুমি এস আজ, অন্ধকার হৃদয় মাঝ।"

আবার বিরহে কাতর হইয়া গাহিলেন :—

"তোমা লাগি নাথ জাগি জাগি হে
সুখ নাই জীবনে তোমা বিনা।।"

আবার যখন মিলন হইল, তখন আত্মহারা হইয়া বলিলেন :—

"সব দুঃখ দূর হইল তোমারে দেখি।
নব জ্যোতি বিভাসিত, নব প্রাণ বিকশিত,

মব প্রীতি প্রবাহ হিল্লোলে।
চারি দিকে চিরদিন নবীন লাবণ্য তব প্রেম নয়ন ছটা।
হৃদয়-স্বামী তুমি চির প্রবীণ, তুমি চির নবীন,
চির মঙ্গল, চির সুন্দর। (২৩৪ পৃঃ)।

কিন্তু আদি সমাজের সঙ্গীতের এই ভক্তি প্রীতি, এই আদর অভ্যর্থনা, এই বিরহ ব্যাকুলতা, সকলই অতি সংযত, অতি শান্ত, অতি ভদ্র ও সভ্য আকারের। বেদান্ত-প্রতিবাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব ইহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত, সুতরাং "রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ" প্রভৃতি ভাগবতোক্ত ভক্তিলক্ষণ ইহাতে প্রকাশিত হয় নাই। এমন কি, যে ভাগবতী লীলা ভক্তির সর্ব্ব প্রধান অবলম্বন ও উপজীব্য, তাহারও বিশেষ বিকাশ আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সঙ্গীতের কোথাও কোথাও ইহার অঙ্কুরোদ্গম দৃষ্ট হইয়াছে। যেমন—

একি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ। (১৩৬ পৃঃ)।

আর একটী সঙ্গীতে আছে ;—

তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলেছিলে বলে
দেখ গো কি দশা হয়েছে। (১৮০ পৃঃ)।

এই শেষ সঙ্গীতে যদিও একটু ঘনিষ্টতার ভাব আছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহাতে ভাবের সত্য প্রাণগত আস্বাদন অপেক্ষা কল্পনার আস্ফালনটা যেন অনেক বেশী বলিয়া বোধ হয়। অতএব আদি সমাজের সঙ্গীতে ভাগবতী লীলার ভাব ফোটে নাই বলিলেও চলে।

কিন্তু বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে লীলাময় ভগবৎ-তত্ত্বে যাইতে হইলে, পথে বিশ্বরূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে হয়। নির্গুণ বীজ, বিরাটমূর্ত্তি তার অঙ্কুর, ভগবান সে বীজের পত্র-পল্লব-কুসুম-শোভিত বিকশিত বৃক্ষ, প্রেম সে বৃক্ষের ফল। বীজ হইতে অঙ্কুরের ভিতর দিয়া ভিন্ন বিকশিত বৃক্ষের অভিব্যক্তি অসম্ভব। কিন্তু আদি সমাজের সঙ্গীতে এই বিরাটমূর্ত্তি দর্শনের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। অতএব এই সঙ্গীতে ভাগবতী লীলার রসাস্বাদন হয় নাই, ইহা আর আশ্চর্য্য কি ?

আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত সম্বন্ধে আমি প্রথমেই যাহা বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম, শেষ কথাও তাহাই। আদি সমাজের সঙ্গীতে ব্রহ্মতত্ত্বের কোনও নূতন বিকাশ লক্ষিত হয় না ; তবে রামমোহন রায়ের সময়ের সেই প্রাচীন বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে আদি সমাজ নবীন ও প্রগাঢ় প্রেমভক্তি সংযোগ করিয়া, ব্রহ্মের উপাসনাদি সম্ভাবিত করিয়াছেন। ইহার দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বের কোনও বিশেষ বিকাশ সাধিত না হইয়া থাকিলেও পরবর্ত্তী বিকাশের ভূমি প্রশস্ত ও প্রস্তুত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অভিব্যক্তি সোপানাবলীর মধ্যে এক একটা যোগসূত্র থাকে। শোঁ পোকা গুটিপোকা হইয়া পরে প্রজাপতির সাজ প্রাপ্ত হয়। এই ক্রম-

বিকাশের অবস্থা হেয় নহে। ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মতত্ত্বের অভিব্যক্তিতে আদি সমাজ এই গুটিপোকার অবস্থার নিদর্শন স্বরূপ।

৩। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মুদ্রিত সঙ্গীত পুস্তকের প্রথম ভাগে যে সকল সঙ্গীত আছে, সেই সকল সঙ্গীতকেই আমি বিশেষভাবে ভারতবর্ষীয় সমাজের সঙ্গীত বলিয়া গণনা করিয়াছি।

ভারতবর্ষীয় সমাজের প্রথম ভাগ সঙ্গীতগুলি ১৭৯৬ শক বা ব্রাহ্ম সংবৎ ৪৫ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। ইহার চারি বৎসর পরে, ১৮০০ শকে ৪৯ ব্রাহ্ম সংবতে সাধারণ সমাজের জন্ম হয়। এই চারি বৎসর ও তৎপরবর্ত্তী আরও এক বৎসরকাল নববিধানের গর্ভবাস কালরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই পাঁচ বৎসরের সঙ্গীতের আলোচনা পরবর্ত্তী প্রবন্ধাংশের সঙ্গে করিব।

এই সঙ্গীত পুস্তকে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৮৮ সঙ্গীত আছে। তন্মধ্যে ৫৬টী আদি সমাজের সঙ্গীতের অন্তর্গত ; অবশিষ্ট ৩১২টী ভারতবর্ষীয় সমাজের নিজস্ব।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতে ব্রহ্মতত্ত্ব মূলতঃ আদি সমাজের সমস্থানীয় হইলেও, প্রেমের প্রগাঢ়তা নিবন্ধন যেন অনেকটা ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে। জীব ব্রহ্মের মৌলিক একত্ব এই সকল সঙ্গীতেও প্রকাশিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তবে পরমেশ্বরের বিধাতৃ ভাব, মাতৃভাব, দয়ার ও প্রেমের ভাব পূর্ব্বাপেক্ষা আরও গভীর, আরও প্রস্ফুটিত ও ঘন হইয়া আসিয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে এই সকল সঙ্গীতে নূতন কোনও একটা বিশেষ বিকাশ লক্ষিত না হইলেও, সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ব্রহ্মসঙ্গীতের ইতিহাসে ভারতবর্ষীয় সমাজের সঙ্গীতেই সাধকের পাপবোধ ও আত্মনিবেদনের ভাব বিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছে। রামমোহন রায়ের সময়ের সঙ্গীতে প্রার্থনা-সূচক গান একটীও ছিল না। আদি সমাজের সঙ্গীতে অনেকগুলি প্রার্থনা-সঙ্গীত আছে বটে, কিন্তু এই সকল প্রার্থনা, স্থানে স্থানে খুব ব্যাকুল হইলেও, অনেক স্থলেই ভাসা ভাসা। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রার্থনা সকল মর্ম্মস্পর্শী ও হৃদয়ভেদী। পাপবোধ ও তন্নিবন্ধন আত্মনিবেদন আদি সমাজের সঙ্গীতে অঙ্কুরিত মাত্র, কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমাজের সঙ্গীতে তাহা পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ ভারতবর্ষীয় সমাজের প্রথম সময়ের সঙ্গীতের বিশেষত্বই এই স্থানে, এই গভীর তীব্র পাপ যাতনায়। এই স্থানেই ব্রহ্মসঙ্গীত রামমোহন দেবেন্দ্রনাথের বৈদান্তিক ভাবকে যেন একটু একটু অতিক্রম করিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতবর্ষীয় সমাজের প্রকৃত ৩১২টী সঙ্গীতের মধ্যে ৯৭টী ব্রহ্মসংকীর্ত্তন, অবশিষ্ট ২১৫টীর মধ্যে পঞ্চাশটী বা প্রায় এক চতুর্থাংশ কেবল তীব্র পাপ-যাতনা-সূচক। আদি সমাজের সঙ্গীতে কেবল মাত্র একটী স্থলে এই পাপ যাতনায় স্ফুট ভাব [illegible]।

পাপে তাপে বিকলিত মনঃ শীঘ্র সন্তাপ নাশো।
মোহাচ্ছন্নে হৃদয় গগনে প্রেমসূর্য্য প্রকাশো।
অজ্ঞানান্ধে বিতর সুমতি, তার দুঃখী অনাথে।
আপদ সম্পদ সকল সময়ে থাক ভক্তের সাথে।

(পৃঃ ৬৯, সং ৬)

এই পাপও যেন অনেকটা অজ্ঞানতা মাত্র। এই পাপও বৈদান্তিক পাপ মাত্র। ইহাতে স্বকৃত, জ্ঞানকৃত পাপের যে তীব্র বেদনা, তাহার লক্ষণ কিছুই নাই। ভারতবর্ষীয় সমাজের পাপ-বোধ অন্য জাতীয়। আদি সমাজের পাপ এত হালকা যে তাহা শীঘ্র নষ্ট হওয়া সম্ভব, সাধকের এ জ্ঞান ও এ আশা প্রবল। ভারতবর্ষীয় সমাজের সাধক আপনার পাপ ভারে আপনি অবসন্ন, গভীর-অন্ধকারে নিমগ্ন; এ ভার যে কখনও ঘুচিবে তাহা পর্য্যন্ত সাহস করিয়া আশা করিতে পারিতেছেন না। তাহাই গাহিতেছেন :—

পতিত পাবন, এ পাতকী জন, পাবে কি কখনও চরণ তোমার।
কুটিল হৃদয়, কুচিন্তার আলয়, না হয় সহজে প্রেমোদয় যার।
অকলঙ্ক তুমি পুণ্যের আধার, চির কলঙ্কিত আমি দুরাচার;
তুমি অন্তর্যামী, হৃদয়ের স্বামী, জানিছ সকলি বলিব কি আর।
এ ঘোর সঙ্কটে করিতে উদ্ধার, অকিঞ্চন নাথ কেহ নাই আমার;
যা কর এখন, বিপদ ভঞ্জন, আমার ত ভরসা কিছু নাহি আর।

আবার গাহিলেন :—

আমার কি হবে উপায়,
দয়াময় বৃথা দিন যায়।
প্রকৃতি অধম আমি অতি দুরাশয়।
জ্ঞাতকৃত অপরাধে, বঞ্চিত তব প্রসাদে,
গভীর বিষাদে তাই মলিন হৃদয়;
নিজ দোষে বারম্বার, করিয়াছি পাপাচার,
এখন কলঙ্ক ভারে অবসন্ন প্রায়।
আপন কুকর্ম্ম ফলে, দিবানিশি মরি জ্বলে,
অনলে পতঙ্গ যেমন জীবন হারায়;
সহে না সহে না আর, শীঘ্র কর হে উদ্ধার,
বিলম্বে মরিবে প্রাণে তোমার দুর্ব্বল তনয়।

সাধকের পাপযাতনা ও পাপবোধ এত তীব্র ও উজ্জ্বল যে পরমেশ্বরের পূজা করিবেন যে, তাহার পর্য্যন্ত সাহস হয় না। তাই ব্যাকুলচিত্তে গাহিতেছেন :—

মলিন পঙ্কিল কেমনে ডাকিব তোমায়
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়।
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম; আমি পাপী তৃণ সম
কেমনে পূজিব তোমায়।
শুনি তব নামের গুণে, তরে মহাপাপী জনে;

লইতে পবিত্র নাম, কাঁপে হে মম হৃদয়।
অত্যন্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয়।
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে,
বল করে কেশে ধরে দাও চরণে আশ্রয়। (১৩০ সংখ্যা, ৬৯ পৃঃ।)

আদি সমাজ জ্ঞান-সাধক, বৈদান্তিক উপাসক, প্রার্থনীয় ছিল অমৃত ও আনন্দ। ভারতবর্ষীয় সমাজ পাপভারে ভারাক্রান্ত, ভাব-সাধক, এক প্রকার পৌরাণিক উপাসক, তাঁহার প্রার্থনীয় হইল—শান্তি। শান্তির উদ্দেশে অনেকগুলি সঙ্গীত ব্রহ্মসঙ্গীতাবলী মধ্যে ভারতবর্ষীয় সমাজই প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যথা,

শান্তি কোথা আছে আর অমৃত-সাগর বিনা।
ভুলে সে অমৃতে যেই বিষয় বিষের কুণ্ডে,
করে শান্তি অন্বেষণ, ভ্রমবুদ্ধি তার।
ওরে সন্তাপিত জীব, বৃথা কেন ভ্রমিতেছ,
কাঁদিতেছ ভবারণ্যে হয়ে শান্তি হারা।
অমৃত সাগরে যাও, যাবে তাপ পাবে শান্তি,
সকলেরই প্রতি আছে মুক্ত তার দ্বার। (১৭ সংখ্যা।)

ভারতবর্ষীয় সমাজ প্রথমাবস্থায় প্রার্থনা-প্রধান ছিলেন। এই প্রার্থনাই তাঁহার ধর্ম্মসাধনের একমাত্র সম্বল ছিল। যখন পাপবোধ তীব্র থাকে, অন্তরে অনুতাপের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, যখন আপনার সঙ্গে সংগ্রামে মানব রত হইয়া, বারম্বার হারিয়া গিয়া আপনার অসারতা ও অক্ষমতা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করে, তখন তাহার প্রার্থনা ভিন্ন আর গতি থাকে না। সে অবস্থায় তাহার প্রার্থনা সত্য প্রার্থনা হয়, সে প্রার্থনার আর্ত্তনাদে স্বর্গের সিংহাসন সত্য সত্যই টলিয়া থাকে, এবং ভক্তের কাতর-ক্রন্দনে আবদ্ধ হইয়া ভগবান স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাৎভাবে তাহার পাপ তাপ ভার মোচন করিয়া থাকেন। এই অভিজ্ঞতা হইতেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রার্থনাকেই একমাত্র সাধন-সহায়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেন না পাপে পড়িয়া প্রার্থনা করিয়া তাঁহারা পাপ হইতে, হৃদয়-বেদনা হইতে, অশান্তির যাতনা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

গভীর অন্ধকারের পরে উষার উজ্জ্বল আলোক যেমন বড় মিষ্ট, তীব্র যাতনার পরে আরাম ও স্বাস্থ্য যেমন মধুর, জলন্ত পিপাসার পরে শীতল বারি পান যেমন অমৃতোপম, গভীর পাপ-যাতনার পরে পরমেশ্বর ব্রাহ্মের নিকট তেমনি মিষ্ট, তেমনি মধুর, তেমনি অমৃতোপম হইলেন। আদি সমাজের যাতনা ও পাপবোধ অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল, এতাবৎ সম্ভোগও তাই অপেক্ষাকৃত ভাসা ভাসা। ভারতবর্ষীয় সমাজ ঈশ্বরবিহীন অবস্থায় বর্ণনাতীত যাতনা সহ্য করিয়াছিলেন, তাই ঈশ্বর প্রসাদে যখন এই যাতনার অবসান হইল, তখন ঈশ্বর-সম্ভোগ তাঁহাদের যেমন গভীর, যেমন মধুর, যেমন জয়যুক্ত, এমন আদি সমাজের হয় নাই। যেমন পূর্ব্বে শিরায়

শিরায় পাপ-বাসনা অনুভূত হইয়াছিল, তেমনি এখন শিরায় শিরায় ব্রহ্ম-প্রেম সঞ্চারিত হইতে লাগিল। যেমন পূর্ব্বে জীবনের সর্ব্বত্র পাপ রাক্ষসীর বিহার ভূমি ছিল, এখন তেমনি সর্ব্বত্র পবিত্র স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ শান্তি-দাতার লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিল। সাধক গাহিলেন :—

তাই ডাকিহে তোমায় বলে দয়াময়।
ডাকিলে কাতর প্রাণে, শীতল হয় হৃদয়।
নাম গানে প্রেমোদয়, দরশনে কত কত সুখ হয়,
স্বরূপ চিন্তনে পাপভয় দূরে যায়।
তব প্রেমামৃত রসে, পবিত্র জ্যোতি পরশে
হৃদয় উদ্যানে প্রেম ফুল বিকশিত হয়। (১৬০ সংখ্যা।)

পরমেশ্বর তখন এত মিষ্ট হইয়াছেন যে সাধক ভাবে বিভোর হইয়া বলিতেছেন :— "তোমায় ভাল লাগে এত কি কারণে?
না দেখি না শুনি শ্রবণে।
আছে স্বজন পরিজন, নানাবিধ ধন,
তুলনা না হও কারো সনে ;
নাহি রূপ গন্ধ রস, কিসে কল্লে বশ,
ভুল্‌তে নারি আপনি পড় মনে।" (১৬১ সংখ্যা।)

আবার গাহিলেন :—

"ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে।
তত্ত্ব তার না পাই বেদ পুরাণে।
তুমি জনক কি জননী, ভাই কি ভগিনী,
হৃদয়বন্ধু কিংবা পুত্র কন্যে ;
তোমার এ নহে সম্ভব (হে) একি অসম্ভব,
সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবিনে।"

মানুষের সঙ্গে যেমন, পরমেশ্বরের সঙ্গেও সেইরূপ যত আলাপ পরিচয় হয়, তত বিশ্বাস বাড়িয়া যায়। পাপের যাতনা উপশমে বারম্বার ভগবানের সাক্ষাৎ করুণা ব্রাহ্ম যত উপলব্ধি করিতে লাগিলেন তত ভগবানে তাঁহার বিশ্বাস হইতে লাগিল। এই বিশ্বাস পক্ক হইলেই মানুষ আত্ম-সমর্পণ করে। ব্রাহ্মও ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম গাহিলেন :—

"আমার আর কেহ নাই, তোমারে হৃদয়ে রাখি এ প্রাণ জুড়াই।
তোমা বিনে সব শূন্য, এ সংসার অরণ্য,
কে আছে আর তোমা ভিন্ন কার পানে চাই।" (৯৫ পৃঃ।)

আবার গাহিলেন :—

"ওহে তোমার হাতে করি আত্ম সমর্পণ, রাখ আর মার যা ইচ্ছা এখন ; আমি কার কাছে যাব, কোথা আর কাঁদিব, শূন্য দেখি ত্রিভুবন ; দাও হে দণ্ড তোমার বিচারে যা হয়, খণ্ড খণ্ড কর এ পাপ হৃদয়, তোমার হাতে মলে এ মহা পাতকী নবজীবন পাবে।" (১০৭ পৃঃ)

পরমেশ্বরের কৃপা সম্ভোগে সাহস বাড়িয়াছে, বিশ্বাস ঘন ও সম্বন্ধ ঘনিষ্ট হইয়াছে, তাই যাঁহারা পুর্ব্বে ভয়ে ভয়ে বলিয়াছিলেন,—

"মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায় ?"

তাঁহারাই এখন প্রেমে বিভোর হইয়া গাহিলেন :—

"তোমারি নাথ, তোমারি চিরদিন, আমি হে।
সুখে দুঃখে পাপে আমি তোমারি নাথ তোমারি হে॥"

পরমেশ্বরের সঙ্গে সাধকের সম্বন্ধ যত ঘনীভূত হইতে থাকে, সাধক যতই ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মচিন্তা করিতে থাকেন, এবং এই ধ্যান ও চিন্তাতে, এই উপাসনাতে, যত তাঁহার চিত্তে বিবিধ ভাবলহরীর সঞ্চার ও আনন্দ রস অনুভূত হয়, ততই নিরাকার সত্তামাত্র জ্ঞেয় ব্রহ্ম, তত্বতঃ এই ভাবাকাশে ভাবাঙ্গ ধারণ করিয়া আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। শুষ্ক জ্ঞান বা তর্কযুক্তিসিদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা ব্রহ্মের রূপ অনুভব করা যায় না। তাই রামমোহন রায় কি আদি সমাজের সঙ্গীতে ব্রহ্মরূপের কথা অতি অল্প। ভাবের স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মরূপ প্রকাশ পায়। দর্পণে পতিত সূর্য্যরশ্মি যেমন প্রতিবিম্বিত হইয়া গৃহাভ্যন্তরে ক্রীড়া করে, সাধকের আত্ম-ভাবরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মজ্যোতি তেমনি তাঁহার হৃদয়াকাশে ক্রীড়া করিয়া থাকে। সেইরূপ ক্রমে সাধকের আত্মভাব, আত্মস্ফূর্ত্তি, আত্মানন্দ ও আত্মসম্ভোগ হইতে, এই সকলের মধ্যে ব্রহ্মের অপরূপ রূপমাধুরী ও লীলারস উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ইহা কবিত্ব নহে, যদিও প্রথম অবস্থায় কবিত্বের মত দৃষ্টও অনুভূত হয়। ইহা কল্পনা নহে, যদিও অঙ্কুরে কল্পনারই মত মনে হয়। ইহা সাধকের ব্যক্তিগত মানসিক ক্রিয়ার সম্প্রসারণও নহে, যদিও প্রথম প্রথম এইরূপ ভুলই নিজের ও অপরের সম্বন্ধে হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতের মধ্যে প্রথমে এই অপরূপ ব্রহ্মরূপের প্রথম স্ফূর্ত্তি আরম্ভ হইয়াছে। রামমোহন রায়ের শুদ্ধ সত্তামাত্র জ্ঞেয় ব্রহ্ম,—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—আদি সমাজের আনন্দরূপমমৃতং ব্রহ্ম ; ভারতবর্ষীয় সমাজে সত্যং শিবং সুন্দরম্ হইয়াছেন।

তাই সাধক গাহিতেছেন :—

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদি মন্দিরে ;
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে।
জ্ঞান অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে ;
অবাক্ হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।
আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয় আকাশে ;
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে ;
আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে।
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজরাজ চরণে ;
বিকাইব ওহে প্রাণসখা, সফল করিব জীবনে ;

এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গভোগ জীবনে,
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পালাইয়ে সত্বর ;
তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ আঁধার।

সাধকের ভাবাঙ্গ অবলম্বনে রামমোহন রায়ের শুদ্ধ সত্তামাত্র জ্ঞেয়ব্রহ্ম, আদি সমাজের জ্ঞানময় জ্যোতি, এখানে, ভারতবর্ষীয় সমাজে, ভাবদেহ ধারণ করিতেছেন—তাই উপাসনা কালে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ব্রাহ্ম গাহিলেন :—

"আহা কি সুন্দর মনোহর সেই মুরতি।
যোগী হৃদয়রঞ্জন, আনন্দরূপমমৃতম্,
সুধাময় শান্তিপ্রদ বিমল বিভাতি।

প্রাণস্য প্রাণং পুরুষ মহান্. তেজোময় শুভ্র মঙ্গল নিধান ; বচন অতীত, তুলনা রহিত, প্রীতি-বিস্ফারিত উদার প্রকৃতি।

প্রিয় দরশন, প্রসন্ন বদন, প্রেমানুরঞ্জিত কৃপানয়ন ; কলুষবিনাশন, সন্তাপহরণ, নিরাশ আঁধারে আশার জ্যোতি।"

ব্রহ্মের মনোহর মুরতি প্রথমতঃ ব্রাহ্মের নিকটে মাতৃরূপিণী হইয়া প্রকাশ পাইল। ভারতবর্ষীয় সমাজের সঙ্গীতে এই মাতৃপূজার প্রথম বিশেষ সূচনা। আদি সমাজের সঙ্গীতে দু এক স্থানে, নিতান্ত উপমার মত, ঈশ্বরকে জননী বলা হইয়াছিল ; ভারতবর্ষীয় সমাজে তাঁহাকে "জননী সমান" না বলিয়া, একেবারে স্পষ্টভাবে "জননী বলা হইল।

"জননীর কোলে বসি কেন রে অবোধ মন।
করিছ রোদন সদা মাতৃহীন শিশু প্রায়।
দেখ রে মন আপনি, নিকটে তব জননী,
মা বলে ডাকিয়ে তাঁরে শীতল কর হৃদয়।" (১৬ সং।)

আবার ব্রাহ্ম কাতর প্রাণে সংসার ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া ডাকিতেছেন :—

"ওগো জননী রাখ লুকাইয়ে তব নিরাপদ কোলে।" (৩৩৯ পৃ।)

এইরূপে পূর্ব্বকার শুদ্ধসত্তামাত্র জ্ঞেয় নিরাকার ব্রহ্ম, ভারতবর্ষীয় সমাজের সঙ্গীতে ভাবাঙ্গ ধারণ করিয়া ক্রমে সাকার হইয়া উঠিতেছেন।

ব্রহ্মের এই ভাবাঙ্গ ধারণ প্রথমতঃ নানা প্রকারের জাগতিক সম্বন্ধের মধ্য দিয়া, সেই সকল সম্বন্ধের আকারেই হইয়া থাকে। এখানেও প্রথমতঃ ব্রহ্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মসত্তা পিতৃভাবে, মাতৃভাবে, বা পরিত্রাতা ভাবে, বিপদভঞ্জন ভাবে, সুখদাতা ভাবে,—অর্থাৎ বিবিধ সম্বন্ধের ভাব ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে তাহা সাংসারিক সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া, সাধক ও সাধুদিগকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। ভারতবর্ষীয় সমাজের সঙ্গীতে এই শেষোক্ত অবস্থার সূচনা মাত্র দৃষ্ট হয়। আদি সমাজে সাধুগুণ কীর্ত্তন, সাধুর নাম, একটী মাত্র সঙ্গীতে পাওয়া যায়। সেটী— তৃতীয় ভাগের ২৬ সঙ্গীত।

"ধন্য সেই সাধু, সেই জ্ঞানী যে শুদ্ধ বুদ্ধ সত্যে ধ্যানে নিমগ্ন।
কত তাঁর আনন্দ তাঁরে পাইয়ে অন্তরে।"

কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমাজের সঙ্গীতে সাধুগুণ কীর্ত্তন বিশেষভাবে আরম্ভ হইয়াছে।

"সাধুসঙ্গ বিনা এ সংসারে শান্তি কোথায়।
দেখ চারিদিক কোলাহলময়, বিষয় মদে মত্ত জীব সমুদয়।
শ্রান্ত পথিকের তরে, দুস্তর ভব প্রান্তরে,
সাধুর জীবন জলাশয়;
তাহে করিলে অবগাহন, শান্ত হয় প্রাণ মন,
হয় তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়;
যায় পাপ ভয় ইত্যাদি (৩৭৩ সং।)

পরমেশ্বরকে দেখিতে হইলে ভক্তমণ্ডলীতেই দেখিতে হয়, তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ভক্ত মাঝে, এভাবও ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। যথা—

সাধ মনে গিয়ে প্রেমধামে, হেরিব নয়নে।
পরম সুন্দর প্রেমময় নিরঞ্জনে।
সেই অরূপ রূপ মাধুরি, নিরখিব প্রাণভরি হে,
ভকত মণ্ডলীর মাঝারে, (পিতার পরিবারে হে) (কিবা শোভা মরি হে)
রাখ শ্রীপদে বেঁধে সবে প্রেম ডোরে। (১৩২ পৃ।)

নাম সাধন এবং সংকীর্ত্তনও ভারতবর্ষীয় সমাজের সঙ্গীতেই সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্ট হয়; নাম সাধন ভাবাঙ্গ গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায়। সুতরাং ভাবাঙ্গ যেই গঠিত হইতে আরম্ভ করিল অমনি ব্রাহ্ম নাম সাধনে নিযুক্ত হইলেন, ইহা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু এই নাম সাধন ও সংকীর্ত্তনে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্বের কিরূপ পরিবর্ত্তন ও বিকাশ হইয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবে নববিধান সঙ্গীতের সমালোচনায় দৃষ্ট হয়। অদ্য তাই ভারতবর্ষীয় সমাজের সংকীর্ত্তনও নামসাধনের সবিশেষ আলোচনা করিব না।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে প্রথমতঃ একটা দ্বৈতভাব বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। রামমোহন রায়ের সময়ে আত্মার একত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। আদি সমাজের সঙ্গীতে সেই একত্বের ভিতরে যেন একটু ভেদ আরম্ভ লইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে, ব্রাহ্মগণের পাপবোধ দীনতা প্রভৃতিতে এই ভেদ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হইয়া, ক্রমে উচ্চতর ভূমিতে পুনর্ম্মিলনের চেষ্টার সূচনা হইয়াছে। নববিধান সঙ্গীতে এই পুনর্ম্মিলন প্রক্রিয়া বিশেষভাবে পরিপক্কতা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তাহার সম্যক্ সমালোচনা সময়ান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

ওঁ হরিঃ ওঁ।
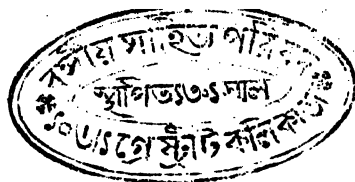
ব্রহ্মতত্ত্ব।

ব্রহ্মসঙ্গীতে ব্রহ্মতত্ত্ব—নববিধান সঙ্গীত।

ব্রহ্মসঙ্গীতে ব্রহ্মতত্ত্ব বিকাশের উচ্চতম অবস্থা নববিধান সঙ্গীতেই প্রকাশিত। নববিধান সমাজের প্রকাশিত সঙ্গীত পুস্তকের দ্বিতীয় হইতে দশম ভাগ পর্য্যন্ত আমি এই প্রবন্ধে নববিধানের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লইলাম। দ্বিতীয় ভাগ সঙ্গীত পুস্তক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মের দুই বৎসর পরে ৫১ ব্রাহ্ম অব্দে, ১৮০২ শকে মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়; কেন না, এই ভাগে পঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিকের নগরকীর্ত্তন পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। এক অর্থে, ইহার অধিকাংশ সঙ্গীতই ভারতবর্ষীয় সমাজের সন্দেহ নাই। কিন্তু নববিধানের আয়োজন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই হইতেছিল। এই জন্য পূর্ব্ব প্রবন্ধাংশে আমি ১৭৯৭ হইতে ১৮০২ শক পর্য্যন্ত নববিধানের গর্ভবাসকালরূপে বর্ণনা করিয়াছিলাম। এই কালের সঙ্গীত এই কারণে নববিধান সঙ্গীতের অঙ্গরূপে গৃহীত হওয়া অন্যায় নহে।

ব্রাহ্মসমাজে, ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্য দিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব যতটা বিকশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নববিধান সঙ্গীতে তাহার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ দৃষ্ট হয়, এই কথা বলাতে আমি নববিধান সঙ্গীতের সকল সঙ্গীতই অতি উৎকৃষ্ট ও উচ্চ ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রকাশক, এরূপ বলিতেছি বলিয়া যেন কেহ ভ্রম না করেন। এই সকল সঙ্গীতের গুণ যেমন বেশী, দোষও তেমনি অনেক। অগ্রে তাহার দোষেরই বিচার করিয়া, বর্ত্তমান প্রবন্ধের সমালোচকগণের শ্রেণী বিশেষের বিরুদ্ধ সমালোচনার সুযোগ হ্রাস করা মন্দ নহে।

নববিধান সঙ্গীতের প্রথম দোষ ভাবুকতার উদ্দাম আস্ফালন। রামমোহন

রাঙ্গের সময়ের ব্রহ্মসঙ্গীতে ভাবস্ফূর্ত্তি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আদি সমাজের সঙ্গীতে ভাব আছে বটে, কিন্তু তাহা অযথা ভাবে সংযত ও অবরুদ্ধ; নববিধান সঙ্গীতে তাহার বিপরীত, অবৈধরূপে ভাব এ সঙ্গীতে উদ্দামমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই জন্য এমন কি কোন কোন স্থলে এই সকল সঙ্গীত গ্রাম্যভাবে দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটী সঙ্গীতে আছে :—

ধর্ম্মের ঘরে চুরি করে লুকান কি যায়। (ও মন)
সেথা আছে যে সকল, দেবদূত দল, দেখ্‌লে চিন্‌তে পারে
চেহারায়। (লোক)
কেরে ঠাকুর ঘরে, বলে উচ্চৈঃস্বরে, যখন তারা ডাকিয়ে সুধায়?
তখন বলে চোর সবে, ভয়ভগ্ন রবে, আমরা কলা খাইনি গো মশায়।
গোলমালে হরি বলে, স্বর্গধামে প্রবেশিলে, পড়বি রে বিষম সমস্যায়;
শোন্ পাটোয়ারী, কুবুদ্ধি চাতুরী, চলিবে না কখনো হেথায়;
ওরে বড়ই চতুর, মোদের ঠাকুর, করেন ফতুর যে তাহারে চায়।
ওরে মনচোর, লজ্জা নাই তোর, সাধুবেশে চুরি পুনরায়;
দীন প্রেমদাসে ভণে, কাতর বচনে, ঠেকে শিখলি নারে হায় হায়।

আর একটী সঙ্গীত ইহা অপেক্ষাও যেন আরো বেশী গ্রাম্যভাব ও ভাষাতে পরিপূর্ণ। যথা :—

হরিনামের সুরাপান করিয়া এবার আমি মাতাল হব।
পিপে ধরে মার্ব্বো যে টান, আর পান করে আশা মিটাব। (নামের সুরা)
গরল উঠে বিষয় মদে, কাজ কি আমার সে সকল মদে, পান করে সেই
আসল মদে, লজ্জাভয় তেয়াগিব।
শুঁড়িবাড়ী কর্ব্বো বাসা, পূরাইব সকল আশা, নিবারি দারুণ পিপাসা চাষা
নাম ঘুচাইব। (১১.২)। ৬০৮, ৬১৮ ও ৬২০ ও দ্রষ্টব্য।

স্থলবিশেষে গ্রাম্যভাব ও ভাষাতে ভাবের সারল্য বা গভীরতা প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু এই যে দুটী সঙ্গীত এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম ইহাতে তাহার কিছুই নাই, অথচ অযথা ভাবে গ্রাম্য ভাবের ছড়াছড়ি। ইহা উদ্দাম ভাবুকতার ফল।

একদিকে যেমন এই ভাবের উদ্দাম আস্ফালন নিবন্ধন নববিধান সঙ্গীত

স্থানে স্থানে গ্রাম্যভাব-দুষ্ট হইয়াছে, সেই রূপ অন্য দিকে আবার স্থানে স্থানে প্রচলিত ধর্ম্মের দেবদেবীর নামে বলপূর্ব্বক একটা ব্রাহ্ম অর্থ আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্রহ্মসঙ্গীতের বিশেষত্ব ও বিশুদ্ধতা বিনষ্ট করিবার পথ করিয়া দিয়াছে। দেবদেবী রূপে যে ভাব বা যে নাম দেশ মধ্যে গৃহীত বা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাই যে ব্রাহ্মগণের বর্জ্জন করা আবশ্যক বা বিধেয়, এরূপ কথনই মনে করি না। তাহা সম্ভবপর বলিয়াও বোধ হয় না। কারণ শিব, ঈশ্বর, বিশ্বজননী, আনন্দময়ী, প্রভৃতি অনেক শব্দই প্রচলিত ধর্ম্মের দেবদেবীগণে আরোপিত হইয়া থাকে। কিন্তু সকল বিষয়েই একটা সীমা আছে। এক দিকে যেমন দেবদেবীতে প্রযুক্ত হয় বলিয়া হরি, শিব, প্রভৃতি শব্দ ব্রহ্মপূজার পদ্ধতি হইতে বর্জ্জন করিবার জন্য আন্দোলন অযৌক্তিক, সেইরূপ মৌলিক অর্থ গ্রহণ করিয়া, বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া কালী, করালী, দুর্গা, প্রভৃতি নামও ব্রহ্মে প্রয়োগ করিবার আকাঙ্ক্ষা উদ্ভট। কিন্তু স্থলে স্থলে নববিধান সঙ্গীতে এই উদ্ভট আকাঙ্ক্ষার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। যেমন ৫৭২ সংখ্যক সঙ্গীতে, ঈশ্বরকে—মহাবিদ্যা, মা শঙ্করী, ভবরাণী, ভৈরবী, সুরাসুরবিমর্দ্দিনী, ভগবতী, অম্বিকে, অম্বে, মহাসতী, শিবে, সর্ব্বার্থসাধিনী, ইত্যাদি নাম প্রদান করা হইয়াছে। (৮১২ ও ৮১৫ দ্রষ্টব্য) ব্যাকরণ-গত অর্থ করিলে যে এ সকল শব্দ সঙ্গতরূপে ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইতে পারে না, তাহা নহে, কিন্তু কেবল বৈয়াকরণিক ধাত্বর্থেই ভাষায় শব্দ প্রয়োগ হয় না। ব্রহ্মকে শঙ্করী, মহাবিদ্যা, ভৈরবী, এমন কি কালী, করালী বলাতেও ব্যক্তিগত ভাবে, কাহারও কোনও আপত্তি নাও থাকিতে পারে। এই জন্য শাক্ত উপাসকের ভক্তি-কম্পিত কণ্ঠে শ্যামা-বিষয়ক গান ভক্ত শুনিয়া ব্রাহ্মও আপনি ভক্তিরসে আপ্লুত হইতে পারেন। সে এক কথা। আর জোর করিয়া, টেনে বুনে, এই সকল শব্দ ব্রহ্মসঙ্গীতের দেহ বদ্ধ করা অন্য কথা। ইহাতে ব্রাহ্ম ও শাক্ত উভয়েরই প্রতি অবিচার করা হয়। নববিধান সঙ্গীতের স্থলে স্থলে এই দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত নববিধান সঙ্গীতের অনেক স্থানে অজীর্ণ বৈষ্ণব ভাব ও বৈষ্ণব তত্ত্বের উদ্গিরণের বিকট গন্ধেও মনে বিশেষ বিতৃষ্ণার সঞ্চার হইয়া থাকে। যথা—একটী সঙ্গীতে প্রথমে মধুর ভাবের অবতারণা করা হইয়াছে।

হৃদি বৃন্দাবনে হরি হে, তুমি কত লীলা দেখাইলে।

(ভাব যে ধর্‌তে নারি) তোমার একার রূপে পরাণ আকুল,

আবার তার সঙ্গে ভক্তকুল। যুগল মূরতি পুরুষ প্রকৃতি,

তুমি একাধারে মিলাইলে। (পিতা মাতা হয়ে)

পিতা মাতা রূপে যুগল মূরতি. পুরুষে প্রকৃতির মিলন, সন্তানের ভোগ্য ও বর্ণনীয় বিষয়ই বটে! কিন্তু রসভঙ্গভয়ে নববিধান সঙ্গীতের বিকট রসোদ্গার ভঙ্গ হয় না। তাই বৃন্দাবনের যুগল লীলার পরেই গায়ক গাহিতেছেন :—

তুমি পিতা হয়ে ন্যায় দণ্ড দিলে,

আবার মাতা হয়ে কোলে নিলে।

আবার মাতৃপ্রেমে বেহাল হইয়াই কি হঠাৎ মানভঞ্জনের পালার সুর ভাঁজিয়া গাহিতেছেন :—

দেহি পদপল্লবং, যোগিজন দুর্লভং, হে প্রাণং বল্লভ শরণ্য।

ত্বং হি মম জীবনং, ত্বং হি মম ভূষণং, ত্বং হি মম ভরসা কেবলম্।

(৫২১ সং, ৩২৩ পৃঃ।)

আধ্যাত্মিক অজীর্ণ রোগের এতদপেক্ষা অধিকতর দৃষ্টান্ত অল্পই পাওয়া যাইবে।

আর একটী সঙ্গীতে আছে :—

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।

মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি।

বিবিধ বিলাস রস প্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাব তরঙ্গ,

ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ, নবীন নবীন রূপ ধরি।

(হরি হরি হরি বলে)

মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল,

দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল,

(আশা পূরিল রে, আমার সকল সাধ মিটে গেল)

এখন আনন্দে মাতিয়া, দুবাহু তুলিয়া, বলরে মন হরি হরি।

এইটুকু পর্য্যন্ত একরূপ গায়কের মনের ভাব যেন বুঝা গেল। সচ্চিদানন্দ সাগরে প্রেমানন্দ লহরীর নৃত্য দেখিয়া, সেই তরঙ্গ রঙ্গে বিশ্বভুবনকে একাকার

ও ভেদাভেদ-বিহীন দেখিয়া তাঁহার প্রাণের সাধ পূর্ণ হইল ও তিনি আনন্দে নাচিতে নাচিতে, হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন, এতটা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু ইহার পরেই, সঙ্গীতের উত্তরার্দ্ধে, অজীর্ণ ভাবের উৎকট ঢক্কারে সমুদায় তাল মান ভাঙ্গিয়া একাকার করিয়া দিয়াছে। অথবা আপন মনকে হরি হরি বলাইতে বলাইতে ভাবুক মহাশয়ের মনে রাই কিশোরীর কথাই বুঝি বা জাগিয়া উঠিল,—তাই গাহিতেছেন :—

টুটল ভরম ভীতি, ধরম করম নীতি, দূরে গেল জাতিকুল মান ;
কাঁহা হাম কাঁহা হরি, প্রাণ মন চুরি করি, বঁধুয়া করিলা পয়ান।
(আমি কেনই বা এলাম রে,—প্রেম সিন্ধু তটে।)

প্রেমসিন্ধুর তরঙ্গাভিঘাতে ভরম ভীতি, করম নীতি, জাতিকুলমান ভাঙ্গিতেও বা পারে। কিন্তু সেই তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বঁধুয়া প্রাণত্যাগ করেন, বোধ হয় একথা এই প্রথম শোনা গেল। কিন্তু প্রাণ বঁধুয়ার অন্তর্ধানেও প্রেমিকের ভাবের বেগ একটুকুও কমে নাই, বরং বাড়িয়াই উঠিয়াছে—তাই তিনি গাহিতেছেন :—

"ভাবেতে হওল ভোর, অবহি হৃদয় মোর, নাহি যাত আপনা পসানা।
প্রেমদাস কহে হাসি, শুন সাধু জগবাসী, এয়সাহি নূতন বিধান॥"

প্রেমসিন্ধুনীরে প্রাণ বঁধুয়ার অন্তর্ধান, তাহাতে প্রেমদাসের ভাবে বিভোর হইয়া আপনাকে চিনিতে না পারা ও সর্ব্বশেষে তাই দেখিয়া হাসিয়া আটখানা হওয়া, বিধানটা যে নিতান্ত নূতন তার কি আর ভুল আছে? তবে ইহাতে পুরাতন পাপীদের মনে রঙ্গালয়ের সাজঘরের পুরাতন বিধানটাও বা মনে পড়িতে পারে।

ফলতঃ ভাবের অরাজকতা ও ভাষার ব্যভিচার স্থানে স্থানে নববিধান সঙ্গীতে এত বেশী যে তাহার সকল গুলির যথাযথ সমালোচনা করিলে প্রবন্ধ বাড়িয়া যাইবে। আর একটী মাত্র উদাহরণ দিয়াই শেষ করিব। ৫৫৮ সংখ্যক সঙ্গীতে আছে :—

নব রসের রসিক, চতুর প্রেমিক, তুমি হে গোঁসাই।
তোমার মতন মজার লোক আর দেখিতে না পাই॥ (ওহে ঠাকুর!)

এই দুই চরণ শুনিয়া আপনারা হয়ত ভাবিতেছেন, এ সঙ্গীতে মধুর বা সখ্য

রসের অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু নববিধান সাধারণ লোকের ভাবের বিধান মানিতে রাজি নহেন। তাই নব রসের রসিক, চতুর প্রেমিক বলিয়া আরম্ভ করিয়া শেষে বলিতেছেন :—

"এত রঙ্গ তুমি জান, দেখে হলাম হতজ্ঞান,
ছেলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিছ সদাই ;—

পিতৃসম্বন্ধে নব রসের রসিক, চতুর প্রেমিক প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ নিতান্ত বেল্লো বালকেরই কার্য্য। কিন্তু কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান থাকিলে বিধানটা এতটা নূতন হইয়া উঠিতে পারিত কিনা সন্দেহের কথা।

নববিধান সঙ্গীতের গুণ অনেক আছে বলিয়াই তাহার দোষের এমন তীব্র কঠোর সমালোচনা করিলাম। যে সকল সঙ্গীতে ভাষার ব্যভিচার, ভাবের অরাজকতা, রসের বিকটতা, প্রভৃতি বিশেষ প্রকাশিত সে গুলিকে ভবিষ্য সংস্করণে বর্জ্জন করিলে নববিধান সঙ্গীত ব্রহ্ম সঙ্গীত মধ্যে শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিবে। আর নববিধান সঙ্গীতের গুণ বেশী বলিয়াই দোষ ভাগও চক্ষে বড় লাগে। ফলতঃ এই সকল দোষ অত্যন্ত অপ্রীতিকর ও স্থানে স্থানে তাহা দ্বারা ধর্ম্ম জীবনের অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা থাকিলেও, তাহা তাহার গুণ ভাগ মধ্যে

নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।

রামমোহন রায়ের সময়ের সঙ্গীতের সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতের যে সম্বন্ধ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতের সঙ্গেও নববিধান সঙ্গীতের সেইরূপ সম্বন্ধ। রামমোহন রায়ের সময়ের শুদ্ধ সত্তা মাত্র জ্ঞেয় ব্রহ্ম, আদি সমাজে, সাধকের ভাবাঙ্গ অবলম্বনে জ্ঞানময় জ্যোতিঃ, আনন্দময় অব্যক্ত পুরুষ হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় সমাজে সেই অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ দেবতাই, সাধকের ভাব অবলম্বনে, আপনিও ভাব দেহ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। ব্রহ্মের এই ভাবাঙ্গ ধারণ প্রথমতঃ নানা প্রকারের জাগতিক সম্বন্ধের মধ্য দিয়া, সেই সকল সম্বন্ধের আকারেই হয়। ভারতবর্ষীয় সমাজেই তাহার সূচনা হইয়াছিল। নববিধান সঙ্গীতে, ব্রহ্মসত্তার এই ভাবাঙ্গ ধারণ আরো পরিস্ফুট হইয়াছে। আদি ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরকে "জননী সমান" বলিয়াছিলেন।

"জননী সমান করেন পালন ইত্যাদি।"

ভারতবর্ষীয় সমাজ তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভাবেই জননী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার কোলে আপনাকে দেখিয়াছিলেন :—

"জননীর কোলে বসি ইত্যাদি।"

আদি ব্রাহ্ম সমাজে যাহা উপমামাত্র ছিল, ভারতবর্ষীয় সমাজে তাহা সাক্ষাৎ ভাবে, ভাব রূপ ধারণ করিল। নববিধানে এই ভাব ঘনীভূত হইয়া মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। নববিধানে যেন পরমেশ্বর মূর্ত্তিমতী জননীরূপে সাধকের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাই মায়ের প্রেমের গুণকীর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্ম গাহিতেছেন :—

"কত ভালবাস গো মা মানব সন্তানে, মনে হ'লে প্রেমধারা বহে দুনয়নে।
তব পদে অপরাধী, আছি আমি জন্মাবধি, তবু চেয়ে মুখপানে প্রেমনয়নে,
ডাকিছ মধুর বচনে।
বার বার প্রেমভরে ডাকিছ গো মা; প্রেমবাহু প্রসারিয়ে ডাকিছ গো মা।
স্নেহে বিগলিত হয়ে, আয় আয় আয় বলে, হাসি হাসি মুখে, আনন্দ ভরে।
ডাকিছ গো মা।"

ক্রমে মায়ের রূপ আরো যেন ঘনীভূত হইল, তখন ব্রাহ্ম গাহিলেন :—

"মা জগতজননী, বিশ্বজনবন্দিনী, বিচিত্ররূপ-ধারিণী চৈতন্যরূপিণী।
রূপের ছটায় বিজলি চমকে, ক'রে ঝলমল জ্বলে চারিদিকে,
কোটিসূর্য্য প্রভা, অনুপম শোভা, প্রতাপে কম্পিত ধরণী।"

আপনার ভাবাঙ্গে মাতৃ অঙ্গ বারম্বার দর্শন করিয়া সাধক মায়ের রূপে গুণে বাঁধা পড়িয়াছেন। তাই গাহিতেছেন :—

মা গো চিনেছি তোমায়।
পারিবে না, পারিবে না ছাড়িতে আমায়॥
মারিলেও কাঁদিব না, কারো কাছে বলিব না,
হাসিব ধমক দিলে পড়ে রাঙ্গা পায়।
মধুর প্রকৃতি তব, অনন্ত সুধার্ণব, নব নব বেশে প্রাণ মন ভুলায়।

আবার গাহিতেছেন :—

মার গো মার গো আমায় ওমা সন্তান বৎসলে। (১০৮৬)

আর এক সময়ে বলিতেছেন :—

"অপরূপ নববেশে, হেসে হেসে কাছে এসে

ভালবেসে প্রেমাবেশে দিলে মোরে আলিঙ্গন।

ওগো মহামায়া সতী, বহুরূপা ভগবতী,

সুন্দর মূরতি হেন দেখিনি কখন,

করিলে মোহিত চিত. মহাভাবে বিগলিত,

প্রভাবে হৃদয় কাঁপে চমকে নয়ন।"

আবার মায়ের লীলা দেখিয়া গাহিলেন :—

মা কি তুই কুমারের মেয়ে—(১১২৬ সং)

কিন্তু মায়ের মাতৃত্ব, মায়ের মাধুর্য্য, মায়ের সকলই সন্তানগত। সন্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মা অদৃশ্য হইয়া যান। মায়ের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সন্তান-সঙ্গে, তাই ব্রাহ্ম মায়ের এই শ্রেষ্ঠতম, এই ঘনতম, এই উজ্জ্বলতম প্রকাশ দেখিয়া গাহিয়াছেন :—

কিরূপ দেখালি জননী, ভুবনমোহিনী

ভক্ত কোলে ভগবতী, ভক্তচিত্ত-হারিণী।

দক্ষিণে পবিত্র যিশু, পুণ্যরবি দেব শিশু,

বামে শোভে প্রেমচন্দ্র গৌরগুণমণি।

ইচ্ছা হয় প্রাণ ভরে, এইরূপে দেখি মা তোরে,

পাদপদ্ম বুকে ধরে, মত্ত হয়ে প্রেমের ঘোরে,

থাকি দিন রজনী।

ভক্তের সঙ্গে যে ভগবানের অচ্ছেদ্য নিরবচ্ছিন্ন যোগ এ ভাব নববিধান সঙ্গীতেই ব্রহ্মসঙ্গীতাবলী মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে পরিস্ফুট হইয়াছে। বস্তুতঃ নববিধান সঙ্গীতের একটা অতি প্রধান ভাবই—

"যেখানে ভকতবৃন্দ সেইখানে ভগবান"

দ্বাচত্বারিংশতম সাংবৎসরিক নগরকীর্ত্তনে এই ভাবের প্রথম বিশেষ প্রকাশ দৃষ্ট হয়;—এই কীর্ত্তনের শেষ কলি ছিল :—

সাধমনে গিয়ে প্রেমধামে,

হেরিব নয়নে পরম সুন্দর প্রেমময় নিরঞ্জনে;

ও সেই অরূপ রূপমাধুরী, নিরখিব প্রাণ ভরি রে,
ভকতমণ্ডলীর মাঝারে।

এবার দেখাও নাথ সে আনন্দধাম,
রাখ শ্রীপদে বেঁধে সবে প্রেমডোরে। (২৪২)

এই সময় হইতেই এইভাব ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মের পরেই,—নববিধান ঘোষণার পর হইতে—ইহার বিশেষ স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগ সঙ্গীতে, অর্থাৎ যে কালকে আমি নববিধানের গর্ভবাসকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তখনকার একটী সঙ্গীতে, ভক্তসঙ্গে ভগবানের লীলার বিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়, সে সঙ্গীতটী এই :—

পরম সুন্দর, চিন্ময় হরিরূপ নয়নরঞ্জন।
নিত্য নিরাকার নিরঞ্জন। (রূপ দেখে, ভুলিল হৃদয় মন)

* * *

প্রিয় ভক্তগণে লয়ে সঙ্গে, হরি থাকেন লীলা রসরঙ্গে।
হয়ে ঘটে ঘটে বহু অবতার, করেন বিচিত্র লীলা-বিহার। (৩৯২)

উত্তরোত্তর সঙ্গীতে এই ভাব ক্রমে ঘনীভূত ও বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে :—

(১) ঐ দেখ প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা।
হরিভক্ত সঙ্গে, রসরঙ্গে, করিছেন কত খেলা। (৪০৩)

(২) মা ভকত হৃদয় বিহারিণী।
সুপুত্র সাধুগণে, লয়ে নিজ নিকেতনে, সদানন্দে আছ দিনযামিনী;
দিয়ে সবে আলিঙ্গন, করিছ শির চুম্বন, কোলে বসাইয়ে শুনাইছ সুমধুরবাণী। (৫১৩)

(৩) আমার মাকে কি দেখেছিস্ তোরা বল্ সত্য কোরে
যাঁর নবনবরূপে নানারূপে মন হরে।
রূপে করে জগৎ আলো, মায়ের কোলে শোভে ভক্তদল,
গদগদ কোমলাঙ্গ আনন্দ ভরে। (৫২৮)

অন্যত্র :—

দেখ দেখ মায়ের প্রসন্ন বদন, ভুবনমোহন চিত্তবিনোদন,
পদতলে দলে দলে সাধুগণ, নাচে গায় প্রেমে হইয়ে মগন।

আর একটী সঙ্গীতে আছে :—

ভকত মোহন ভক্ত বিনোদন ভকতচিত্ত রঞ্জন।
ভক্ত ভয়হারী, ভকতবিহারী, ভকত বিপদ ভঞ্জন।
ভক্তজন সঙ্গে, নবরসরঙ্গে, প্রেমতরঙ্গে হয়ে মগন ;
নববেশে সাজি, দয়া করি আজি, দেও দেও দরশন।
তুমি ভক্তজন হৃদয়বল্লভ, ভক্তাশ্রয় তব চরণ পল্লব,
ভকত রক্ষক, ভকত পালক, ভক্ত রিপুগণ গঞ্জন ;
ভক্ত সঙ্গে করি, এস দয়াল হরি, দীনহীন জনে করুণাবিতরি
হৃদয়ে উদয়, হও দয়াময়, পূরাও দাসের এই আকিঞ্চন। (৬৮১)

ভগবানের সঙ্গে ভক্তকে দেখিলে, যেমন ভগবানের সঙ্গে, তেমনি ভক্তেরও সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রাণে সহজেই জাগিয়া উঠে। তাই নববিধানের সাধক প্রার্থনা করিতেছেন :—

দে মা মিলাইয়া ভক্ত সনে। আর ভিন্নভাব রেখ না জীবনে।
ভক্তের পবিত্র রক্ত দিয়ে আমায় কর ভক্ত, ভক্ত সঙ্গে মিশে
এক সনে, আমি ধন্য হই ও পদ সেবনে। (৭০৫)

ভক্তের প্রসাদ ভিন্ন ভক্তি লাভ হয় না, ইহা ভক্তিপথের পথিকের চিরদিনের অভিজ্ঞতা। তাই নববিধানের ভক্তি সাধকও পদে পদে, ভক্তিপথে চলিতে চলিতে ভক্তের প্রসাদ ভিক্ষা করিতেছেন :—

(১) প্রেমদাসের বড় সাধ মনে, হরি বলে ভিক্ষা করে ভক্তের দোকানে ;
সাধু মহাজনের পাতের খেয়ে ঘুচাই জঠর জ্বালা। (৪০৩)

আর একটী সঙ্গীতে সাধক বলিতেছেন :—

"ডেকে লও দয়া করে আমারে, ভিতরে।
কতদিন আর পরের মত থাকৃব বাহিরে।
দীনহীন কাঙ্গালের বেশে, বসে থাকিব একপাশে,

ভক্তবৃন্দের মাঝে তোমায় দেখ্‌ব প্রাণ ভরে।
তব প্রেমনিকেতনে, দেখব যত সাধুগণে,
কর'ব প্রেমভিক্ষা তাঁদের চরণে ধরে।

সাধন সম্পত্তি সাধুগণের নিকট হইতেই লাভ করিতে হয়, এরূপ ভাবও নববিধান সঙ্গীতে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা ঃ—

"না ধরিলে শাক্যের চরণ, হবে না হবে না কভু বৈরাগ্য সাধন।
তাঁর চক্ষে বিবেক আলোকে কর রে সংসার দর্শন।"

সাধুদিগকে লোকে সাধারণতঃ যে চক্ষে দেখে নববিধান তাহা হইতে ভিন্ন চক্ষে দেখিয়া থাকেন। রামমোহন রায়ের সময়ে ঈশ্বর কেবল সত্ত্বা-মাত্রজ্ঞেয় ছিলেন. আদি সমাজে যদিও ঈশ্বরের প্রীতি ও উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তথাপি সেখানেও ঈশ্বর কেবল অন্তরাত্মা, প্রাণের প্রাণ, জ্ঞানময়-রূপে জীবের জ্ঞানে প্রকাশিত। জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের ভেদ সেখানে বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। ভারতবর্ষীয় সমাজে, এই দ্বৈতভাব প্রথমে আরো স্ফুটতর হইয়া তাহার প্রথম জীবনের গভীর পাপবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতবর্ষীয় সমাজ যত নববিধানের দিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ততই এই ভাব, এই ভেদবুদ্ধি, এই দ্বৈতজ্ঞান ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে। নববিধানে প্রকৃত অদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত ভাবের প্রথম স্ফূর্ত্তি। তাই এখানে ভাগবতী লীলা পরিস্ফুট। নববিধানের ভক্ত-যোগের গূঢ় রহস্য এইস্থানেই প্রকাশিত।

লীলাময় ঈশ্বর দর্শনের পূর্ব্বে বিশ্বরূপের সঙ্গে পরিচয় হওয়া আবশ্যক, পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভারতবর্ষীয় সমাজের শেষ জীবনে বিরাট মূর্ত্তি দর্শনের প্রমাণ একটু আধটু পাওয়া গিয়া থাকে। যথা ঃ—

মন একবার হরি বল, হরি বল হরি বল।
হরি হরি হরি বলে ভবসিন্ধু পারে চল।
জলে হরি স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি সূর্য্যে হরি,
অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল।
অন্নে হরি বস্ত্রে হরি, গৃহপরিবারে হরি,
দেহ মন প্রাণে হরি, হরি সঙ্গের সম্বল।

নিশ্বাসে প্রশ্বাসে হরি, শোণিত প্রবাহে হরি,
নয়ন অঞ্জন হরি, হরি শক্তি হরি বল।
চিন্ময় অরূপ হরি, নহেন কভু দেহধারী,
চিদানন্দরূপ ধরি, করেন প্রাণ শীতল।
নয়নে দেখরে হরি, রসনায় বল হরি,
হৃদয় কমলে ভজ হরিচরণ কমল। (৪০০)

আর একটী সঙ্গীতে আছে ঃ—

"তুমি পূর্ণব্রহ্ম ভগবান। স্রষ্টা পাতা, পিতামাতা, গুরু জ্ঞানদাতা, রাজা প্রভু ধাতা, স্বামী সখা প্রাণ প্রাণ।
বেদ প্রতিপাদ্য তূরীয় মহান, পুরাণে লীলাময় পুরুষ প্রধান,
সর্ব্বভূতে হরি নানারূপ ধরি আছ সদা বর্ত্তমান।"

আর একটী সঙ্গীতে ঃ—

মোহন বেশে মন করি আকর্ষণ, বিরাজ করিছ জগতে শ্রীহরি।
জননীর বেশে নারী হৃদি মাঝে, রাজরাজেশ্বর মানব সমাজে,
করিছ শাসন করুণা বিধানে, বিবিধ মঙ্গল বিতরণ করি।
ফলফুলে মহালক্ষ্মী রূপ ধরি, শান্তিরূপে বহে নির্ঝরের বারি,
(তুমি) অন্নদা রূপেতে অন্নদান করি, পালিছ জগতে বিরাট রূপ ধরি।
মহাজ্ঞান রূপে বেদাদি বেদান্তে, পুণ্যময় রূপে সাধু পুণ্যবন্তে,
ভব কর্ণধার হ'য়ে জীবনান্তে, জীবে তরাও দিয়ে শ্রীচরণ তরি। (১১৫৬)

কিন্তু যদিও "সর্ব্বভূতে হরি, নানারূপ ধরি" সদা বর্ত্তমান আছেন, তথাপি সকল ভূতে কি তাঁর প্রকাশ সমান? সত্তার ইতর বিশেষ কুত্রাপি নাই। কিন্তু প্রকাশের কি বিভিন্নতা, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ভেদ নাই? জড়ে যেমন, ইতর প্রাণীতে তেমনি, ব্রহ্মসত্তা সমভাবে বিরাজিত; কিন্তু জড়ে তাঁর যে প্রকাশ ইতর প্রাণীতে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, স্ফুটতর, উজ্জ্বলতর প্রকাশ। ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানবে তাঁর প্রকাশ অপেক্ষা আরো উজ্জ্বলতর। ইহা তো সকলেই জানি, সকলেই মানি। কিন্তু সকল মানবে জুলু ও জর্ম্মাণে, বালকে ও প্রৌঢ়ে, পাপী ও সাধুতে কি ব্রহ্মসত্তা সমান ভাবে পরিস্ফুট? তাতো নয়। মানবের মধ্যে ব্রহ্মসত্তা কোথাও বা ম্লান ও অদৃশ্য, কোথাও বা উজ্জ্বল ও সুপ্রকাশিত।

তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ কোথায়? সাধু পুরুষে, ভাগবত জনে। সৃষ্টিতে যেমন স্রষ্টা সাকার, ভক্তে ভগবান সেইরূপ সাকার। তাই বিশ্বরূপ দেখিয়া, ভাগবতী লীলারস আস্বাদন করিয়া, নববিধানের ব্রাহ্ম, ভক্তে ভগবানের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখিয়া গাহিতেছেন :—

নমো দেব! নমো দেব!
নমো নিরঞ্জন হরি; স্রষ্টা পাতা, মঙ্গলদাতা,
তব পদ শিরে ধরি, সবে প্রণিপাত করি।
অমর সুপুত্রগণ, যোগী ঋষি তপোধন,
ঈশা মুষাজন, গৌর আদি, শাক্য, জনক মহাজন;
তাঁদের জীবনে, চরিত দর্পণে
তোমারে করি দরশন, বন্দি নাথ ও চরণ।

আর একটী সঙ্গীতে গাহিতেছেন :—

কেমনে সই ভক্তের অপমান।
ভক্তে বিরাজ করেন আপনি ভগবান। (৮৮২ সং)

কিন্তু ভক্তে ভগবানকে দেখাও কতকটা বাহিরে দেখা। আপনার মধ্যে, অভেদভাবে ভগবানকে দেখাই শ্রেষ্ঠতম দেখা। ঐ স্থানেই জীব ব্রহ্মের প্রকৃত মিলন। নববিধান সঙ্গীতে এই মিলনেরও আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এই মিলনও ভক্তের মধ্য দিয়াই হয়। প্রথমে সাধক ভক্তের সঙ্গে একাত্ম হইয়া, সাধু ভক্তে ভগবানের যে প্রকট রূপ তাহার সঙ্গে আপনার অভিন্নতা সাধন করিয়া, পরে ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা সাধিত হয়। তাই নববিধান সাধক প্রথমে গাহিতেছেন :—

(এবার) হরি প্রেমানলে জ্বলে হব খাঁটি সোণা।
আপনার রূপে আপ্‌নি মজে কর্‌ব প্রেমসাধনা।
ভক্তের পদযুগলে, নূপুর হ'য়ে নাচ্‌ব তালে,
বাজ্‌ব রুণু ঝুনু বোলে মধুর বাজনা।
সোণার বরণ গৌর অঙ্গে, মিশে যাব প্রেম রঙ্গে,
গৌর সঙ্গে হরিনাম কর্‌ব ঘোষণা। (৫৩১)

আবার গাহিতেছেন :—

তোমার রূপের ছায়া পড়ে যার হৃদি দর্পণে।
দেখে সে যুগল রূপ অপরূপ নিজ জীবনে।
আপনি আপন স্বভাবে, এক হ'য়ে দুই ভাবে,
গভীর প্রণয়ে ডুবে, থাকে সে আনন্দ মনে।
ওহে বিধি প্রজাপতি, তব পদে এই মিনতি,
কর চিরসুখী শুভ আত্মপরিণয় বন্ধনে।

পুরুষে প্রকৃতির. ব্রহ্মে জীবের সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন, আত্মবিলয়, ও এই আত্মবিলয় দ্বারা ব্রহ্মশক্তিময় হওয়াতেই, এই আত্ম পরিণয় বন্ধনের সার্থকতা। ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি। ইহাই জীবের চরম গতি। ইহাই সাধনের শেষ সিদ্ধি। এই সিদ্ধিতত্ত্বও এই শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মতত্ত্ব নববিধান সঙ্গীতে প্রকাশিত। যথা :—

হরি পদ ভজে, হরি পদে মজে, হব আমি নরহরি।
আমার আমিত্ব, অসার স্বামিত্ব, মনুষত্ব পরিহরি।
হরি বোল বলে, যাব স্বর্গে চলে, ভাগবতী তনু ধরি।
ভেদাভেদ জ্ঞান, আত্ম অভিমান, মহাযোগে সব হবে অন্তর্ধান,
দোঁহে দোঁহাকার, মিলন বিহার, কিবা শোভা মরি মরি।
শ্রীহরি দর্পণে রূপ নরহরি, নিরখি আনন্দে দুনয়ন ভরি।
নিজপদ ধূলি, নিজ মাথে তুলি, লইব ভকতি করি।

জীব ব্রহ্মের এই যুগলমিলনই ব্রহ্মতত্ত্বের শেষ তত্ত্ব। জ্ঞানের যেখানে শেষ, ভক্তিরও সেইখানেই তৃপ্তি, প্রেমেরও সেই স্থানেই পরিণতি। আদর্শ সম্বন্ধে এই উন্নত ভূমি নববিধান সঙ্গীত লাভ করিয়াছে বলিয়াই, তাহা ব্রহ্ম সঙ্গীতের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

আধুনিক ব্রহ্মবিজ্ঞান-প্রবর্ত্তকগণ।

প্রমাণযুক্ত মতের নাম বিজ্ঞান। যাঁহারা এদেশে আধুনিক সময়ে প্রমাণ সহ ব্রহ্মবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা বলা,—তাঁহাদের প্রদর্শিত প্রমাণের উল্লেখ ও সমালোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এরূপ প্রচার হয়ত অনেকেই করিয়াছেন, কিন্তু সকলের উল্লেখ না করিয়া কেবল যাঁহারা ব্রহ্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাঁহাদেরই কথা বলিব। শাস্ত্র ও গুরুর উপর অন্ধভাবে নির্ভর না কবিয়া প্রত্যেকের হৃদয়-নিহিত জ্ঞানালোক দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টাতেই ব্রহ্মবিজ্ঞানের উৎপত্তি। এই চেষ্টা উপনিষদ্‌কার ঋষিগণের সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং তাঁহারাই ব্রহ্মবাদের প্রথম বিজ্ঞানকর্ত্তা। বৈদান্তিক দার্শনিকগণ এই ঋষিগণের উত্তরাধিকারী। কিন্তু তাঁহারা ঋষিদিগের স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত উক্তিগুলিকে অন্ধভাবে গ্রহণ করিয়া এবং অভ্রান্ত শাস্ত্ররূপে দাঁড় করাইয়া ব্রহ্মবাদকে কিয়ৎ পরিমাণে মলিন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহারা ঋষিদিগের অনিয়ন্ত্রিত চিন্তাগুলিকে অনেক পরিমাণে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ব্রহ্ম বিদ্যার অনেক উপকার সাধন করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানযুগের ব্রহ্মবাদিগণ উপরোক্ত দুই শ্রেণীর ব্রহ্মবাদিদিগের প্রচারিত কোন কোন সত্য ও ভাবের অধিকারী হইয়া থাকিলেও তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানের অধিকারী হন নাই। সুতরাং এই প্রাচীন ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রবর্ত্তকগণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিব না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় উপনিষৎ ও বেদান্তদর্শনের দোহাই দিয়া বর্ত্তমান যুগে ব্রহ্মবাদ প্রচার করেন। তিনি স্বয়ং শাস্ত্রান্ধতার অতীত হইলেও প্রচলিত শাস্ত্রান্ধতার স্পষ্ট প্রতিবাদ করেন নাই, এবং প্রাচীন বিজ্ঞানের পুনঃসংস্কার অথবা নিজের প্রবর্ত্তিত স্বাধীন বিজ্ঞান প্রচার, কোন উপায়েই ব্রহ্মবাদকে বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তিগণের মধ্যে প্রচলিত শাস্ত্রান্ধতা যথেষ্ট পরিমাণেই প্রবল ছিল। কেবল প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ এবং চিন্তা-প্রধান বেদান্তশাস্ত্র অবলম্বন দ্বারা স্বাধীন চিন্তা ও বিজ্ঞান প্রচারের পথ কিয়ৎ পরিমাণে উন্মুক্ত হইয়াছিল, এইমাত্র।

বর্ত্তমান যুগে ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি প্রথমে প্রচলিত শাস্ত্রান্ধতা হইতে ব্রহ্মবাদকে মুক্ত করিয়া স্বাধীন জ্ঞানরূপ ভিত্তির উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ব্রহ্মবাদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা শিক্ষা দিলেন, তাহা সংক্ষেপে এই ঃ—

ঈশ্বর, অমরত্ব, ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ, এই সমস্ত বিশ্বাস মানব মাত্রেরই আত্মাতে নিহিত আছে। এই সমস্ত বিশ্বাস মৌলিক, সার্ব্বভৌমিক ও অনতিক্রমণীয়। ইহাদের মৌলিকতার প্রমাণ এই যে, অতি অমার্জ্জিত বুদ্ধি, তর্কযুক্তিতে অপারগ মানবের মনেও এই সমস্ত বিশ্বাস বর্ত্তমান আছে, এবং যুক্তিতর্ক এই সমুদায় বিশ্বাসকে সমর্থন করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। যুক্তিতর্কের সাহায্যে ইহারা উদিত হয় নাই। ইহাদের সার্ব্বভৌমিকত্বের প্রমাণ এই যে জগতে এমন কোন ব্যক্তি বা জাতি নাই যাহাদের মধ্যে এই সকল বিশ্বাস বর্ত্তমান নাই। নাস্তিক যুক্তি তর্ক দ্বারা এই সকল বিশ্বাসের অতীত হইবার চেষ্টা করিলেও সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় ইহাদের অধীন থাকে। ইহাদের অনতিক্রমণীয়তা প্রত্যেকেই অনুভব করিতেছেন। মহর্ষি এরূপ স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের নাম দিলেন—আত্মপ্রত্যয়। এই নামটি দেশীয় দর্শনশাস্ত্র হইতে গৃহীত। ইহা বেদান্ত দর্শনের "অহং প্রত্যয়" বা "অস্মৎপ্রত্যয়ের" রূপান্তর মাত্র। কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্রে 'অস্মৎ প্রত্যয়' কথাতে যাহা বুঝায়, মহর্ষির আত্মপ্রত্যয়ে তাহা বুঝায় না। তিনি দেশীয় নামে বিদেশীয় মত প্রচার করিলেন। তাঁহার আত্মপ্রত্যয়ের মত মূলে স্কচ্ দর্শনের মত। তিনি পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়ন ও নিজের স্বাধীন চিন্তা দ্বারা এই মতকে নিজের করিয়া লইয়াছিলেন। জার্ম্মান দর্শনও তাঁহার চিন্তাকে কিয়ৎ পরিমাণে নিয়মিত করিয়াছিল। "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস", "ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ" ও "আত্মতত্ত্ববিদ্যা" এই তিনখানি পুস্তকে মহর্ষির ধর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মত দ্রষ্টব্য।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন স্বাধীন চিন্তাশীল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রধানতঃ মহর্ষি-প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানকেই নিজ বাগ্মিতার সাহায্যে বিশেষ ভাবে প্রচার করেন। তিনি স্কচ্ দর্শন এবং ইহার সহযোগী ফরাসী দর্শন বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিয়া এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের উক্তি ও প্রমাণ

উদ্ধৃত করিয়া আত্মপ্রত্যয়ের মতকে সমর্থন করেন এবং আত্মপ্রত্যয়ের বিষয়ীভূত বস্তু সমূহকে আমরা সহজ জ্ঞান (common sense) রূপ মনোবৃত্তি দ্বারা অবগত হই, এই একটী বিশেষ ভাব প্রচার করেন। সহজ জ্ঞানবাদের বিরুদ্ধবাদিদিগের নানা যুক্তিও তিনি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন। শাস্ত্রবাদও যে সহজ জ্ঞানভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা তিনি স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করেন। কিন্তু মোটের উপর তাঁহার ও মহর্ষির মত একই। সুতরাং আমরা একত্র ইহাঁদের উভয়ের প্রচারিত মত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিব। কেশব বাবুর ধর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মত তাঁহার Essays and Tracts Vol II এবং "The Brahmo Samaj Vindicated" নামক বক্তৃতায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

উপরিউক্ত মতকে আমরা মূলে ঠিক মনে করি। কিন্তু মত-প্রচারক মহাত্মাদ্বয়ের ব্যাখ্যাপ্রণালীকে সন্তোষজনক মনে করি না। শাস্ত্রবাদির বিরুদ্ধে তাঁহাদের ব্যাখ্যা প্রবল বলিয়া মনে করি. তাঁহাদের এবং তাঁহাদের অনুবর্ত্তী লেখকদিগের ব্যাখ্যা দ্বারা অন্ধ শাস্ত্রবাদ খণ্ডিত হইয়া স্বাধীন চিন্তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি, কিন্তু ইহাতে সন্দেহবাদ খণ্ডিত হইয়া ঈশ্বর-বিশ্বাস দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। কোন বিশ্বাসের মৌলিকতা দেখাইতে যেরূপ বিশ্লেষণ প্রণালীর প্রয়োজন, সেরূপ বিশ্লেষণ প্রণালীর কোন আভাসই ইহঁাদের গ্রন্থসমূহে নাই। প্রকৃতির অতীত কোন না কোন প্রকার শক্তির বিশ্বাস মানবমাত্রেরই আছে, ইহা দেখাইলেই যে ঈশ্বর বিশ্বাসের সার্ব্বভৌমিকত্ব দেখান হইল তাহা মনে করি না, কেন না, এই বিশ্বাস কিছু ঈশ্বরবিশ্বাস নহে, আর এরূপ বিশ্বাসের সার্ব্বভৌমিকত্বও সমগ্র জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান না থাকিলে স্থাপন করা যায় না। অনতিক্রমণীয়তার ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক নহে। যে বলে আমার বিশ্বাস নাই, তার বিশ্বাস আছে বলা, এবং তাহার চিন্তার দুর্ব্বলাবস্থায় চিরাগত অভ্যাসবশতঃ উদিত সংস্কারকে বিশ্বাস বলাতে কোন লাভই নাই। আর কেবল নাস্তিকের কথাই বা কেন? বিশ্বাসাভিমানীর মনও যখন সময়ে সময়ে সন্দিহান হয়, এবং সহজ জ্ঞানবাদের চলিত ব্যাখ্যা যখন এই সন্দেহকে অসম্ভব করিতে পারে না, তখন ইহা যে প্রকৃত ধর্ম্মবিজ্ঞানে দাঁড়ায় নাই, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

উল্লিখিত মহাত্মাদ্বয়ের পরেই ভক্তিভাজন বাবু রাজনারায়ণ বসুর নাম করা আবশ্যক। তিনি তাঁহার "ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা" নামক পুস্তকে ব্রহ্মবাদ ও সাধনতত্ত্ব বিস্তৃতরূপে বিবৃত করিয়াছেন। রাজনারায়ণ বাবুর ব্যাখ্যা-প্রণালীতে যথেষ্ট নূতনত্ব আছে। "ঈশ্বর-বিশ্বাস সহজ-জ্ঞান সিদ্ধ" কেবল এই উপদেশ দানে সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি এই বিশ্বাসের অভ্যন্তরস্থ ভিন্ন ভিন্ন উপকরণগুলিকে কিয়ৎ পরিমাণে বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং মানবের অবস্থা ভেদে যে ভিন্ন ভিন্ন উপকরণগুলি ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বিকশিত হয়, তাহাও দেখাইয়াছেন। (২) তিনি জর্ম্মাণ দার্শনিক শ্লায়ারমেকার ও আমেরিকান ব্রহ্মবাদী থিওডোর পার্কারের সহিত একমত হইয়া মূল আদিকারণের বিশ্বাসকে নির্ভরের ভাব (sense of dependence)রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (৩) ঈরশ্ব-বিশ্বাসের স্ফুরণে যুক্তির কার্য্যকারিতা তিনি স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছেন, এবং কথঞ্চিৎ বিস্তৃতরূপে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও বক্তব্য এই যে আত্মপ্রত্যয়ের মৌলিকতা, সার্ব্বভৌমিকত্ব ও অনতিক্রমণীয়তা তিনিও সন্তোষজনকরূপে দেখাইতে পারেন নাই। ইহাঁদের সকলেরই শেষ কথা এই যে কোন কোন মতে বিশ্বাস না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না, এবং যেরূপ ব্যাখ্যা প্রাণালীই ইহারা অবলম্বন করুন না কেন, পদে পদেই ইহাদিগকে এই "থাকিতে পারি না"র দোহাই দিতে হয়। যে বলে "থাকিতে পারি" তাহাকে আর ইহাঁদের কোন পাকা কথা বলিবার নাই। ঈশ্বর-বিশ্বাসকে "নির্ভরের ভাবে" পরিণত করিয়া রাজনারায়ণ বাবু কিছু পাকা কথা বলিয়াছেন সন্দেহ নাই, কেন না নাস্তিককে ও স্বীকার করিতে হইবে যে তাহার ভিতরেও একটা অনতিক্রমণীয় নির্ভরের ভাব আছে, সে ও স্বপ্রতিষ্ঠ নহে। কিন্তু সে যদি বলে যে আমি জড় শক্তির উপর নির্ভর করিতেছি, মৌলিক নির্ভরের ভাব জড়শক্তিরই পরিচয় দেয়, কোন জ্ঞানময় পুরুষের পরিচয় দেয় না, তবে চলিত বিশ্বাসের দোহাই দেওয়া ব্যতীত রাজনারায়ণ বাবুর আর তাহাকে কিছু বলিবার নাই। যে দার্শনিক ব্যাখ্যা জড়ের জড়ত্ব দূর করে, এবং জীবের জীবত্বের মূলে ব্রহ্মকে দেখাইয়া দেয়, সেই ব্যাখ্যা রাজনারায়ণ বাবুর পুস্তকে নাই।

তৎপর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "তত্ত্ববিদ্যা"

প্রকাশিত হয়। ইহা একখানি চিন্তাপূর্ণ দার্শনিক গ্রন্থ এবং লেখকের চিন্তা-শীলতা, পাণ্ডিত্য ও লিপিচাতুর্য্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। ইহাতে কতকটা কাণ্টের প্রণালীতে মূল তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রণালী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই পুস্তকে মূলতত্ত্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত লেখকের অপেক্ষা স্পষ্টও উজ্জ্বলতর ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে ঈশ্বর-বিশ্বাসকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় নাই। ঈশ্বরের স্বরূপাদির ব্যাখ্যা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, এবং কোন কোন স্থলে লেখক চলিত বিশ্বাসের দোহাই দিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। সুতরাং গ্রন্থ প্রতিভার পরিচায়ক হইলেও ইহা দ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রচারের বিশেষ সাহায্য হইয়াছে কি না সন্দেহ।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় কালীশঙ্কর কবিরাজ মহাশয় "ধর্ম্ম-বিজ্ঞানবীজ" নামক একখণ্ড পুস্তক প্রকাশ করেন। ক্রমশঃ সেই পুস্তকের আরো দুই খণ্ড বাহির হয়। এই পুস্তকে ধর্ম্মের অনেক অবান্তর মত বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাস সম্বন্ধে ইহাতে তাদৃশ চিন্তাপূর্ণ কথা দেখা যায় না। পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানকর্ত্তাদিগের হইতে ইহঁার বিশেষ ভিন্নতা এই যে ইনি সৃষ্টিকৌশল কিছু বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সৃষ্টিকৌশলের যুক্তি তেমন চাতুর্য্যের সহিত ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন নাই।

কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আধুনিক ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রথম যুগের শেষ। এই যুগের বিজ্ঞানালোচনার মোট ফল এই—ব্রহ্মবাদ শাস্ত্রাধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক মূল বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। এই যুগের প্রধান শত্রু একদিকে অন্ধ শাস্ত্রবাদ, অপর দিকে সাধনহীনতা, ধর্ম্মসম্বন্ধে উদাসিনতা। এই উভয় শত্রুর বিপক্ষেই বিজ্ঞানকর্ত্তাগণ জয়লাভ করিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মবাদিদিগকে শাস্ত্রবাদ ও গুরুবাদ হইতে মুক্ত করিয়া, স্বাধীন মুক্তভাবে অন্তরে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিতে বলিয়া, ধর্ম্মসাধনের অবকাশ দিলেন। ধর্ম্মসাধন আরম্ভের জন্য যতটুকু বিজ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা ব্রহ্মসাধকগণ এক প্রকার পাইলেন। নাস্তিকতা, সন্দেহবাদ ও অজ্ঞেয়তা-বাদের সংঘর্ষণে যে গভীরতর বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তাহা এই যুগে আবি-র্ভূত হয় নাই।

"চিন্তাকণিকা" নামক এক খানি অতি ক্ষুদ্র পুস্তকের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে

ব্রহ্মবিজ্ঞানের একটী নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। এই পুস্তিকার বিশেষ কথা এই যে লোকে যাহাকে জড় শক্তি বলে, তাহা ইচ্ছা-শক্তি ব্যতীত আর কিছু নহে। বস্তুতঃ অন্ধ জড়শক্তি বলিয়া কিছু নাই। ঈশ্বর-বিশ্বাস মূলে এই শক্তিতে বিশ্বাস, এবং এই বিশ্বাস নাস্তিক আস্তিক, জ্ঞানী অজ্ঞানী, সকলেরই মধ্যে বর্ত্তমান আছে। তবে যে সকলে শক্তিকে ইচ্ছা বলিয়া বুঝিতে পারে না, তাহা দার্শনিক বিশ্লেষণ শক্তির অভাবে। এই সত্য যে পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্ম-বাদিগণ একবারে জানিতেন না, তাহা নহে। কিন্তু এই পুস্তিকা প্রকাশের পূর্ব্বে এই মত বিশেষ ভাবে প্রচারিত হয় নাই, এবং ইহার কোন ব্যাখ্যাও পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। এই মত ইংলণ্ডীয় ব্রহ্মবিজ্ঞানবিৎ জেম্‌স মার্টিনো দ্বারা উক্ত দেশে প্রচারিত হয়, এবং তথা হইতেই এ দেশে আনীত হয়। উক্ত পুস্তিকায় সৃষ্টি কৌশলের যুক্তি কিছু নূতন ভাবে ব্যাখ্যাত হয়।

বলিতে গেলে উক্ত ক্ষুদ্র পুস্তকে দার্শনিক অধ্যাত্মবাদের (Ideallsm) সূত্রপাত হয়, কারণ উহাতে জড়কে শক্তিহীন করিয়া সমুদায় শক্তি আত্মাতে আরোপিত হয়। কিছু দিন পর এই অধ্যাত্মবাদ পরিস্ফুট আকারে Roots of Faith নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়। যাহার স্বাধীন শক্তি নাই তাহার স্বাধীন অস্তিত্বও থাকিতে পারে না, এবং যাহার উপর শক্তি প্রযুক্ত হয়, তাহা শক্তিমানের সম্পূর্ণ আয়ত্ত থাকা আবশ্যক। সুতরাং এই পুস্তকে আধ্যাত্মিক শক্তিবাদ দার্শনিক অধ্যাত্মবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা 'চিন্তা-কণিকার' ব্যাখ্যা অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত। এই পুস্তকে শক্তিবাদ ও অধ্যাত্মবাদের সাহায্যে পাশ্চাত্য অজ্ঞেয়তাবাদও সংক্ষেপে খণ্ডিত হইয়াছে।

তৎপর শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, প্রথম ভাগ" উল্লেখ যোগ্য। এই পুস্তকে অন্যান্য অবান্তর বিষয় ছাড়া (১) আধ্যাত্মিক শক্তিবাদ-ঘটিত, (২) সৃষ্টিকৌশল-ঘটিত ও (৩) বিবেক-ঘটিত, তিনটী ঈশ্বরাস্তিত্ব-প্রতিপাদক যুক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই তিনটী যুক্তিই প্রচলিত ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মবিজ্ঞান হইতে গৃহীত, কিন্তু এদেশে এইরূপে ধর্ম্মবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণই নূতন , এবং এখানকার ব্যাখ্যা প্রণা-লীতে কিছু নূতনত্বও আছে। নগেন্দ্র বাবুর সরল ও বিশদ ব্যাখ্যা-প্রণালী ইংরেজি সাহিত্যেও দুর্ল্লভ। যাহা হউক, আমাদের বিবেচনায় নগেন্দ্র বাবুর

পুস্তকে নিরীশ্বরবাদি ও অজ্ঞেয়তাবাদের যে খণ্ডন আছে তাহা মোটের উপর খুব সন্তোষজনক। এই সকল ব্রহ্মবাদ-বিরুদ্ধ মতের অসারতা বুঝিবার জন্য, জগৎ যে আধ্যাত্মিক শক্তিদ্বারা পরিচালিত, এই বিশ্বাস লাভ করিবার জন্য, দূরদেশে বা দূরস্থ কালে যাইবার প্রয়োজন নাই। এই জ্ঞানদানের পক্ষে নগেন্দ্র বাবুর পুস্তক বিশেষ রূপে উপযোগী। তবে যে ধর্ম্মবিজ্ঞান পিপাসু ব্যক্তিগণ এতাদৃশ পুস্তক পাঠ উপেক্ষা করেন, তাহার প্রধান কারণ আমাদের বোধ হয় আর কিছুই নয়—এই মাত্র যে—"গাঁয়ের যোগী ভিখ্ পায় না।"

'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' বাহির হইবার পর শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "ঈশ্বর অচেতন শক্তি কি সচেতন পুরুষ?" এই বিষয়ে ছাত্রসমাজে একটী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাতে অতি দক্ষতার সহিত উপরি উক্ত তিনটী যুক্তি ব্যাখ্যাত হয়। এই বক্তৃতা শাস্ত্রী মহাশয়ের "বক্তৃতা-স্তবক" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

জগৎ আধ্যাত্মিক শক্তির অধীন, জড় বা অজ্ঞান শক্তির অধীন নহে, ইহা সপ্রমাণ করা আর ঈশ্বর-বিশ্বাসকে সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করা, এই দুই কথার অর্থ যদি ঠিক এক হইত, তাহা হইলে এখন পর্য্যন্ত এদেশে যতটুকু ধর্ম্মবিজ্ঞানোন্নতির সংবাদ দেওয়া হইল, ততটুকুকে একপ্রকার যথেষ্ট বলা যাইতে পারিত। কিন্তু এই দুই কথার অর্থ এক নহে। জগৎ আধ্যাত্মিক শক্তির অধীন এই বিশ্বাসাপেক্ষা প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাস অনেক পরিমাণে প্রশস্ততর ও গভীরতর বস্তু। প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাসের অর্থ এই:—

১। জড় ও চেতন জগৎ এক অদ্বিতীয় জ্ঞানময় পুরুষের সম্পূর্ণ অধীন।

২। এই জ্ঞানময় পুরুষ দেশে, কালে ও শক্তিতে অনন্ত। তিনি ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্বহৃদয়াতিষ্ঠিত, সকল আত্মার আত্মা।

৩। তিনি পূর্ণ প্রেম, পুণ্য ও আনন্দের আধার।

এই পূর্ণ ব্রহ্মবাদ উপরি উক্ত কোন পুস্তকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করা হয় নাই। এই হইল এই পুস্তক সমূহের একটা বিশেষ অভাব। আর একটা অভাব এই যে প্রথম যুগের আত্মপ্রত্যয়বাদ এই সকল গ্রন্থকারগণের হস্তে অতি অল্প পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিলেও, প্রায় পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত ভূমির উপরই দণ্ডায়মান আছে, পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হয়

নাই। যাহা হউক, নূতন যুগের পূর্ব্বোক্ত সকল পুস্তকেই ঈশ্বর-বিশ্বাস শক্তি-বিশ্বাসে পরিণত করাতে ইহার সর্ব্বভৌমিকতা ও অনতিক্রমণীয়তা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে বোধগম্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কারণ শক্তি-বিশ্বাস যে অনতিক্রমণীয় তাহা সাধারণতঃ সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু যে সকল দার্শনিক শক্তি-বিশ্বাসকে অনতিক্রমণীয় মনে করেন না, এবং শক্তি-বিশ্বাস-নিরপেক্ষ হইয়া কেবল অনুভব পরম্পরা বা পরমাণু ও গতির সাহায্যে বিজ্ঞান গড়িতে প্রয়াস পাইতেছেন, তাহাদের বিপক্ষে উপরি-উক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞানকারগণের কিছুই বলিবার নাই।

এই দুটী অভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের কয়েকটী বিশেষত্ব এই :—

১। ইহাতে মৌলিক বা সহজ জ্ঞানের এরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে :—যে জ্ঞান সমুদায় জ্ঞানের ভিত্তি, যে জ্ঞান না হইলে লৌকিক বা বৈজ্ঞানিক কোন জ্ঞানই সম্ভব নহে, তাহাই মৌলিক জ্ঞান। ইহাতে দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে বিষয়ী অর্থাৎ জ্ঞাতার জ্ঞান ব্যতিরেকে বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না, দেশাতীত বস্তুর জ্ঞান ব্যতীত দেশের জ্ঞান হইতে পারে না, কালাতীত নিত্য বস্তুর জ্ঞান ব্যতীত কালের ও অনিত্য বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না, এক অখণ্ড অদ্বিতীয় বস্তুর জ্ঞান ব্যতীত বহু বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না এবং পূর্ণ পবিত্র বস্তুর জ্ঞান ব্যতীত অপবিত্র অপূর্ণ বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু মূলতত্ত্ব মানব মাত্রেরই বুদ্ধিনিহিত হইলেও সকল স্থলে ইহা উজ্জ্বল উপলব্ধির বিষয় নহে। কেবল গভীর চিন্তা ও আলোচনা দ্বারাই ইহা উপলব্ধির বিষয় হয়, চিন্তাহীন অবস্থায় ইহা অনুপলব্ধ থাকিয়া জ্ঞান ও চিন্তাকে পরিচালিত করে।

২। Roots of Faith এ যে অধ্যাত্মবাদের আভাস মাত্র দেওয়া হইয়াছিল সেই অধ্যাত্মবাদ—অর্থাৎ সমুদায় জগৎই আত্মাশ্রিত এই মত—এই পুস্তকে অপেক্ষাকৃত অনেক বিস্তৃত ভাবে সমর্থিত হইয়াছে।

৩। ইহাতে এক প্রকার দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সমর্থিত হইয়াছে। এক অখণ্ড জ্ঞানবস্তুই অনন্ত দেশ কালের আশ্রয়রূপে আছে, অথচ বিশেষ বিশেষ দেশ কালে জীবের জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতেছে, এই জ্ঞানবস্তু মূলে অসীম হইয়াও

জীবের সসীম জ্ঞানরূপে অনুপ্রকাশিত, এবং ইহা জীবের জ্ঞানরূপে প্রকাশিত বলিয়াই জীব ইহাকে জানিতে সক্ষম হইতেছে—এরূপ একটা মত ইহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নৈতিক জগতেও এই দ্বৈতাদ্বৈত ভাব দেখান হইয়াছে এবং জীবের প্রেম পুণ্যকে ঐশ্বরিক প্রেমপুণ্যের অনুপ্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

৪। এই পুস্তকের ঈশ্বর-বিষয়ক যুক্তি শক্তিবাদ বা কৌশলবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ইহা বস্তুবাদের উপর প্রদর্শিত। ইংরাজিতে যাহাকে Ontological Argument বলে, ইহা সেই জাতীয় যুক্তি।

'ব্রহ্মজিজ্ঞাসার' অধ্যাত্মবাদ ইংরেজ দার্শনিক বার্ক্লির Idealism নহে। ইহা জার্ম্মাণ দার্শনিক হিগেলের Absolute Idealismএর সহিত কিয়ৎ-পরিমাণে সম্পর্কিত এবং বৃটেনীয় Neo-Kantian বা Neo-Hegelian সম্প্রদায়ের সহিত কিছু ঘনিষ্ঠরূপে সংবদ্ধ। কিন্তু ইহার ব্যাখ্যা প্রণালী অনেক স্থলেই স্বাধীন, এবং ইহাতে এদেশীয় বৈদান্তিক ভাবও কিয়ৎ পরিমাণে মিশ্রিত আছে।

চারি পাঁচ বৎসর হইল দার্শনিক অধ্যাত্মবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত একখানি ধর্ম্মবিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক বাহির হইয়াছে। ইহা সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল হাল্‌দার কৃত "Two Essays on Theology and Ethics." এই পুস্তক খানি গভীর অধ্যয়ন ও চিন্তার ফল। ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে Neo-Kantian ব্যাখ্যাপ্রণালী বহুলরূপে অবলম্বিত হইয়াছে এবং ইহাতে নীতির ভিত্তি সম্বন্ধে অনেক চিন্তাপূর্ণ কথা বলা হইয়াছে। ইহার নীতিবিষয়ক প্রবন্ধ এদেশে নূতন বস্তু এবং বিশেষ আলোচনার উপযুক্ত। কিন্তু এই পুস্তকের সংক্ষিপ্ততা বশতঃ ইহাতে ঈশ্বর-স্বরূপের বিশেষ ব্যাখ্যা না থাকাতে ইহা কতকটা অতৃপ্তিকর হইয়াছে। যাহা হউক মোটের উপর এই পুস্তক দেশের বিশেষ গৌরবের বিষয় এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির আশাদায়ক ও পদপ্রদর্শক।

চারি পাঁচ বৎসর হইল শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্র বাবুর "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" দ্বিতীয় ভাগ বাহির হইয়াছে। ইহাতে ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই আছে। যাহা আছে তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই যে তিনি ইহাতে স্পষ্টরূপে

দার্শনিক অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন ; কিন্তু ইহাতে জীব-চৈতন্য ও পরম চৈতন্যের মৌলিক একতা স্বীকৃত হয় নাই।

ব্রহ্মবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উপরি-উক্ত গ্রন্থ সমূহ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন যে আধুনিক ব্রহ্মবিজ্ঞান ক্রমশঃই বেদান্তমতের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রথমে এদেশে লুপ্তপ্রায় বেদান্ত-বিজ্ঞান পুনঃপ্রচারিত করেন। তাঁহার ধর্ম্মমত ব্যাখ্যাতে কিছু মৌলিকত্ব থাকিলেও তাঁহাকে মোটের উপর প্রাচীন বিজ্ঞানকর্ত্তৃগণের শ্রেণীতেই ধরা যায়। নব্য ব্রহ্মবিজ্ঞানবিদ্‌দিগের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ধর্ম্মবিষয়ে অনেক পরিমাণে প্রাচীন ভাব রক্ষা করিয়া থাকিলেও তাঁহার প্রচারিত ব্রহ্মবিজ্ঞান বেদান্ত মতের বিশেষ বিরোধী। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে এই কথা আরো অধিকতর সত্য। ঠিক তৎপরবর্ত্তী লেখকগণের প্রচারিত মতেও এই বিরোধ দূর হয় নাই। যাহাকে আমরা আধুনিক ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় বা নবযুগ বলিয়াছি, তাহাতে প্রথম হইতেই জড়শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া পূর্ব্ব-প্রচারিত দ্বৈতমতে আঘাত করা হইয়াছে। ক্রমশঃ জড়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া আত্মা ও জড়ের দ্বৈতভাব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাদিতে অদ্বৈতভাব এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'-লেখক ও বাবু হীরালাল হাল্‌দার-কৃত গ্রন্থে অদ্বৈতভাব আরো অগ্রসর হইয়াছে। তাহাতে জীব ও ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করিয়া এক অর্থে অদ্বৈতভাব, আর এক অর্থে দ্বৈতভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং বেদান্তমতের দিকে গতি অথবা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে বেদান্তমতে প্রত্যাবর্ত্তন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। ইদানিন্তন প্রচারিত সাময়িক প্রবন্ধাদিতেও এই গতি লক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে, প্রথম যুগের মতের কোন বিশেষ জীবনীশক্তি দেখা যাইতেছে না। নব-প্রচারিত মতের ক্ষীণ প্রতিবাদ মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু দার্শনিক প্রণালীতে সেই মতের ব্যাখ্যা এবং নূতন মতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কোন গ্রন্থাদি এখনও লিখিত হয় নাই, এবং সাময়িক আলোচনাদির ভাব গতিক দেখিয়া বোধ হয় না যে শীঘ্র সেরূপ কোন পুস্তকাদি প্রকাশিত হইবে। সুতরাং নব-প্রচারিত মত বর্ত্তমান

বিজ্ঞান-ক্ষেত্রের অধিকারী, ইহা বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। ধর্ম্মচিন্তার প্রথমাবস্থায় বিষয় বিষয়ীর যোগ, জীবব্রহ্মের ভেদাভেদ. অদ্বৈত ও দ্বৈত ভাবের সম্বন্ধ প্রভৃতি গভীর বিষয় না বুঝা স্বাভাবিক। সুতরাং প্রথম যুগের ব্রহ্মবিজ্ঞানকর্ত্তাগণ এই সকল মত বুঝিতে না পারিয়া এই সকল মতাবলম্বী প্রাচীনদিগের সহিত মতগত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। বর্ত্তমান যুগে জ্ঞানালোচনা ও চিন্তাশীলতার উন্নতি বশতঃ প্রাচীন বিজ্ঞানের কতিপয় পরিত্যক্ত মতের সত্যতা ব্রহ্মবাদিগণ ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছেন, সুতরাং প্রাচীনের সহিত বিচ্ছিন্ন যোগের পুনঃ প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীন কখনও সম্পূর্ণরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এরূপ পুনঃ প্রতিষ্ঠা প্রাকৃতিক উন্নতি-বিধির বিরুদ্ধ। কিন্তু প্রাচীনের সহিত নূতনের ঘনিষ্ঠ যোগ নূতনের পক্ষে কল্যাণকর, এবং উন্নতির অবশ্যম্ভাবী হেতু, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মানবে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি।

> ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
> নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
> জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
> স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥
>
> মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩। ১। ৮।

পরমাত্মা চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যেরও গ্রাহ্য নহেন, অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন ; তপস্যা ও কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। জ্ঞানশুদ্ধিদ্বারা (অর্থাৎ নির্ম্মল জ্ঞানদ্বারা) বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া সাধক অতঃপর ধ্যানযোগে সেই নিরবয়ব পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্রই সাক্ষাৎ অনুভব-জাত। শ্রুতি বলিতেছেন "তং পশ্যতে নিষ্কলম্"—সেই নিরবয়বকে দর্শন করেন। 'দর্শন'

কথাটা না বলিয়া ঋষি পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। কেবল "জ্ঞান" কথাটাতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। জ্ঞানের কথা বলিয়া আবার স্বতন্ত্রভাবে দর্শনের কথা বলিতে হইল। কারণ জ্ঞান পরোক্ষও হইতে পারে। কিন্তু বস্তূপলব্ধি পরোক্ষ জ্ঞানের কার্য্য নহে। তাহা প্রত্যক্ষ অনুভবের কার্য্য। তাই আত্মদর্শী ঋষি বলিতেছেন নির্ম্মল জ্ঞানদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তৎপর সাধক পরমাত্মাকে দর্শন করেন। কিন্তু পরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধির অসম্ভাবনা দেখাইয়াও ঋষি এরূপ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেছেন। চিত্ত শুদ্ধির জন্য ব্রহ্ম বিষয়ে ভ্রম, কুসংস্কার, মিথ্যাধারণা দূরীকরণের জন্য পরোক্ষ জ্ঞানের প্রয়োজন। যাঁহারা সূক্ষ্ম চিন্তা ও বিচার দ্বারা মনের চির-সঞ্চিত বদ্ধমূল ভ্রম দূর না করিয়াই একবারে সাক্ষাৎ দৃষ্টিশক্তি লাভের এবং তদ্দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির আশা করেন, উপনিষদের ঋষি তাঁহাদের প্রয়াসকে নিশ্চয়ই নিষ্ফল মনে করিতেন, সন্দেহ নাই। যাহা হউক শ্রুতির উল্লিখিত সাক্ষাৎ জ্ঞান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অলোচনা করা যাক্।

শ্রুতি বলিতেছেন ব্রহ্মকে পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না। তিনি যে কেবল চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, তাহা নহে; তিনি মন বুদ্ধিরও অগোচর। নান্যৈর্দেবৈঃ—অন্য ইন্দ্রিয়দ্বারাও লাভ করা যায় না। এই "অন্য ইন্দ্রিয়ের" ভিতরে মনকেও ধরা যায়; মন ষষ্ঠেন্দ্রিয়। শ্রুতি অন্যত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন "যন্মনসা ন মনুতে"—যাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না। আবার অন্যত্র "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া", এই জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান তর্কদ্বারা লাভ করা যায় না। তাহা হইলে ব্রহ্ম বুদ্ধিরও অগোচর। তবে কি এই দাড়াইতেছে যে যত দিন মানবের ব্রহ্মদর্শন না হয় ততদিন সে ব্রহ্মকে জানে না? যদি তাহাই হয় তবে লোকে ব্রহ্মের কথা বলে কিরূপে, আর অন্যে বলিলে বুঝেই বা কিরূপে? যাঁহাকে ইন্দ্রিয়যোগে প্রত্যক্ষ করে নাই, মনের দ্বারা মনন করে নাই, বুদ্ধিদ্বারা মীমাংসা করে নাই, তাঁহার কথা কিরূপে লোকে বলে, আর শুনিলেই বা কিরূপে বুঝে? অনেক লোকে কিছুই বুঝে না, এই কথা নিতান্ত ভুল কথা নহে—"শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ"—শুনিয়াও যাঁহাকে অনেকে বুঝে না। বুঝে না, তাই গ্রাহ্যও করে না; ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাঁহারা উদাসীন। কিন্তু অনেকে তাঁহার কথা বুঝে, এবং বুঝিয়া তাঁহাকে

পাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। এই সকল লোক কিরূপে অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্মকে বুঝিল? যদি তাহারা বস্তুতঃই ব্রহ্মকে কিছু বুঝিয়া থাকে, তবে ব্রহ্ম কিয়ৎ পরিমাণে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির গোচর, ইহাই কি ঠিক কথা নহে? বস্তুতঃ তাহা নহে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিগোচর বস্তু সসীম, সুতরাং তাহা ব্রহ্ম নহে। ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু যে সসীম তাহা বুঝাইবার জন্য আর প্রয়াস পাইতে হয় না। তার পর মন। ইন্দ্রিয় যাহা প্রত্যক্ষ করে, মন তাহাই সংযোগ বিয়োগ করে, ইন্দ্রিয়াতীত কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করা ইহার সাধ্যায়ত্ত নহে। ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু যখন সসীম, তখন মন সেই সকল বস্তু লইয়া যতই সংযোগ বিয়োগ, গড়া পেটা, করুক না কেন, তাহাতে অসীম বস্তু লাভ অসম্ভব। সসীমের সংযোগ বিয়োগে অসীম হয় না। তার পর, বুদ্ধি—অনুমানশক্তি। বুদ্ধি ভেদ-দর্শী। জড় আত্মা নহে, আত্মা জড় নহে; বিষয় বিষয়ী নহে, বিষয়ী বিষয় নহে; কার্য্য কারণ নহে, কারণ কার্য্য নহে, জগৎ ব্রহ্ম নহে, ব্রহ্ম জগৎ নহেন; জীব ঈশ্বর নহে, ঈশ্বর জীব নহেন—এই সকল প্রভেদ করা বুদ্ধির কার্য্য। কার্য্য দেখিয়া কারণ স্থির করা বুদ্ধির কার্য্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু বুদ্ধি যে কারণ নির্দ্দেশ করে সে কারণ কার্য্য হইতে ভিন্ন, সুতরাং সসীম। জগৎ কার্য্য দেখিয়া বুদ্ধি জগৎ কর্ত্তার অস্তিত্ব স্থির করিতে পারে, কিন্তু সে কর্ত্তা ব্রহ্ম নহেন। জগৎকর্ত্তা যখন জগৎ কার্য্য হইতে ভিন্ন, জগতের অতিরিক্ত কোন বস্তু, তখন তিনি নিশ্চয়ই সসীম, কারণ সসীমের অর্থই এমন কিছু যাহার বাহিরে অন্য সত্তা আছে। জগৎ সৃষ্টির সময়ে যদি ঈশ্বরাতিরিক্ত কোন নূতন সত্তা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে ঈশ্বর সসীম সন্দেহ নাই; ঐ সৃষ্ট সত্তা দ্বারা তাঁহার সত্তার পরিসর সীমাবদ্ধ। আর যদি সৃষ্টিকালে নূতন কিছু না হইয়া থাকে, ব্রহ্ম স্বয়ংই জগৎরূপে পরিণত হইয়া থাকেন, তবে কার্য্য কারণে ভেদ থাকে না, বুদ্ধিকৃত মৌলিক ভেদেই আঘাত পড়ে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বুদ্ধিদ্বারা অনুমিত ব্রহ্ম ব্রহ্মই নহেন, কারণ তিনি সসীম বস্তু।

তবে কি সাধারণ মানব,—যে মানবের ব্রহ্মদর্শন হয় নাই, সে সম্পূর্ণরূপেই ব্রহ্মজ্ঞানে বর্জ্জিত? জগতের ইতিহাসে চিরন্তন ও সর্ব্বত্রব্যাপী ঈশ্বর পিপাসা দেখিয়া তো তাহা বোধ হয় না। ব্রহ্মকে একবারে না জানিলে না বুঝিলে তাঁহাকে দেখিতে, তাঁহাকে পাইতে, মানুষ এত ব্যস্ত হইত না, এত ত্যাগ

স্বীকার করিত না। অথচ ব্রহ্ম প্রাকৃত বুদ্ধির অতীত। এই সমস্যার মীমাংসা কোথায় ?

বাস্তবিক কথা এই যে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান,—ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান—অস্ফুট-ভাবে প্রাকৃত বুদ্ধির সহিত জড়িত রহিয়াছে। জড়িত রহিয়াছে বলিয়াই মানব ব্রহ্মকে জানিতেছে, এবং অস্ফুটভাবে জড়িত রহিয়াছে বলিয়াই তাঁহাকে স্পষ্টরূপে জানিতে পারিতেছে না। "নো ন বেদেতি বেদ চ"—আমি মনে করি না যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি; তাঁহাকে যে জানি এমন নহে, জানি না যে এমনও নহে,—এই কথা উচ্চ সাধক যেমন বলিতে পারেন, নিম্ন সাধকও তেমনি বলিতে পারেন। আমরা ব্রহ্মকে যত টুকু জানি, তত টুকু প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই ব্যাপার, সেই জ্ঞানটুকু প্রত্যক্ষ জ্ঞানই ; কিন্তু সে জ্ঞান টুকু অতি অল্প, এবং ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিঘটিত সংস্কারের সহিত অত্যন্ত জড়িত, তাই সেটুকু "দর্শন" নামের উপযুক্ত নহে। যতদিন ইহা নির্ম্মল না হইতেছে, উজ্জ্বল না হইতেছে, তত দিন ব্রহ্মদর্শী ঋষির সহিত সাহস করিয়া বলিতে পারি না— "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"—আমি অন্ধকারের পরপারবর্ত্তী এই জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। যাহা হউক, ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান কিরূপে মানবাত্মায় ক্রমশঃ স্ফুরিত হয়, তাহা জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে কিঞ্চিৎ দেখিতে চেষ্টা করা যাক্।

মানুষ আপনাকে জ্ঞানবান্ কর্ত্তা বলিয়া অনুভব করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অস্ফুটভাবে ঈশ্বরাস্তিত্বে বিশ্বাস করে। 'আমি জানি', 'আমি কর্ত্তা', এই জ্ঞান সমুদায় জ্ঞানের মূলে বর্ত্তমান, আর ঈশ্বর-বিশ্বাস যখন এই জ্ঞানের সহিত জড়িত, তখন ঈশ্বর-বিশ্বাস কোন কালে মানবের অন্তরে ছিল না, এই কথা বলা যায় না। মানুষ আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ব্যক্তিগত জীবনের বাহিরে অন্য কর্ত্তা ও অন্য জ্ঞাতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। যেমন অন্য মানুষ ও নিকৃষ্ট জীবে আত্মার পরিচয় পাইয়াছে, তেমনই জড় জগতেও আত্মার পরিচয় পাইয়াছে। জগতে অবিশ্রাম কার্য্য ও জ্ঞানের প্রকাশ দেখিয়া আদিম মানব আকাশ, বায়ু, জল, বৃক্ষ লতা, প্রাতঃ, সন্ধ্যা, রাত্রি—সমুদায় দেশ, সমুদায় কালকে অসংখ্য দেবাত্মায় পরিপূর্ণ করিয়াছিল। জ্ঞান ছাড়া কর্ত্তা ভাবা তার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। এই যে জ্ঞান-কণিকা

টুকু— যাহা নিজ কর্ত্তৃত্ব-জ্ঞানসাপেক্ষ—এই টুকু সাক্ষাৎ অনুভব-জাত। জ্ঞানের পরিচয়, আত্মার পরিচয়, জ্ঞান ও কার্য্যের সম্বন্ধজ্ঞান, প্রত্যক্ষ দর্শনজাত। অশিক্ষিত চিন্তাহীন মানবেরও এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান টুকু আছে, তাহাতেই তার পক্ষে ব্রহ্মকে জানা ও বুঝা সম্ভব। কিন্তু তার মধ্যে ইহা নানা ভ্রম কুসংস্কারের সহিত জড়িত, এবং এরূপ জড়িত বলিয়াই ইহা ব্রহ্মজ্ঞান নামের উপযুক্ত নহে, ইহা সতেজ ধর্ম্মজীবন উৎপাদনেও উপযোগী নহে।

মানব আদিম সময়েই অস্ফুট আত্ম-জ্ঞান লাভ করিয়া আত্মাকে জগতে বিস্তারিত করিল বটে, কিন্তু আত্মাকে জড়ীয় আবরণ হইতে মুক্ত করিতে না পারিয়া উচ্চতর আত্মজ্ঞান লাভে অসমর্থ হইল, এবং অস্ফুট আত্মজ্ঞান-কণিকাকে ভস্মাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। আত্মাকে জ্ঞানময় জানিয়াও মানব ইহাকে শরীরী বলিয়া ভাবিল, সসীম বলিয়া ভাবিল, জ্ঞানবস্তু যে অশরীরী, অসীম, ইহা বুঝিতে পারিল না। কাজে কাজেই প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দৈব শক্তিকেও শরীরী ও বহু বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। জ্ঞানস্ফুলিঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া রহিল। আদিম সরলতা ক্রমশঃ দূর হইয়া মানব যতই সভ্য হইতে লাগিল, প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে যতই জয়যুক্ত হইতে লাগিল, নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কার্য্যকারিতা যতই উপলব্ধি করিতে লাগিল, ততই তাহার এই ধারণা প্রবল হইতে লাগিল যে, জ্ঞানের অস্তিত্বের পক্ষে শরীর আবশ্যক। এই ধারণা প্রবল হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেবতায় বিশ্বাস তিরো-হিত হইতে লাগিল, প্রাকৃতিক শক্তিকে অশরীরী এবং অশরীরী বলিয়াই অন্ধ অজ্ঞান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই জড়ীকরণ প্রণালী আধুনিক বৈজ্ঞা-নিক চিন্তায় পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক চিন্তা সকল ব্যাপারকেই জ্ঞান-নিরপেক্ষ শক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করে, শক্তির অর্থ কি, শক্তিজ্ঞান কিরূপে লব্ধ হয়,ইহা সেই কথা ভুলিয়া গিয়াছে। যাঁহারা এই জড়ীকরণের প্রভাব অতি-ক্রম করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সেই আদিম অনুভব ক্রমশঃই উজ্জ্বল হইয়াছে। জগৎ কার্য্যের মূলে শরীরী দেবতা দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা দৈবশক্তিতে অবিশ্বাসী হন নাই, বরং তাঁহাদের দৈবশক্তিতে বিশ্বাস পূর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধতর হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, দৈবশক্তি শরীরী নহে, জগতের মূলীভূত জ্ঞান শরীরদ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। যেখানে পূর্ব্বে ভেদ ও বহুত্ব কল্পিত

হইত, সেখানে অভেদ ও একত্ব দেখিয়াও তাঁহাদের লোকাতীত জ্ঞানে অবিশ্বাস জন্মে নাই, বরং সেই বিশ্বাস এক অখণ্ড জগৎ কর্ত্তার বিশ্বাসেই পরিণত হইয়াছে। এই একীকরণ প্রণালী যাঁহারা প্রকৃতরূপে অনুসরণ করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা কেবল জ্ঞানীদের কথা শুনিয়া নহে, কিন্তু নিজ অনুভবদ্বারা বুঝিয়াছেন যে জড়শক্তি বলিয়া কোন শক্তি নাই, শক্তি বলিলেই অবশ্যম্ভাবিরূপে জ্ঞান বুঝায়, জগতের সমস্তই এক আত্মশক্তির অধীন, তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান রাজ্যের একটী প্রশস্ত প্রদেশ অধিকার করিয়াছেন—তাঁহারা সতেজ সরস ব্রহ্মসাধনের সোপানে আরোহণ করিয়াছেন,—তাঁহাদিগকে ব্রহ্মের অন্বেষণে দূরদেশে বা দূরবর্ত্তী চিন্তারাজ্যে যাইতে হয় না, তাঁহারা আহারে বিহারে, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে, প্রকৃতি জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ হস্ত দর্শন করেন।

কিন্তু এই সোপানেও ব্রহ্মজ্ঞান প্রাকৃত বুদ্ধিগত কতিপয় ভ্রান্ত মীমাংসায় জড়িত থাকে। এই সোপানেও জ্ঞানের অসীমত্ব ও অখণ্ডত্ব স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয় না। ব্রহ্ম জগতের একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া উপলব্ধ হন বটে, কিন্তু মনে হয় তাঁহার কার্য্যের একটী ক্ষেত্র আছে, আর সেই ক্ষেত্র তাঁহার অতিরিক্ত। ব্রহ্ম জগৎকার্য্যের কর্ত্তা বটেন কিন্তু তাঁহার কার্য্য কিসের উপর হয়?—জড়ের উপর। কারণত্ব এখনও বিভক্ত,—ব্রহ্ম শক্তির আধার, কার্য্যের প্রেরক, জড় শক্তির গ্রহীতা, কার্য্যের ক্ষেত্র। এই ভেদবুদ্ধি মৌলিক আত্মানুভবের সহিত জড়িত থাকাতে আত্মানুভবকে এখনও ব্রহ্মানুভব বলা যায় না। প্রেরক ও প্রেরিত, চালক ও চালিতের ভেদ বুদ্ধি এখনও ব্রহ্মানুভবকে মলিন করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত শক্তি আত্মাতে আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত সত্তা আত্মগত, আত্মাধীন বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। ক্রমশঃ এই দৃষ্টি খুলে। ক্রমশঃ দেখা যায় আত্মার রাজ্য সর্ব্বব্যাপী। সূক্ষ্ম আত্মদৃষ্টিতে আত্মার প্রকৃত স্বভাব যতই প্রকাশিত হয়, ততই দেখা যায় আত্মরাজ্যের সীমা নাই। যে সমস্ত ব্যাপারকে স্থূল দৃষ্টিতে জড়ীয় বলিয়া বোধ হয়, যে সকল গুণকে অচেতন পদার্থের গুণ বলিয়া বোধ হয়, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সে সমস্তই আত্মার ব্যাপার, আত্মশক্তির প্রকাশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি যে সকল ব্যাপার লইয়া জড়ের জড়ত্ব, প্রস্ফুটিত

আত্মদৃষ্টিতে সে সমস্তই আত্মার আত্মত্বের অন্তর্গত বলিয়া প্রকাশিত হয়। বিষয় বিষয়ী, জ্ঞাতৃ জ্ঞেয়, জড় আত্মা,—ইত্যাকার ভেদ কেবল ব্যবহারিক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এই সমুদায়ের মৌলিক, সত্তাগত, পারমার্থিক ভেদের কল্পনা বিদূরিত হয়। এই অবস্থাতে উপাস্যের সহিত উপাসকের অতি নিগূঢ় ও মধুর যোগ সংস্থাপিত হয়। তিনি আর উপাস্যকে কেবল বহির্জ্জগতে আবদ্ধ রাখেন না, কেবল প্রকৃতিতে, বহির্জ্জগতে, তাহার লীলা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হন না। তাঁহার পক্ষে বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ এক হইয়াছে। তাঁহার পক্ষে সমস্ত কার্য্যই আত্মগত, আত্মার ভিতরকার কার্য্য। উজ্জ্বল সূর্য্যালোক, নক্ষত্র-শোভিত আকাশ, চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, শীতল মলয়ানিল, আহার পান, বিবিধ পারিবারিক ও সামাজিক সম্বন্ধ, পবিত্র সাধু-সমাগম, শাস্ত্রাধ্যয়ন, সঙ্গীত, নিগূঢ় সাধন ভজনের ত কথাই নাই, এই সমস্তই এখন তাঁহার পক্ষে আধ্যাত্মিক ব্যাপার—আত্মায় আত্মায়—জীবাত্মায় পরমাত্মায় সাক্ষাৎ আদান প্রদান। এস্থলে ঐশ্বরিক বিধানের বিশেষত্ব সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়। এই সোপানের সাধকের পক্ষে কিছুই সাধারণ নহে, সকলই বিশেষ। তাঁহার পক্ষে দেশ কালের ব্যবধান নাই। তিনি অনুভব করেন যে অতি দূর দেশে ও কালে যাহা ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে, তাহাও তাঁহার জন্যই ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। যাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর হইতেছে তাহা সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহারই জন্য অভিপ্রেত। তাহা তাঁহারই মুক্তি ও উন্নতির উদ্দেশে ঈশ্বর তাঁহার সম্মুখে আনিয়াছেন। বিধাতা তাঁহাকে লইয়া এমন ভাবে ব্যস্ত যেন জগতে তাঁহার স্নেহ ও যত্নের পাত্র আর কেহ নাই।

কিন্তু এতদূর আসিয়াও সাধকের ব্রহ্মানুভব সম্পূর্ণরূপে আবরণ-মুক্ত না হইতে পারে। যে সোপান বর্ণিত হইল, এখানেও ব্রহ্মস্ফূর্ত্তির একটী ঘোর শত্রু আছে। সে শত্রু অহঙ্কার। আমরা স্থূল অহঙ্কারের কথা বলিতেছি না। স্থূল অহংকারের মূলে একটী সূক্ষ্ম অহংকার আছে যাহা উচ্চ সাধকের ভিতরেও থাকিতে পারে। গূঢ়তম আত্মজ্ঞান ব্যতীত এই অহংকার যায় না। আত্মার প্রকৃতি বিশেষ সূক্ষ্মরূপে না জানিলে এই শত্রুকে ধরা যায় না, এই শত্রুর উপর মৃত্যু-অস্ত্র প্রয়োগ করা যায় না। আরাধনা, নাম জপ, নাম কীর্ত্তন, বিবিধ প্রকার সেবা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ আধ্যাত্মিক সাধনেই অহংকার

নির্জ্জীব, ক্ষীণ বল হয়। কিন্তু আত্মজ্ঞানের সাধন ব্যতীত অহংকারে সমূল বিনাশ অসম্ভব। এখন, মূল কথা এই, এই যে আত্মা, যে আত্মার জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের মূল, যাহার জ্ঞান হইতে শক্তিজ্ঞান হয়, শক্তিতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়, জগৎকে জ্ঞানময়ী শক্তির লীলা বলিয়া বুঝা যায়, যে আত্মার তত্ত্ব তলাইয়া দেখিলে দেখা যায় জড় নামক বস্তু কোন অচেতন স্বাধীন বস্তু নহে, আত্মারই স্বরূপের প্রকাশ,—এই যে আত্মা, সে কি ক্ষুদ্র, সসীম বস্তু? দেশকালে আবদ্ধ বস্তু? খণ্ডাকার বহু বস্তু? স্থূল দৃষ্টিতে তাহাই বোধ হয়। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মা পরস্পর হইতে স্বতন্ত্ররূপে উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইতেছে, পর-মাত্মা তাহাদের হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া তাহাদের ইন্দ্রিয় বোধাদি বিজ্ঞান বিধান পূর্ব্বক তাহাদের সহিত লীলা করিতেছেন,—ইহার উপর আবার কোন কথা আছে বলিয়া সহসা বোধ হয় না। কিন্তু মৌলিক আত্মপ্রত্যয়, আত্মজ্ঞান, প্রচ্ছন্নভাবে সাধকের জীবনে কার্য্য করিয়া এই স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছে। সাধক আপনাকে ক্ষুদ্রদেশে, ক্ষুদ্রকালে, আবদ্ধ কল্পনা করিয়াও প্রতি পদেই দেশকালের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন, সার্ব্বভৌমিক সত্যের আলোচনা করিয়াছেন, অসীম অনন্ত বস্তুর জ্ঞানে অগ্রসর হইয়াছেন। জন্ম মরণ, বিস্মৃতি নিদ্রাশীল ক্ষুদ্র বস্তুর পক্ষে এই সমুদয় কিরূপে সম্ভব হইল, তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। প্রস্ফুটিত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এই রহস্য ভেদ হয়। ক্রমশঃ দেখা যায়, বুঝা যায়, যে, যে ভেদবশতঃ আত্মজগৎ আপাততঃ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, সে ভেদও আত্মাশ্রিত ব্যাপার, সুতরাং আত্মার ভেদসাধনে অসমর্থ। যে প্রাচীর গৃহ ও গৃহের বহির্দ্দেশকে ভিন্ন করিতেছে, সে প্রাচীর যখন আকাশস্থিত, আকাশাশ্রিত, তখন ইহা আকাশের ভেদ সাধনে অক্ষম। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগত জীবনের অন্তর্গত বিষয় সমূহ পরস্পর হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, এবং অধিকাংশ বিষয়ই সসীম ব্যক্তিগত জীবন হইতে স্বতন্ত্র-রূপে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সমুদায়ই আত্মাশ্রিত। যে আবরণ কথিত ভেদের কারণ, সেই আবরণও আত্মাশ্রিত। আবরণ যাঁহার আশ্রিত, তিনি আবরণশূন্য। ভেদ যাঁহার আশ্রিত তিনি অভেদ। বহুত্ব যাঁহার আশ্রিত তিনি বহু নহেন, এক; সীমা যাঁহার আশ্রিত, তিনি অসীম। আর, তিনি প্রত্যেকের আত্মারূপে বর্ত্তমান আছেন বলিয়াই আমরা ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে

সসীম হইয়াও বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাবলে এই অভেদ, অদ্বৈত, অসীম বস্তুকে সাক্ষাৎ ভাবে জানিতেছি। এই অভিজ্ঞতাতে সাধকের প্রজ্ঞাচক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। উপাস্য উপাসকের সমুদায় ব্যবধান বিদূরিত হয়। অতঃপর সাধককে আর উপাস্যের অন্বেষণ করিতে হয় না, তিনি তাঁহার আত্মারূপে প্রকাশিত। কিন্তু সাধনার শেষ এখানে নহে, বরং প্রকৃত সাধনার এখানে আরম্ভমাত্র। ব্রহ্মজ্ঞান স্ফূর্ত্তির ক্রম মাত্র সংক্ষেপে দেখান হইল। জ্ঞানের এবং জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে প্রীতি ও সেবার পরিপক্কতা-সাধন চিরজীবন-সাপেক্ষ।

ব্রহ্ম-সগুণ ও নির্গুণ।

ব্রহ্ম সগুণ কি নির্গুণ, অথবা উভয়ই, ইহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে 'গুণ' শব্দের অর্থ নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। 'গুণ' সাংখ্য শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। দেখা যাক্ সেখানে ইহার অর্থ কি? সাংখ্য শাস্ত্রে সমগ্র অস্তিত্ব প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত। প্রকৃতি মূলে অচেতনা, তবে তিনি পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ এক প্রকার প্রতিফলিত চৈতন্য প্রাপ্ত হন। প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা, কিন্তু সেই ক্রিয়াশীলতাও পুরুষ-সান্নিধ্যের ফল। পুরুষ সচেতন ও নিষ্ক্রিয়। প্রকৃতি এক, পুরুষ বহু। সমগ্র বিষয়-জগৎ প্রকৃতির কার্য্য, প্রকৃতির বিকার, প্রকৃতির রূপ। পুরুষ অবিকার্য্য, তাঁহার কোন কার্য্য নাই, কিন্তু ভ্রমবশতঃ কোন কোন শ্রেণীর কার্য্যকে তাঁহার বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, জগতের কারণরূপিণী এই যে প্রকৃতি, তিনি মহাপ্রলয়ের সময়ে যখন তাঁহার সমস্ত কার্য্য সংহরণ করেন, তখন সৃষ্টিকালীন বিচিত্রতার অভাবে তাঁহার কোন লক্ষণা করা যায় না। যেখানে বস্তুতে বস্তুতে বিভিন্নতা নাই, সাদৃশ্য নাই, তুলনা নাই, সেখানে লক্ষণা সম্ভব নহে। তখন কেবল তাঁহাকে সমগ্র বস্তুর শক্তিরূপিণী বলা যাইতে পারে। কিন্তু তখনও সমগ্র বস্তুই অব্যক্ত ভাবে বীজাকারে তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এই অব্যক্ত শক্তি যখন সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্যক্তভাব ধারণ করিতে থাকেন, তখন

তন্মধ্যে তিনটী মৌলিক গুণের ভেদ করা যায় ; সেই তিনটী গুণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই গুণত্রয় শক্তিরূপিণী প্রকৃতির তিনটী বিকার বা রূপ, তিনটী শক্তি। সমগ্র বিষয় জগৎই এই তিন শক্তির কার্য্য। সর্ব্বত্রই এই তিন শক্তি পরস্পর-মিশ্রিত ভাবে কার্য্য করিতেছে। যে শক্তি প্রভাবে বুদ্ধিতে জ্ঞানের প্রকাশ হয়, বস্তুর সত্য ভাব প্রতিভাত হয় ও হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহার নাম সত্ত্বগুণ। যে শক্তিতে অন্তঃকরণ বিশেষ বিশেষ বস্তুতে অনুরক্ত হয়, সুতরাং অপর বস্তুতে দ্বেষযুক্ত হয়, এবং এরূপ রাগদ্বেষগ্রস্ত মোহপ্রাপ্ত পুরুষ অসংযত ভাবে কর্ম্ম চক্রে ঘূর্ণায়মান হয়, সেই শক্তির নাম রজোগুণ। যে শক্তিতে জ্ঞানের বিকাশ হইতে দেয় না, যাহাতে জড়তা ও মোহ উৎপাদন করে, তাহার নাম তমোগুণ। গুণত্রয়ের এই ব্যাখ্যাতে দেখা যায় যে প্রত্যেক গুণই পুরুষের সম্বন্ধে—পুরুষের সহিত যোগের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া—বর্ণিত হইয়াছে। পুরুষ-সম্পর্কের বাহিরে গুণ গুলি কি, তাহাদের কার্য্য কি, তাহা বলা হয় নাই। ইহার কারণ কি তাহা পূর্ব্বেই ইঙ্গিতীকৃত হইয়াছে। কেবল পুরুষ সান্নিধ্যেই প্রকৃতির কার্য্য সম্ভব। সাংখ্য নিরীশ্বর হইয়াও জড়বাদী নহেন। কোন পুরুষ নাই, অথচ প্রকৃতি কার্য্য করিতেছে, নানা বস্তু উৎপাদন করিতেছেন, ইহা সাংখ্যদর্শন-বিরুদ্ধ। জগৎ পুরুষে পরিপূর্ণ। আকাশ, পাতাল, সমুদ্র, ভূমি, সমুদয়,—দেবতা, মানব প্রভৃতি নানা শ্রেণীর অসংখ্য জীবের বাস। সুতরাং জগতের সমস্ত কার্য্যই পুরুষ প্রকৃতির পরস্পর যোগের ফল। কাজেই গুণত্রয়ের সমস্ত কার্য্য পুরুষ সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে।

এই গুণবিজ্ঞান বেদান্ত শাস্ত্রের অঙ্গীভূত না হইলেও ইহা সেই শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে, পরন্তু ইহার মূল কথা সেই শাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। জগতের কারণরূপিণী অব্যক্তা শক্তি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনরূপে ব্যক্ত হয়, এই কথা বৈদান্তিক গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভেদ এই—যে প্রভেদ সাংখ্য বেদান্তের মৌলিক প্রভেদ—যে, সাংখ্যের স্বতন্ত্রা প্রকৃতি বেদান্তে স্বতন্ত্রা নহেন, বেদান্তে তিনি পরম পুরুষের অধীন। কেবল কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অধীন নহেন, সত্তা সম্বন্ধেও অধীন। তিনি পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র কিছুই নহেন, তিনি সেই শক্তিমানের শক্তি মাত্র। কিন্তু শক্তি ও শক্তিমানে কোন স্বাতন্ত্র্য না

থাকিলেও কিছু ভেদ আছে। বিষয় বিষয়ীতে যে ভেদ, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়েতে যে ভেদ, কর্ত্তা ও কার্য্যে যে ভেদ, পরম পুরুষ ও প্রকৃতিতে, অথবা অন্য কথায়, পরমেশ্বর ও পরমেশ-শক্তিতে, সেই ভেদ। বেদান্ত মতে বিষয় বিষয়ীর অধীন, জ্ঞেয় জ্ঞাতার অধীন। বিষয়ীকে ছাড়িয়া বিষয়ের, জ্ঞাতাকে ছাড়িয়া জ্ঞেয়ের কোন সত্তা নাই। সুতরাং সমগ্র বিষয়-জগৎ, জ্ঞেয় জগৎ, পরমেশ্বরের আশ্রিত। কিন্তু তাই বলিয়া যে বিষয় বিষয়ীতে, পরমেশ্বর ও জগতে, কোন প্রভেদ নাই তাহা নহে। জগৎ দেশ কালের অধীন. ইহাতে দেশ কালের সীমা আছে, ভেদ আছে। এই বস্তু সেই বস্তু নহে, এই স্থান সেই স্থান নহে. এই ঘটনা সেই ঘটনা নহে, আজ কাল্ নহে ইত্যাদি। এরূপ অবচ্ছেদ, এরূপ বিভাগ ছাড়া জগতের কোন বস্তু ভাবা যায় না। প্রকৃতির মৌলিক গুণত্রয়েও এই অবচ্ছেদ রহিয়াছে। সত্ত্ব রজঃ নহে, রজঃ তমঃ নহে ; গুণত্রয় পরস্পরে ভিন্ন, পরস্পরের দ্বারা সীমাবদ্ধ। জগতের বস্তু মাত্রই সসীম। "সমগ্র জগৎ" বলিলেও সসীম বস্তুই বুঝায়। "সমগ্র" কথাটীতে যোগ বুঝায়, সংকলন বুঝায়। যোগ, সংকলন, কেবল সসীম বস্তুরই হইতে পারে, আর সংকলিত বস্তুর সংখ্যা ও পরিমাণ যতই অধিক হউক না কেন, সসীম বস্তুর সংকলনে কেবল সসীম সমষ্টিই উৎপন্ন হইতে পারে। অপর দিকে, পরমেশ্বর অসীম, অনন্ত। বিষয় পরার্থ, পরাধীন, বিষয়ীর অধীন ; পরমেশ্বর স্বাধীন, স্বতন্ত্র, তাহার সত্তা আর কিছুর অপেক্ষা রাখে না। দেশ প্রকৃতার্থে অসীম নহে, কারণ দেশের অতীত এমন কিছু আছে. দেশ যাহার অধীন ; ইহা পরমাত্মার অধীন। তিনি দেশের আশ্রিত নহেন, দেশ তাঁহার আশ্রিত। তিনি দেশে নহেন,. দেশ তাঁহাতে। তেমনি কালও অসীম নহে, কারণ ইহা ইহার অতীত যে পরমাত্মা তাঁহার অধীন। পরমাত্মা কালে নহেন, কাল পরমাত্মাতে। তেমনি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই প্রাকৃতিক গুণত্রয় স্বাধীন স্বতন্ত্র নহে, ইহারা পরমেশ্বরের অধীন। তিনি আশ্রয়রূপে থাকাতে সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের কার্য্য চলিতেছে। ইহারা সসীম, তিনি ইহাদের অসীম আশ্রয়।

শক্তি ও শক্তিমানে প্রভেদ কি,—প্রকৃতি পরমেশ্বরের শক্তি হইয়াও কি অর্থে পরমেশ্বর নহে, এখন তাহা কথঞ্চিৎ বুঝা যাইবে। শক্তি ও শক্তিমানের

প্রভেদ বুঝিলে এই কথার অর্থও বুঝা যাইবে যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ পরমেশ্বরের গুণ নহে, পরমেশ্বরের শক্তির গুণ। পরমেশ্বর অখণ্ড দেশাতীত, অথচ, তাঁহার এমন এক শক্তি আছে যদ্দ্বারা তিনি দেশগত জগতের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড, এখান, সেখান, ইহা, তাহা, সৃষ্টি করিয়াছেন বা করিতেছেন। তিনি কালাতীত, নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, অবিকার্য্য, অথচ তাঁহার শক্তিতে কালরূপ প্রবাহ, —বর্ত্তমান ভূত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা-প্রবাহ—প্রবাহিত হইতেছে। তিনি একমাত্র পরিপূর্ণ বস্তু ; তাঁহার অতীত অপর কিছুই থাকিতে পারে না, অথচ তাঁহারই শক্তি বিকৃত, রূপান্তরিত হইয়া পরস্পর হইতে ভিন্ন নানা বস্তু রূপে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি নিত্য প্রকাশস্বরূপ, নিস্তরঙ্গ আনন্দস্বরূপ, তাঁহার পক্ষে প্রকাশিত হওয়া, নিরানন্দ হইতে আনন্দের অবস্থায় আসা—এরূপ কথা ঠিক খাঁটে না ; অথচ তাঁহার শক্তির সত্ত্ব গুণের কার্য্যই হচ্ছে জ্ঞান প্রকাশিত করা, আনন্দের উদ্রেক করা। সুতরাং নিত্য প্রকাশ-স্বরূপ নিত্যানন্দময় যে সত্ত্বগুণের অধীন নহেন, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। তেমনি, অপর কোন বস্তুতে আসক্ত হওয়া ও সেই আসক্তির বশে, অথবা সেই আসক্তির বিপরীত বিরক্তির বশে, কার্য্য করা যে পরমেশ্বরের পক্ষে অসম্ভব, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। অথচ ঐশী শক্তির রজোগুণের কার্য্যই হচ্ছে ঐরূপ আসক্তি বিরক্তি ও তজ্জনিত কার্য্য উৎপাদন করা। পুনশ্চ, পরমেশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ; অথচ তমোগুণের কার্য্যই অজ্ঞান ও দুঃখ উৎপাদন করা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পরমেশ্বর তমোগুণের অতীত, অথচ তাঁহার শক্তি তমোগুণাক্রান্ত। মোট কথা এই বুঝা যাইতেছে যে পরমেশ্বরের শক্তি পরমেশ্বরের অধীন হইলেও, তাঁহা হইতে অস্বতন্ত্র হইলেও, তিনি ও তাঁহার শক্তির মধ্যে প্রভেদ অপরিহার্য্য, এবং এই প্রভেদের ফল এই দাঁড়ায় যে পরমেশ্বর স্বয়ং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ের অতীত, কিন্তু তাঁহার শক্তি এই গুণত্রয়যুক্ত।

"ব্রহ্ম সগুণ কি নির্গুণ, অথবা উভয়ই ?"—এই প্রশ্নের অর্থ কি তাহা এখন বুঝা যাইতেছে। প্রশ্নের উত্তর কিরূপ হইবে, তাহারও বোধ হয় কিছু আভাস পাওয়া যাইতেছে। এখন প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরান্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

শক্তি ও শক্তিমানের, জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ যত দূর সম্ভব বুঝিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। এরূপ বুঝা হইতেই কেবল বর্ত্তমান প্রশ্নের উত্তর বাহির হইতে পারে। 'এই সম্বন্ধ কিছুই বুঝিনা' এই কথা বলা নিরর্থক। কিছুই যদি না বুঝ তবে বিশ্বাস কর কিরূপে? কর্ত্তা ও কর্ম্মের সম্বন্ধ কিছু না বুঝিলে কর্ত্তায় বিশ্বাস করা অসম্ভব। আধার আধেয়ের সম্বন্ধ কিছু না বুঝিলে আধারে বিশ্বাস করা অসম্ভব। জগৎ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ কিছু না বুঝিলে ঈশ্বরকে জগদাধার ও জগৎকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করা অসম্ভব। অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাসই অসম্ভব। বুঝিবার উপায়, জ্ঞান গৃহের চাবি, আমাদের হস্তেই রহিয়াছে। ঈশ্বর আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে জ্ঞাতৃরূপে প্রকাশিত। তাঁহার এই জ্ঞাতৃরূপ প্রকাশ হইতে আমরা জ্ঞাতৃ ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিতেছি। তাঁহার এই সাক্ষাৎ প্রকাশ হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি তিনি অন্যত্র কি ভাবে প্রকাশিত। তিনি আমাদের অভিজ্ঞতায় কর্ত্তৃরূপে প্রকাশিত। তাঁহার এই সাক্ষাৎ কর্ত্তৃরূপ প্রকাশ হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি তিনি অন্যত্র কি ভাবে কর্ত্তৃরূপে প্রকাশিত। আমরা দেখিতে পাইতেছি জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের সম্বন্ধ, কর্ত্তা কর্ম্মের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের সম্বন্ধ এমন ঘনিষ্ঠ যে জ্ঞেয়ের পক্ষে জ্ঞাতাকে ছাড়িয়া থাকা অসম্ভব। জ্ঞেয় বস্তু কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানেই প্রকাশিত হয়, এবং কেবল জ্ঞেয় রূপেই ইহার অস্তিত্ব চিন্তা ও বিশ্বাস করা যায়। ইহাতে থাকা আর জ্ঞানে থাকা একই কথা। জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত না করিয়া ইহার সম্বন্ধে কোন লক্ষণাই করা যায় না। অতএব বিষয় সম্পূর্ণরূপেই পরাধীন। ইহা জ্ঞানের অধীন, জ্ঞাতার অধীন। ইহা যে জ্ঞানরূপ জ্যোতিতে প্রকাশিত সেই জ্যোতিঃ ইহার নিজস্ব নহে, ইহা পরের বস্তু। অপর দিকে জ্ঞাতা ও জ্ঞানেই প্রকাশিত, জ্ঞানের কর্ত্তা রূপে প্রকাশিত, কিন্তু এই জ্ঞানজ্যোতি অন্য হইতে প্রাপ্ত নহে, ইহা ইহার নিজস্ব বস্তু, ইহার নিজস্বরূপ। ইহা ইহার নিজজ্যোতিতে নিজের নিকট প্রকাশিত। সুতরাং বিষয় ও বিষয়ী পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইলেও এই সম্বন্ধের দুই দিক্ সমান নহে। বিষয়ী স্পষ্টতঃই বিষয় হইতে শ্রেষ্ঠ। বিষয় পরার্থ, বিষয়ী স্বার্থ। বিষয় পরাধীন, বিষয়ী স্বাধীন। বিষয় অন্যের জ্যোতিতে প্রকাশিত, বিষয়ী নিজ জ্যোতিতে প্রকাশিত, স্বয়ংপ্রভ। সুতরাং বিষয় বিষয়ীর অধীন

বটে, কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে না যে বিষয়ীও বিষয়ের অধীন। বিষয়ীর এমন একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাব আছে যাহা বিষয়ের অধীন নহে। বিষয় ব্যতীত বিষয়-জ্ঞান হয় না. ইহাতে আর সন্দেহ কি, বিষয়জ্ঞান নিশ্চয়ই বিষয়-সাপেক্ষ; কিন্তু বিষয়ী বিষয় জ্ঞানে আবদ্ধ নহে; সে যে কেবল বিষয়কে জানে তাহা নহে, সে আপনাকেও জানে এবং আপনাকে জানে বলিয়াই বিষয়কে জানে। আপনাকে বিষয় হইতে ভিন্নরূপে, বিষয়ের বিপরীতস্বভাব-যুক্ত বলিয়াই জানে। যে রকম জ্ঞানই হউক, জ্ঞান ব্যাপারটাই এমন যে জ্ঞাতা আপনাকে জ্ঞেয় হইতে স্বতন্ত্র, স্বাধীন, বিপরীত স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া না জানিলে, জ্ঞান সিদ্ধ হয় না। দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। আমি এই পুস্তিকা খানিকে জানিতেছি। ইহাকে জানিতে গিয়া আমি আপনাকে ইহার জ্ঞাতা বলিয়া জানিতেছি। ইহা জ্ঞানের অধীন সন্দেহ নাই। ইহাকে কেবল জ্ঞেয় বলিয়াই ভাবা ও বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু আমি ইহার অধীন, এই কথা বলিতে পারি না। বলিতে পারি না কেবল এই অর্থে নয় যে আমি ইহা ছাড়া আরো অনেক বস্তু জানি, কিন্তু আরো গম্ভীর অর্থে। আমি ইহার অধীন হইলে ইহাকে জানিতেই পারিতাম না। আমি ইহার অধীন হইলে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের ভেদই করিতে পারিতাম না, আর জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের ভেদ না হইলে জ্ঞানই সিদ্ধ হয় না। আমি আপনাকে ইহা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিতেছি। ইহা দেশে আবদ্ধ, আমি দেশে আবদ্ধ নই। ইহা খণ্ডশীল, আমি অখণ্ড। ইহা নানা পরিবর্ত্তনশীল. আমি সেই সকল পরিবর্ত্তনের সাক্ষী অপরিবর্ত্তনীয় জ্ঞানবস্তু। দেশগত জগৎ সম্বন্ধে যেমন, কালগত জগৎ সম্বন্ধেও তেমনই। আমি ঘটনাকে জানিতে গিয়া আপনাকে ঘটনা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানি। ঘটনা আমার অধীন বটে, কিন্তু আমি ঘটনার অধীন নহি। আমি ঘটনার অধীন হইলে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাইতাম, ঘটনাকে জানিতে পারিতাম না। এই যে শব্দ-পরম্পরা আমি উৎপাদন করিতেছি, ইহা আমার অধীন বটে, কিন্তু আমি ইহার অধীন নহি, আমি ইহার অধীন হইলে ইহা উৎপাদনও করিতে পারিতাম না, শুনিতেও পাইতাম না। দেশ কাল সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, সংখ্যা ও পরিমাণ সম্বন্ধেও তাহাই ঠিক। আমি সম্মুখস্থ বহু বস্তু জানিতেছি। আমি এই সকলের ন্যায় বহু হইলে আর এই

সকলকে বহু বলিয়া জানিতে পারিতাম না। বহু বস্তুকে বহু বলিয়া জানিতে হইলে জ্ঞাতাকে এক হওয়া চাই, অর্থাৎ বহুত্বের অতীত হওয়া চাই। তেমনি ছোট ও বড় বস্তুকে ছোট ও বড় বলিয়া জানিতে হইলে, অর্থাৎ ছোট ও বড়কে পরস্পর তুলনা করিতে হইলে উভয়ের অতীত হওয়া চাই। যে তুলিত বস্তুর অধীন সে তুলনায় অক্ষম।

ব্রহ্ম কি অর্থে নির্গুণ, এখন তাহা কতকটা বুঝা যাইবে। উপরি-উক্ত ব্যাখ্যার 'বিষয়', 'দেশ', 'কাল', 'সংখ্যা' ও 'পরিমাণ' প্রভৃতি শব্দের স্থলে 'প্রকৃতি', 'গুণ', 'সত্ত্ব', 'রজঃ', 'তমঃ' প্রভৃতি শব্দ এবং 'বিষয়ী' ও 'আত্মার' স্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহার করিলেই ব্রহ্মের নির্গুণত্ব বোধগম্য হইবে। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক গুণ সমূহ ব্রহ্মের আশ্রিত, ব্রহ্মের সহিত সংবদ্ধ বটে, কিন্তু ব্রহ্ম প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক গুণের অধীন নহেন। তিনি স্বতন্ত্র স্বাধীন। তাঁহার মূল স্বরূপ সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক কিছুই নহে। তিনি গুণ ত্রয়ের অতীত বলিয়াই গুণত্রয়কে আশ্রয় দিতে পারিয়াছেন। তিনি গুণের অধীন হইলে, তাঁহার মূল স্বরূপ গুণযুক্ত হইলে, তিনি গুণের আশ্রয়, গুণের অবভাসক, গুণের পোষণকর্ত্তা হইতে পারিতেন না। তিনি গুণের আশ্রয় ও পোষক বলিয়াই গুণাতীত, নির্গুণ। সত্ত্বগুণের কার্য্য বুদ্ধিরূপ সসীমাধারে জ্ঞান ও আনন্দ প্রতিবিম্বিত করা। এই প্রতিবিম্ব সম্ভব হইতে গেলে অপ্রতিবিম্বিত স্বয়ংপ্রভ স্বপ্রতিষ্ঠিত মূল জ্ঞান ও আনন্দ আবশ্যক। অর্থাৎ এমন জ্ঞান ও আনন্দ আবশ্যক যাহার উপর সত্ত্ব গুণের অধিকার নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে মূল জ্ঞান ও আনন্দকে সাত্ত্বিক বলা যাইতে পারে না, সগুণ বলা যাইতে পারে না, তাহা নির্গুণ। তেমনি রজোগুণাত্মক আসক্তি, বিরক্তি ও তজ্জনিত কর্ম্মবন্ধন সম্ভব হইতে গেলে এই সমুদায়ের মূলে অনাসক্ত, অবিরক্ত ও কর্ম্মবন্ধনের অতীত আত্মা থাকা আবশ্যক। মূলে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব পরমাত্মা না থাকিলে অপবিত্রতা ও বন্ধনের কোন অর্থই থাকিতে পারে না। সুতরাং রজোগুণের আশ্রয় যিনি তিনি রজোগুণের অতীত, বিরজঃ, নির্গুণ। পুনশ্চ তমোগুণের কার্য্য অজ্ঞান এবং মোহও কেবল জ্ঞানের সত্তায়ই সত্তাবান্। জ্ঞান না থাকিলে জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে জ্ঞানকে অজ্ঞানাত্মক ও মোহাত্মক

বলা যাইতে পারে না। জ্ঞান সুখ তমোগুণের অতীত, অতমঃ, নির্গুণ। এই রূপে দেখা যায়, ব্রহ্মের মূল অনন্ত, অনবচ্ছিন্ন স্বভাব গুণত্রয়ের অতীত, অর্থাৎ নির্গুণ।

কিন্তু ব্রহ্মের মূল স্বরূপ গুণস্পর্শের অতীত হইলেও ব্রহ্ম গুণের সহিত অসংযুক্ত নহেন। তিনি যখন গুণের আশ্রয়, গুণের অবভাসক, গুণ যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, কার্য্যও করিতে পারে না, গুণ যখন তাঁহারই শক্তির বিকার, তখন তাঁহাকে আর কিরূপে গুণের সহিত অসম্পর্কিত বলা যায়? তাঁহার সত্তা, তাঁহার চিৎ বা জ্ঞান এবং তাঁহার আনন্দ, তাঁহার সৎচিৎ ও আনন্দাত্মক স্বরূপ, যাহা তিন ভাবে বর্ণিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে একই—সেই মূলস্বরূপ গুণাতীত, নির্গুণ হইলেও যখন ইহার আশ্রয়ে গুণাত্মক কার্য্য—সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের কার্য্য-ঘটিতেছে, তখন এই কার্য্যকে তাঁহারই কার্য্য বলিতে হইতেছে, এবং তাঁহার সচ্চিদানন্দরূপ মূলস্বরূপ অবিকার্য্য, নিশ্চল, অপরিবর্ত্তনীয়, সুতরাং নিষ্ক্রিয় হইলেও তাঁহাকে এক অর্থে সক্রিয়, সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল বলিতে হইতেছে। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তাঁহাকে স্বরূপের দিক হইতে নির্গুণ বলিয়াও শক্তির দিক্ হইতে সগুণ বলিতে হইতেছে। সগুণ অর্থ গুণের সহিত বর্ত্তমান, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়ের সহিত সংযুক্ত। ব্রহ্মের এই যে দুই ভাব, স্বরূপ ও শক্তি, নির্গুণ ও সগুণ ভাব, এই দুয়ের কোনটীই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু যখন নাই, বস্তু মাত্রই যখন ব্রহ্মাশ্রিত, ব্রহ্মের অঙ্গীভূত, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে শক্তিরূপী ব্রহ্মই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ ধারণ করিয়া প্রতিভাত হন, গুণাত্মক বিবিধ বস্তু রূপে পরিণত হন। প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক জীব, এবং সমগ্র জগৎ এই শক্তিরূপী ব্রহ্মের পরিণাম, রূপ বা মূর্ত্তি। যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত জগতের প্রকৃত সম্বন্ধ জানেন না, পরম্পরা-প্রাপ্ত, অপরীক্ষিত, অচিন্তিত বিশ্বাসই যাঁহাদের এক মাত্র সম্বল, তাঁহারা স্বভাবতঃই এরূপ ভাষায় আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা এই সম্বন্ধ কিয়ৎ-পরিমাণেও বুঝিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা জগৎকে ঐশী শক্তির পরিণাম, ঐশী শক্তির রূপ বলিয়া জানিয়াছেন তাঁহারা এরূপ ভাষা নিরাপত্তিতে গ্রহণ

করিবেন, সন্দেহ নাই। জড়ের জড়ত্ব বুদ্ধি যাঁহাদের দূর হইয়াছে, জীবের স্বাতন্ত্র্য বোধ যাঁহাদের তিরোহিত হইয়াছে, যাঁহাদের চিন্তা সসীমের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অসীমে প্রসারিত হইয়াছে, তাঁহারা জগতের কোন বস্তুকেই ঈশ্বরের আবির্ভাব, ঈশ্বরের রূপ বলিতে সঙ্কুচিত হইবেন না, বরং এরূপ না বলাতে, না ভাবাতে, তাঁহাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস-স্ফূর্তির বিশেষ ব্যাঘাত হইবারই কথা ; অথচ এরূপ ভাবনাতে তাঁহাদের বিশ্বাস ও উপাসনায় পৌত্তলিকতা দোষ স্পর্শের কোন সম্ভাবনাই নাই। পৌত্তলিক অসীমকে না জানিয়া, অথবা অসীমকে অগ্রাহ্য করিয়া, সসীমের উপাসনা করে। সগুণ ব্রহ্মের উপাসক নির্গুণ ও সগুণকে এক জানিয়া, অসীমকে সসীমে প্রকাশিত জানিয়া, অসীমেরই পূজা করেন।

ব্রহ্ম যদি নির্গুণ সগুণ উভয়ই হইলেন, তবে শাস্ত্রে সগুণের উপর নির্গুণের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে কেন? উপরি-উক্ত আলোচনার পর এই প্রশ্নের উত্তর সহজ। নির্গুণভাব স্বরূপাত্মক, সগুণভাব শক্ত্যাত্মক। স্বরূপ ও শক্তির প্রভেদ ও তারতম্য উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্বরূপ অসীম ; কিন্তু শক্তির সীমা অনির্দ্দেশ্য অভাবনীয় হইলেও শক্তিকে ঠিক অসীম বলা যায় না। ইহাকে অসীম বলিতে হইলে এই 'অনির্দ্দেশ্য', 'অভাবনীয়' অর্থেই অসীম বলা যায়। ইহার সহিত দেশ, কাল, সংখ্যা ও পরিমাণের নিত্য সম্বন্ধ। এই সকল গুণ যখন প্রকৃতার্থে অসীম নহে, তখন শক্তিও প্রকৃতার্থে অসীম নহে। কার্য্য দ্বারাই শক্তি অনুমিত হয় ; কার্য্য না ভাবিয়া শক্তি ভাবা যায় না। কার্য্য আছে বলিয়াই ভাবিতে হয় শক্তি আছে। কিন্তু কার্য্যের পরিমাণ অনির্দ্দেশ্যরূপে বৃহৎ হইলেও ইহার প্রকৃতিতেই সসীম ভাব বর্ত্তমান, সুতরাং শক্তির ভিতরেও এই সসীম ভাব অবশ্যম্ভাবিরূপে বর্ত্তমান। নির্গুণ ও সগুণের তারতম্য এস্থলে। যাহা হউক সগুণ ভাবনা, সগুণ সাধনা কোন প্রকারেই অগ্রাহ্য নহে। ইহা সাধনার প্রশস্ত পথ। যাঁহারা নির্গুণ ভাবের একান্ত পক্ষপাতী তাঁহারাও সগুণ ভাবনাকে একবারে অগ্রাহ্য না করিয়া ইহাকে নির্গুণ সাধনার সোপান রূপে গ্রহণ করেন। যাহা হউক, সাধনা সম্বন্ধে এ স্থলে আমি সময়াভাবে কিছুই বলিতে প্রয়াস পাইলাম না।

সকল শ্রেণীর ব্রহ্মসাধকই কোন না কোন ভাবে ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ

উভয় ভাব স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ 'সগুণ' 'নির্গুণ' এই শব্দ দ্বয়ের প্রকৃত শাস্ত্রীয় অর্থ না জানিয়া ভাষায় কোন না কোন ভাব অস্বীকার করিয়াছেন। যথা, কেহ কেহ 'নির্গুণ' অর্থ "জ্ঞান মঙ্গলাদি স্বরূপ লক্ষণবিহীন" মনে করিয়া ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব অস্বীকার করেন। কিন্তু 'নির্গুণের' প্রকৃত অর্থ যাহা, প্রকৃত ভাব যাহা, অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত, গুণত্রয়ের সীমাতীত, এই ভাব পরমেশ্বরে আরোপ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না, অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে নির্গুণ ভাব স্বীকার করেন। পুনশ্চ, যাঁহারা জড় ও জীব জগৎকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র স্বাধীন মনে করেন, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের সগুণ ভাব অস্বীকার করেন। জগৎকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মানিলে ঈশ্বরবাদেই আঘাত পড়ে, সুতরাং কোন ঈশ্বরবাদী সুসঙ্গতরূপে এরূপ মত পোষণ করিতে পারেন না। যাঁহারা এরূপ মত পোষণ করেন তাঁহাদিগকে প্রকৃতার্থে ব্রহ্মবাদী বলা যাইতে পারে না। ব্রহ্মবাদিমাত্রকে কোন না কোন প্রকারে ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এক শ্রেণীর দার্শনিক, যাঁহাদিগকে মায়াবাদী বলা হয়, তাঁহারা সগুণ ভাবকে একবারে অস্বীকার না করিয়া ইহাকে সত্যতা সম্বন্ধে অত্যন্ত নিম্ন স্থান দেন। ইউরোপে স্পিনজা এবং এদেশে শঙ্করাচার্য্য এই মতাবলম্বীদিগের মধ্যে প্রধান। এই মতে সগুণ ভাব মায়াশক্তির ফল। সত্ত্বাদি গুণত্রয় যে শক্তির বিকার, এই শক্তির অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার না করিলেও ইঁহারা বলেন যে, এই শক্তির স্বভাব এই যে ইহা মিথ্যা ব্যাপার সকল উৎপাদন করে। গুণাত্মক ব্যাপার গুলিকে মিথ্যা বলাতে যে কিছু অর্থ আছে, তাহা আমি স্বীকার করি। কেন স্বীকার করি তাহা যথেষ্ট সময় ও সুবিধা পাইলে বলিতে পারি। কিন্তু শক্তিটার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া শক্তির রূপ বা বিকার গুলিকে মিথ্যা বলায় কোন লাভ দেখি না। যাহা হউক, এই মিথ্যাত্বকেও ইঁহারা বন্ধ্যাপুত্রাদির একান্ত মিথ্যাত্ব হইতে পৃথক করেন, সুতরাং মত ব্যাখ্যার দোষ যাহাই থাক্, ইঁহারা যে কার্য্যতঃ সগুণ নির্গুণ উভয় ভাব স্বীকার করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এ স্থলে আমার সগুণ নির্গুণের মৌলিক ব্যাখ্যা শেষ হইল। আমার ব্যাখ্যা কত দূর শাস্ত্র সম্মত—ব্রহ্মবিষয়ক উচ্চ সাহিত্য-সম্মত—তাহা আমি এই

ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে বলিবার অবকাশ ও সুবিধা পাই নাই। এখনও ইচ্ছানুরূপ শাস্ত্রোদ্ধার করিতে পারিব না। তবে অবকাশ ও সুবিধার অভাবেও কিয়ৎ-পরিমাণে শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধৃত করা আবশ্যক বোধ করিতেছি।

১। প্রকৃতি ও গুণত্রয় সম্বন্ধে সাংখ্য সূত্রে আছে:—"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ", বিষয়াধ্যায়, ৫৯ সূত্র। অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। পুনশ্চ "প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈর্গুণানামন্যোন্যং বৈধর্ম্ম্যম্", ১২৫ সূত্র। অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও মোহ প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ের বিধর্ম্মিতা অর্থাৎ প্রভেদ বুঝিতে হইবে।

২। গুণত্রয় সম্বন্ধে ভগবদ্গীতার বর্ণনা অতি পরিষ্কার। যথা, চতুর্দ্দশাধ্যায়ে—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্য নিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥ ৫—১৩।

অর্থাৎ—হে মহাবাহো, প্রকৃতি-সম্ভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ আত্মাকে দেহে আবদ্ধ করে। হে অনঘ, তন্মধ্যে নির্ম্মলত্ববশতঃ প্রকাশক ও দুঃখশূন্য সত্ত্বগুণ আত্মাকে সুখ ও জ্ঞানের সহিত আবদ্ধ করে। হে কৌন্তেয়, রজঃ গুণকে তৃষ্ণা ও আসক্তি-সম্ভূত এবং রাগাত্মক বলিয়া জানিবে; উহা আত্মাকে কর্ম্মের সহিত আবদ্ধ করে। হে ভারত, তমঃ গুণকে অজ্ঞানজাত ও সকল আত্মার মোহনকর বলিয়া জানিবে; উহা প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রার সহিত আবদ্ধ করে। হে ভারত, সত্ত্বগুণ সুখে আসক্ত করে, রজঃ কর্ম্মে আসক্ত করে, পক্ষান্তরে, তমোগুণ জ্ঞান আবৃত করিয়া প্রমাদে আসক্ত করে। হে ভারত, সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া উত্থিত হয়, রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণকে এবং তমঃ সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া উত্থিত হয়। যখন এই দেহের সমুদায় ইন্দ্রিয় দ্বারে জ্ঞানরূপ প্রকাশ জন্মে, তখন জানিবে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। হে ভরতর্ষভ, রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মাড়ম্বর, অশম ও স্পৃহা, এই সমুদায় জন্মে। হে কুরুনন্দন তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ, এই সমুদায় জন্মে।

৩। প্রকৃতি সম্বন্ধে বেদান্ত দর্শনের মত উদ্ধৃত করিতেছি। শঙ্কর-কৃত বেদান্তসূত্র-ভাষ্যে আছে:-যদি বয়ং স্বতন্ত্রাং কাঞ্চিৎ প্রাগবস্থাং জগতঃ কারণত্বেনাভ্যুপগচ্ছেম প্রসঞ্জয়েম তদা প্রধানকারণবাদম্। পরমেশ্বরাধীনা ত্বিয়মস্মাভিঃ প্রাগবস্থা জগতোঽভ্যুপগম্যতে ন স্বতন্ত্রা। সা চাবশ্যমভ্যুপগন্তব্যা-র্থবতীহি সা। নহি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। ...... অব্যক্তা হি সা মায়া তত্ত্বান্যত্বনিরূপণস্যাশক্যত্বাৎ। প্রথমাধ্যায়, চতুর্থপাদ, ৩য় সূত্র।

অর্থাৎ—প্রধানবাদী সাংখ্য বেদান্তবাদীকে 'তোমরাও ত শক্তি মানিতে গিয়া প্রধানবাদ মানিলে' এই কথা বলাতে শঙ্কর বলিতেছেন—"যদি আমরা জগতের কোন স্বতন্ত্র প্রাগবস্থাকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিতাম, তবে আমাদের উপর প্রধানকারণবাদ (অর্থাৎ স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক শক্তি মানা) আরোপিত হইতে পারিত। কিন্তু আমরা জগতের এই প্রাগবস্থাকে পরমেশ্বরাধীন বলিয়া স্বীকার করি, স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করি না। ইহা (অর্থাৎ এই মূল শক্তি) অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, ইহার প্রয়োজন আছে। কারণ, ইহা ব্যতীত

পরমেশ্বরের স্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয় না, কেন না তাঁহার শক্তি না থাকিলে তাঁহার কর্তৃত্ব সম্ভব নহে। সেই মায়া শক্তি অব্যক্তা, কারণ পরমেশ্বরের সহিত উহার একত্ব বা ভিন্নত্ব কিছুই নিরূপণ করা যায় না।

৪। ব্রহ্মের স্বরূপভাব ও শক্তি ভাব, নির্গুণ ভাব ও সগুণ ভাবের প্রভেদ সম্বন্ধে শঙ্কর উক্ত ভাষ্যেই বলিতেছেন :—"দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে নামরূপ-বিকার-ভেদোপাধিবিশিষ্টং তদ্বিপরীতঞ্চ সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিতম্।"

ব্রহ্মকে দ্বিরূপে জানা যায়, নামরূপ বিকার ভেদোপাধি-বিশিষ্ট এবং তদ্বিপ-রীত—সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত।

তৎপর এই দ্বিভাব সম্বন্ধে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্ব-তরোপনিষদ্ হইতে বহুতর প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শঙ্কর বলিতেছেন—"ইতি চৈবং সহস্রশো বিদ্যাবিদ্যাবিষয়ভেদেন ব্রহ্মণো দ্বিরূপতাং দর্শয়ন্তি ব্যাক্যানি। ......যদ্যপ্যেক আত্মা সর্ব্বভূতেষু স্থাবর জঙ্গমেষু গূঢ়ঃ, তথাপি চিত্তোপাধিবিশেষ-তারতম্যাদাত্মনঃ কুটস্থনিত্যস্যৈকরূপস্যাপ্যুত্তরোত্তরমাবিষ্কৃতস্য তারতম্যৈশ্বর্য্য-শক্তিবিশেষৈঃ শ্রূয়তে। ১।১।১১।

এইরূপ সহস্র সহস্র বাক্য বিদ্যাবিদ্যাবিষয় ভেদে ব্রহ্মের দ্বিরূপতা দেখাই-তেছে।.........যদিও একই আত্মা স্থাবর জঙ্গম সমুদায় ভূতে প্রচ্ছন্ন, তথাপি, আত্মা কূটস্থ, নিত্য, একরূপ হইলেও চিত্তোপাধিবিশেষের তারতম্য বশতঃ উত্তরোত্তর আবিষ্কৃত হওয়াতে তিনি শ্রুতিতে তারতম্যযুক্ত নানা ঐশ্বর্য্য শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

৫। মায়া শক্তির অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর যে স্বয়ং মায়াদ্বারা অসংস্পৃষ্ট, এই বিষয়ে শঙ্কর সূত্রভাষ্যের দ্বিতীয়াধ্যায়, ১ম পাদে, ১ম সূত্রের ভাষ্যে বলিতে-ছেন :—"যথা স্বয়ং প্রসারিতয়া মায়য়া মায়াবী ত্রিষ্বপি কালেষু ন সংস্পৃশ্যতে, অবস্তুত্বাৎ এবং পরমাত্মাপি সংসারমায়য়া ন সংস্পৃশ্যত ইতি। যথাচ স্বপ্নদৃগেকঃ স্বপ্নদর্শনমায়য়া ন সংস্পৃশ্যতে, এবমবস্থাত্রয়সাক্ষ্যেকোঽব্যভিচার্য্যবস্থাত্রয়েণ ব্যভিচারিণা ন সংস্পৃশ্যতে।"

অর্থাৎ—যেমন মায়াবী নিজ প্রসারিত মায়াদ্বারা কোনও কালে স্পৃষ্ট হয় না, কেন না মায়া অবস্তু, তেমনি পরমাত্মাও সংসার মায়াদ্বারা সংস্পৃষ্ট হন না। আর যেমন কোন স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি স্বপ্নদর্শনমায়া দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না, তেমনি

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী একমাত্র অব্যভিচারী আত্মা ব্যভি-
চারী অবস্থাত্রয়দ্বারা সংস্পৃষ্ট হন না।

৬। ত্রিগুণাত্মক, নামরূপাত্মক জগৎ যে বীজাকারে নিত্যকালই পর-
মেশ্বরে বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার কখনও হানি হয় না, এই
কথা শঙ্কর চতুর্থ বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে অতি স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছেন।
যথা :—কর্ম্মাপেক্ষায়াস্তু ব্রহ্মণ ঈক্ষিতৃত্বশ্রুতয়ঃ সুতরামুপপন্নাঃ। কিং পুনস্তৎ
কর্ম্ম যৎ প্রাগুৎপত্তেরীশ্বরজ্ঞানস্য বিষয়ো ভবতি। তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে
নামরূপে অব্যাকৃতে ব্যাচিকীর্ষিতে ইতি ব্রূমঃ। যৎ প্রসাদাদ্ধি যোগিনাম-
প্যতীতানাগতবিষয়ং প্রত্যক্ষজ্ঞানমিচ্ছন্তি যোগশাস্ত্রবিদঃ কিমু বক্তব্যং তস্য
নিত্যসিদ্ধস্যেশ্বরস্য সৃষ্টিস্থিতি সংহৃতিবিষয়ং নিত্যং জ্ঞানং ভবতীতি।"

অর্থাৎ—'সৃষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞানের কর্ম্ম অর্থাৎ বিষয় না থাকাতে ব্রহ্ম কিরূপে
জ্ঞাতা হইলেন' এই প্রশ্ন উঠাতে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, কর্ম্ম না থাকিলেও ব্রহ্ম
সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ ছিলেন। তার পর বলিতেছেন যে, পক্ষান্তরে জ্ঞানের
জন্য যদি কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে তাহা হইলে ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব বিষয়িণী শ্রুতিসমূহ
কাজে কাজেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু সেই কর্ম্ম কি যাহা সৃষ্টির
পূর্ব্বে ঈশ্বর জ্ঞানের বিষয় হয়? আমরা বলি, সেই কর্ম্ম নাম ও রূপ, যাহাকে
ঈশ্বরের সহিত একও বলা যায় না, ভিন্নও বলা যায় না, এবং যাহা ব্যক্ত হয়
নাই অথচ ব্যক্ত হইতে উন্মুখ। যাঁহার প্রসাদে যোগীদের পর্য্যন্ত অতীত ও
অনাগত বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় বলিয়া যোগশাস্ত্রবিদেরা বলেন, সেই নিত্য
সিদ্ধ ঈশ্বরের যে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারবিষয়ক নিত্যজ্ঞান আছে, এই বিষয় কি
আর বলিতে হইবে?

ঈশাদি দশোপনিষদে 'সগুণ' 'নির্গুণ' এই শব্দদ্বয় না থাকিলেও
এই দুই ভাবের প্রকাশ স্পষ্টই দেখা যায়। উপনিষদ্ ব্রহ্মকে সগুণ ভাবে
বর্ণনা করিতে যাইয়া তাঁহাকে জগতের সহিত এক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,
আবার তাঁহার নির্গুণ ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে জগতের অতীত
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দার্শনিক দৃষ্টিবিহীন পাঠকেরা এই দ্বিরূপ বর্ণনাকে
বিরোধ-দুষ্ট বলিয়া মনে করেন। এরূপ 'বিরোধ' ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিতে কেন,
এক শ্রুতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, একই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—

"তদেজতি তন্নৈজতি"—তিনি চলেন, তিনি চলেন না। এরূপ 'বিরোধ' কখনও ঋষিদিগের পরস্পরের মতপার্থক্য অথবা একই ঋষির ভিন্ন ভিন্ন সময়ের উক্তি হইতে পারে না। সগুণ নির্গুণের ভেদ ও অভেদ বুঝিলে এরূপ আপাত-বিরুদ্ধ বাক্যের অর্থ সহজেই বুঝা যায়। যাহা হউক উক্ত দশোপনিষদে 'সগুণ' 'নির্গুণ' শব্দদ্বয়ের স্পষ্ট উল্লেখ না থাক্, অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ আধুনিক অথচ প্রাচীন শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে এই শব্দদ্বয় ও তদ্ভাব স্পষ্টরূপেই উল্লিখিত আছে। এরূপ বিষয়ের শ্রুতিপ্রমাণ আমি পূর্ব্বে সময় সময় দিয়াছি, সুতরাং অদ্য এই বিষয়ে বাহুল্যবোধে নিরস্ত হইলাম।

ভগবদ্গীতায় সগুণ নির্গুণ ভাব স্পষ্ট রূপেই বর্ণিত আছে। যথা,—সপ্তমাধ্যায়ে—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খংমনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৪॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫॥

অর্থাৎ—ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার—এই আমার ভিন্না অষ্টধা প্রকৃতি। হে মহাবাহো, এই প্রকৃতি অপরা, ইহা হইতে ভিন্ন যে আমার পরা প্রকৃতি, তাহার বিষয় শুন,—যাহা জীব রূপ হইয়াছে এবং যদ্দ্বারা এই জগৎ ধৃত হইয়া আছে।

পুনশ্চ ত্রয়োদশতমাধ্যায়ে—

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃচ ॥১৪॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥১৫॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥১৬॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥১৭॥

অর্থাৎ—ব্রহ্ম সমুদায় ইন্দ্রিয়গুণের প্রকাশক অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত;

তিনি নির্লিপ্ত, গুণের পোষক, নির্গুণ অথচ গুণভোক্তা। তিনি ভূত সমূহের বাহিরে আছেন, ভিতরেও আছেন। তিনি চর অথচ অচর; সূক্ষ্মত্ব বশতঃ তিনি অবিজ্ঞেয়, তিনি দূরে অথচ নিকটে আছেন। তিনি ভূতসমূহে অবিভক্ত রূপে অথচ বিভক্তের ন্যায় হইয়া আছেন; তিনি ভূতের ভর্তা, রূপে জ্ঞেয়, তিনি প্রভবকারী ও গ্রাসকারী।. তিনি জ্যোতিষ্মৎ বস্তু সমূহেরও জ্যোতিঃ, তিনি অজ্ঞান অর্থাৎ জড়ের অতীত বলিয়া উক্ত হন; তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য ও সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত।

সময়াভাবে পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে কাহারও মত উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। দুজনের নাম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। যে ভেদ এদেশে 'সগুণ' 'নির্গুণ' শব্দে ব্যক্ত হয়, সেই ভেদেরই ইংরাজি শব্দ Immanent ও Transcendent. বেদান্তসম্বন্ধে প্রধান ইউরোপীয় লেখক দেওসেন সাহেবের এই মত। আমাদের সহিত কিছু বিশেষরূপে সম্পর্কিত ডাঃ মার্টিনো সাহেবের মত এই যে ঈশ্বর immanent ও transcendent উভয়ই।

ব্রহ্মতত্ত্ব।

মহাত্মা কেশবচন্দ্রের প্রচারিত ব্রহ্মবিজ্ঞান।

জ্ঞান, ভাব ও নীতি এই তিন পথের কোন না কোন পথ দিয়া মানুষ ধর্ম্মের দিকে আসে। কাহারও কাহারও জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রশ্ন এই—সত্য কি? খাঁটি বস্তু কি?—যাহা ভ্রমের অতীত, কল্পনার অতীত, কেবল পরম্পরাগত সংস্কারের অতীত। এই শ্রেণীর লোক পরম্পরাগত বিশ্বাসে পরিতৃপ্ত হন না। ভক্ত, বিশ্বাসী, মহাপুরুষ, ধর্ম্মবীর, এই সকল নাম শুনিয়া তাঁহাদের তাক্ লাগে না। সত্যের অকাট্য প্রমাণ না পাইলে তাঁহাদের কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। জনশ্রুতি, চির-পোষিত সংস্কার, মানব মনের স্বাভাবিক কল্পনাও কবিত্ব, মানব-সুলভ ভ্রান্ত যুক্তি প্রভৃতির সহিত তাঁহাদিগকে কঠোর সংগ্রাম করিতে হয়। সাধুর যেমন নিয়ত চেষ্টা যেন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক কোন পাপে পতিত না হন, তেমনি জ্ঞানসাধকের নিয়ত চেষ্টা যাহাতে কোন ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ না করেন। ভ্রান্ত বিশ্বাস তাঁহার কাছে পাপ অপবিত্রতার ন্যায় ঘৃণনীয় ও বর্জ্জনীয়। জ্ঞানী সত্যের অনুরোধে যদি প্রয়োজন হয় তবে ঈশ্বর-বিশ্বাস, ঈশ্বর-প্রীতি ও ঈশ্বর-সেবা, জগতের মধ্যে এই তিন মধুরতম বস্তুকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন। কি মধুর? কি তিক্ত? ইহা জ্ঞানসাধকের বিবেচ্য নহে, কি সত্য? কি অসত্য? ইহাই তাঁহার বিবেচ্য। এই শ্রেণীর লোকদিগের দ্বারাই ধর্ম্মের বিজ্ঞান প্রবর্ত্তিত হয়। আরো উচ্চে উঠিলে জ্ঞানীর জ্ঞানচেষ্টা প্রত্যক্ষ, মধুর, জীবনপ্রদ ব্রহ্মযোগে পরিণত হয়। সত্যস্বরূপের জ্ঞানে আত্মার নিয়ত প্রতিষ্ঠার নামই যোগ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ভাবপ্রধান। শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভক্তি, নির্ভর প্রভৃতি ধর্ম্মভাব সমূহ তাঁহাদের মনে স্বভাবতঃ প্রবল, এবং এই সমুদায়ের পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই ব্যাকুল। একজন অনন্ত পূর্ণ পুরুষ ব্যতীত আর কেহ এই সকল ভাবের পূর্ণ পরিতৃপ্তি দিতে পারে না, এইজন্য এই শ্রেণীর লোক স্বভাবতঃই ঈশ্বর-বিশ্বাসী হন। ঈশ্বর-বিশ্বাস, ঈশ্বরোপাসনা ও ঈশ্বরানুগত্যে তাঁহা-

দের এই সকল ভাব পরিতৃপ্ত হয়, ইহাই তাঁহাদের ঈশ্বর-পরায়ণতার প্রকৃত কারণ। ঈশ্বরকে জানিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা ঈশ্বর-বিশ্বাসী হন এবং কেবল বিশ্বাসেই তাঁহাদের আত্মা এতদূর তৃপ্ত হয় যে তদতিরিক্ত জ্ঞান লাভের তাদৃশ প্রয়োজন বোধ হয় না। জ্ঞানপিপাসা প্রবল না থাকাতে অনেক স্থলে পরম্পরাগত বিশ্বাসেই তাঁহাদের তৃপ্তি হয়। সত্য কি? অসত্য কি? এই প্রশ্ন তাঁহাদের মনে তাদৃশ প্রবল না থাকাতে চির-পোষিত সংস্কারের সত্যাসত্যতা সম্বন্ধে গভীর বিচারে তাঁহার প্রবৃত্ত হন না। এই শ্রেণীর লোকের মনে ধর্ম্মমত সম্বন্ধীয় সন্দেহ অতি অল্পই উঠে, এবং যখন উঠে তখন অতি অল্প বিচার ও জ্ঞানালোচনাতেই তাহা নিবৃত্ত হয়। বিশ্বাস করিবার জন্য তাঁহাদের মন এত লালায়িত, বিশ্বাস তাঁহাদের কাছে এত আরাম-প্রদ, সন্দেহ এত কষ্টকর, যে ইহা তাঁহাদের মনকে অনেক ক্ষণ দোলায়মান রাখিতে পারে না। তাঁহারা অকাট্য জ্ঞানের অপেক্ষা না করিয়াই অথবা অতি অল্পজ্ঞানের আশ্রয়েই হৃদয়ের তৃপ্তিকর বিশ্বাসকে পুনরালিঙ্গন করেন। এই শ্রেণীর অনেক লোকের নিকট সন্দেহ ভক্তির বিরোধী বলিয়া পাপ ও ঈশ্বরদ্রোহরূপে পরিগণিত, সুতরাং এই কারণেও ইহা অধিক ক্ষণ তাঁহাদের মনে স্থান পায় না। এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ দর্শনালোচনা, গভীর চিন্তা, কঠোর তর্ক বিচার প্রভৃতির বিরোধী। অন্ততঃ এই সমুদায়ের তাদৃশ পক্ষপাতী নহেন। যদি কখন পক্ষপাতী হন, সে অনেকটা প্রচারোদ্দেশে। নিজের পোষিত ও আরাম-প্রদ বিশ্বাসকে পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞান-প্রিয় লোকসমাজে সমুচিতরূপে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশে এই সমুদায় অল্পাধিক পরিমাণে অবলম্বন করেন। বলা বাহুল্য যে এরূপ সকাম জ্ঞানালোচনায় প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। ইহা বলাও প্রায় বাহুল্য যে এই শ্রেণীর লোকের দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রবর্ত্তিত হয় না। ইহারা ধর্ম্মমত প্রচার করেন, বিশ্বাসপ্রবণ লোকের মনে বিশ্বাস জন্মান এবং জগতে ভক্তি ও প্রেমের স্রোত প্রবাহিত করেন।

তৃতীয় শ্রেণীর লোক নীতিপ্রধান। নিজের অনুভূত নৈতিক আদর্শানুসারে নিজ জীবনকে গঠন করা, জগতে পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য প্রতিষ্ঠিত করা—ইহাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ধর্ম্মবিশ্বাস ব্যক্তিগত ও সামাজিক নীতির সহায়, সেই জন্যই ইহাঁরা ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হন ও

ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ঈশ্বরোপাসনা পবিত্রতা লাভের মহদুপায়, এইজন্য তাঁহারা স্বভাবতঃই ঈশ্বর-বিশ্বাসী হন। ধর্ম্মবিশ্বাসের নৈতিক প্রয়োজনীয়তার দিকেই তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি। সুতরাং ধর্ম্মের যে সকল দিকের সহিত নীতির তাদৃশ সম্বন্ধ নাই, সেই সকল দিকের সহিত তাঁহাদের খুব আন্তরিক সহানুভূতি থাকে না। গভীর জ্ঞানালোচনা, প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস, দীর্ঘ কালস্থায়ী ধ্যান ধারণা, এই সমুদায়ের প্রয়োজনীয়তা মতে স্বীকার করিলেও এই সমুদায় তাঁহাদিগকে বিশেষ আকৃষ্ট করিতে পারে না। যে পরিমাণে এই সকল বস্তু ধর্ম্মবিশ্বাসকে জাগ্রত রাখিয়া মানবের পবিত্রতা লাভের সহায় হয়, সেই পরিমাণেই ইহাঁরা এই সমুদায়কে মূল্যবান মনে করেন। এই সমুদায়ের যে কোন নিরপেক্ষ মূল্য আছে, এই কথাতে তাঁহাদের হৃদয় ততটা সায় দেয় না। পবিত্রতা লাভ ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে নিজের ও অন্যের মনে ধর্ম্মবিশ্বাসকে জাগ্রত রাখাই ইহাঁরা বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য মনে করেন—সে জ্ঞানালোচনাদ্বারাই হউক আর অন্য উপায়েই হউক। সত্য কি, অসত্য কি, বস্তু কি, অবস্তু কি, পরম্পরাগত সংস্কার সমূহই সত্য অথবা কোন উচ্চতর সত্যরাজ্য আছে, এই সকল প্রশ্ন এই শ্রেণীর লোকদিগের মনে ততটা উঠেনা এবং এই সকল প্রশ্নের বিচারে তাঁহাদের তাদৃশ অনুরাগ হয় না; বরঞ্চ, যে সকল দর্শনিক মত তাঁহাদের দৃষ্টিতে নীতিবিরোধী, ধর্ম্মবিরোধী, মানবের স্বাধীন ইচ্ছা ও নীতিবোধের বিলোপকারী বলিয়া বোধ হয়, সেই সমুদায় মতের বিচারে ইহাঁরা কখনই নিরপেক্ষভাবে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। এই সমুদায় মত নীতিবিরোধী, সুতরাং পরিত্যাজ্য, এই যুক্তি তাঁহাদের নিকট অকাট্য বলিয়া বোধ হয়। এই শ্রেণীর লোক জগতের ধর্ম্ম-সংস্কারক ও সমাজ-সংস্কারক হন। কিন্তু গভীর ও উজ্জ্বল ধর্ম্মবিজ্ঞান লাভ ও প্রবর্ত্তন করা ইহাঁদের পক্ষে অসম্ভব। ইহারাও সত্যের নিষ্কাম সেবক নহেন। কেবল নিষ্কাম জ্ঞানসাধকের নিকটই সত্য আত্মপ্রকাশ করেন।

আমার বিবেচনায় মহাত্মা কেশবচন্দ্র প্রধানতঃই উপরোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহাতে তৃতীয় শ্রেণীর কোন কোন লক্ষণও বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর লক্ষণ অতি অল্পই ছিল। তাঁহার আত্মা স্বভাবতঃ বিশ্বাস ও ভক্তিপ্রবণ ছিল। ধর্ম্মের সত্য সমূহে স্বভাবতঃই তাঁহার বিশ্বাস জন্মিত এবং

যে স্থলে বিশ্বাসের ক্ষীণতা বোধ করিতেন, সে স্থলেও প্রীতি ও ভক্তি-প্রসূত একটা বিশ্বাসের উচ্চ আদর্শ তাঁহাকে পরিচালিত করিত। নিজের মধ্যে হউক বা পরের মধ্যেই হউক, সন্দেহ অবিশ্বাসকে তিনি সর্ব্বদাই তীব্র চক্ষে দেখিতেন। তিনি প্রথম জীবনে কিয়ৎ পরিমাণে দর্শনালোচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহা হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং প্রায় সমগ্র জীবনই দর্শনের ধীর, সাবহিত প্রণালীকে সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ ভাবে নিন্দা করিতেন। তিনি যখন দর্শনালোচনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস স্থির হইয়া গিয়াছে। সুতরাং নিষ্কাম ও নিরপেক্ষ ভাবে দর্শনালোচনা করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তিনি যে সকল লেখক ও গ্রন্থের উল্লেখ করিতেন তাহাতে বোধ হয় তিনি একটি বিশেষ দার্শনিক সম্প্রদায়েতেই নিজের অধ্যয়নকে অনেক পরিমাণে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন এবং সেই সম্প্রদায়ের লেখকগণ তাঁহার পূর্ব্বপোষিত সংস্কারের অনুকূল বলিয়াই তিনি তাঁহাদের মত আলোচনা ও প্রচার করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন। অন্য সম্প্রদায়ের মত সম্বন্ধে তাহার লেখা ও উক্তিতে বিশেষ অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়। ঈদৃশ বিশ্বাসপ্রবণ ও দর্শনবিরোধী ব্যক্তি যে একটি গভীর চিন্তা ও বিচারসম্মত ধর্ম্মবিজ্ঞান রাখিয়া যাইবেন তাহা পূর্ব্বেও আশা করা যাইত না এবং ফলেও সে আশা পূর্ণ হয় নাই। স্বভাবতঃ বিশ্বাস ও ভক্তিপ্রবণ আত্মা ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে, মানবের ধর্ম্মবিষয়ক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সহজে যেরূপ বিশ্বাস পোষণ করিতে পারে, অথবা পোষণ করিতে আকাঙ্খা করে, কেশবচন্দ্র সেরূপ কতকগুলি বিশ্বাস ও মত প্রবল উৎসাহ ও শক্তির সহিত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল মতের মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য আছে কি না এই বিষয়ে তাদৃশ দৃষ্টি করেন নাই এবং গভীর গবেষণা ও বিচারপূর্ণ একটি ধর্ম্মবিজ্ঞান-তন্ত্র,(System of Theology), যে তন্ত্র দার্শনিক পরীক্ষার বিষয়ীভূত হইতে পারে এবং সকলের না হউক, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির গ্রহণযোগ্য হইতে পারে, এরূপ কোন তন্ত্রের উপর নিজমত সমূহকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান নাই। এই বিষয়ে তাঁহার একটি মহা ভ্রম ছিল। তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানের মধ্যে একটি অলঙ্ঘনীয় সীমা কল্পনা করিতেন, আর মনে করিতেন, ধর্ম্মের মূল

সত্য সমূহ যখন প্রত্যক্ষ জ্ঞানগত, তখন সে সকল বুঝাইবার জন্য বেশী তর্ক বিচারের প্রয়োজন নাই। যাহার চক্ষু আছে সে সহজেই দেখিবে, যাহারা দেখিতে পায় না তাহাদিগকে যুক্তি তর্ক দ্বারা দেখাইবার চেষ্টা করা বৃথা। এই ধারণাটা তিনি ব্রাহ্মসমাজের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এখনও এই ওজরে লোকে গভীর জ্ঞানালোচনায় বিমুখ। প্রত্যক্ষ জ্ঞান কেবল ধর্ম্মের এক চেটিয়া নহে, জীবনের সমুদায় বিভাগেই, সমুদায় বিজ্ঞানশাস্ত্রেই পদে পদে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে হয়, অথচ অন্য বিভাগে, অন্য বিজ্ঞানে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান-গত সত্য সম্বন্ধে প্রায় মতভেদ হয় না, কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মূল সত্য সম্বন্ধে অনবরতই মতভেদ ঘটিতেছে; ইহার কারণ কেশবচন্দ্র কেন যে তলাইয়া দেখিতেন না এবং তাহার বর্ত্তমান অনুসরণকারিগণ কেন যে তলাইয়া দেখেন না, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক, কেশবচন্দ্রের প্রচারিত সহজ জ্ঞানবাদের আলোচনার সময় এই বিষয় কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে।

কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মবিষয়ক, বিশেষতঃ ঈশ্বর-বিষয়ক মত সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। এমন এক সময় ছিল যখন জগৎ ছিল না, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে জগতের সৃষ্টি হইল। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া নিয়ম ও জড়শক্তির হস্তে জগৎ পরিচালনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ও নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকেন নাই। তিনি প্রতি নিয়ত প্রকৃতির মধ্যে কার্য্য করিতেছেন। গতি, আলোক, উত্তাপ, বায়ু, বিদ্যুৎ, প্রাণ, চেতন প্রভৃতি প্রকৃতির প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য তাঁহারই কার্য্য, অথচ কেশবচন্দ্রের মতে জড় তাঁহা হইতে পৃথক। "জড়শক্তি বলিয়া কোন শক্তি নাই, শক্তিমাত্রই আত্মশক্তি, অন্ধ শক্তি অসঙ্গত, অর্থহীন বাক্য," এই কথা কেশবচন্দ্র কোথাও স্পষ্টরূপে বলেন নাই। জড়, জীবচৈতন্য ও ঈশ্বর এই তিনটি বস্তুর কোন একটিকে অপর একটিতে বিলীন করিয়া দিতে তিনি সর্ব্বদাই নারাজ ছিলেন। তাহার 'যোগ' নামক প্রবন্ধে এই কঠিন দ্বৈতভাব প্রায় 'যায় যায়' হইয়াছে; কিন্তু তাহাতেও তিনি ইহাকে যেন বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। জড়জগতের ন্যায় আত্মজগতেও কেশবচন্দ্র ঈশ্বরকে নিয়ত ক্রিয়াশীল বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে আমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া

এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না, একটি চিন্তাও করিতে পারি না। এমন কি, আমাদের যে স্বতন্ত্র আমিত্ববোধ, তাহাকেও তিনি ভ্রান্ত বলিয়াছেন এবং যোগের অবস্থায় 'আমি', 'আমার', 'আমাকে', এই সমস্ত ঈশ্বরে মিশাইয়া দেওয়াকেই উচ্চতম মুক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি যোগীর কথা বলিয়াছেন—"He will have no other salvation than the absorption of 'I','mine' and 'me' in the Godhead." অথচ এত দূর বলিয়াও আপনাকে অদ্বৈতবাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মানব-ইচ্ছার স্বাধীনতাতে কেশবচন্দ্রের অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। ইচ্ছার পশ্চাতে ইচ্ছার নিয়ামকরূপে আর কোন শক্তি কায করিতেছে, ইহা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতেন না। পাপেচ্ছার মূলে আর কিছু নাই, সংকল্পই শেষ মূল কারণ; অথচ ঈশ্বরের মঙ্গল বিধান সমর্থন করিবার জন্য তিনি বলিতেন পাপ কোন ভাবাত্মক বস্তু নহে, ইহা অবস্তু, অভাবাত্মক বস্তু, প্রেম পুণ্যের অভাব, যেমন অন্ধকার আলোকের অভাব। ভাবাত্মক পাপ ও ঈশ্বরের পূর্ণ মঙ্গলভাব, এই দুইয়ের মধ্যে তিনি অসামঞ্জস্য দেখিতেন, কিন্তু মনুষ্য স্বাধীনভাবে পাপ করে, পাপ করিব বলিয়া পাপ করে—"পাপ করিব, ঈশ্বরের বিদ্রোহাচরণ করিব" এই ভাবাত্মক সংকল্পবশতঃ পাপ করে, অথচ পাপ অভাবাত্মক, ইহা অবস্তু, এই দুই মতের মধ্যে তিনি কোন অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেন না। যাহা হউক, উপরোক্ত অসামঞ্জস্য সমূহের মূল কোথায়, মীমাংসা কোথায়, এই সমস্ত কি ধর্ম্মচিন্তার অপরিপকতার ফল অথবা চিন্তা-জগতের কোন মৌলিক নিয়মের ফল, কোন Dialectic এর অন্তর্গত, কোন মৌলিক অখণ্ড সত্যের আপাত-বিরুদ্ধ দুই দিক মাত্র,—এই সকল প্রশ্ন কেশবচন্দ্রের মনে উঠিত বলিয়া বোধ হয় না। একটি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ (systematic), সমঞ্জসীভূত (consistent) বিচার সম্মত ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রবর্ত্তিত করা তাঁহার ব্রত ছিল না। ভক্তির মধুরতা আস্বাদন করা ও জগৎকে সেই আস্বাদন দেওয়া এবং নিজ জীবন ও ভারতবর্ষকে বিশুদ্ধ নীতি ও উদার সামাজিকতায় প্রতিষ্ঠিত করা—ইহাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। সুতরাং তিনি স্বাধীন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হইয়াও, 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি বিজ্ঞান' এই কথা স্বীকার করিয়াও, ব্রাহ্মধর্ম্মকে কোন সন্তোষকর

বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই এবং ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারক হইয়াও চিন্তা-জগতের সংস্কারে বিশেষ হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই কার্য্য ব্রাহ্মসমাজেতিহাসের পশ্চাতে নহে,সম্মুখে।

ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তি সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র প্রায় সর্ব্বদা এক কথাই বলিতেন,—"সহজজ্ঞান," "আত্মপ্রত্যয়"। ইহার নামান্তর "স্বাভাবিক বিশ্বাস", "প্রত্যক্ষ-জ্ঞান", "সাক্ষাৎ দর্শন" ইত্যাদি। কেশবচন্দ্র এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তক নহেন। রাজা রামমোহন রায়ের প্রচারিত ধর্ম্মমতে ইহা অপরিস্ফুটরূপে বর্ত্তমান ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহাকে প্রথমে পরিস্ফুটভাবে প্রচার করেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র ইহাতে বিশেষ নূতন কিছু যোগ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্যগণ তাঁহার হইয়া কিছু নূতনত্বের দাবী করেন। এই বিষয়ে আমি তাঁহাদের প্রচারিত "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" নামক জীবনচরিত হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"কেশবচন্দ্রের যোগদানের পর আত্মপ্রত্যয় সহজজ্ঞানের অনুবর্ত্তিরূপে গৃহীত হইয়াছে, ইহা আমরা ঐ 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' হইতেই সহজে পরিগ্রহ করিতে পারি। কেননা ১৭৭৬ শকে প্রকাশিত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডের নবমাধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে যে 'আত্মপ্রত্যয়' শব্দ আছে তাহার ব্যাখ্যাস্থলে লিখিত হইয়াছে, 'আমাদের এ স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় থাকাতেই জ্ঞানস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী নিত্য পরমেশ্বর এই আশ্চর্য্য সুকৌশলসম্পন্ন বিশ্বের কারণরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। অতএব এই স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রামাণ্য স্থাপনের একমাত্র হেতু।' ১৭৮৫ শকে প্রকাশিত ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপে লিখিত হইয়াছে—'এই অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর চক্ষুর গোচর নহেন। তাঁহাকে হস্তদ্বারা গ্রহণ করা যায় না, তাঁহাকে মনের দ্বারা কল্পনা করা যায় না, তাঁহাকে পরিমিত বস্তুর ন্যায় বুদ্ধিদ্বারা বিশেষ করিয়া বুঝা যায় না। কেবল নির্ম্মল সহজ জ্ঞানে তিনি প্রকাশিত হয়েন, এবং এক আত্মপ্রত্যয়ের বলে সেই জ্ঞানগোচর সত্য-সুন্দর-মঙ্গল পুরুষের অস্তিত্ব আমরা বিশ্বাস করি। জ্ঞান যে অকৃত অমৃত অনন্ত পুরুষকে প্রকাশ করে, আত্মা সেই পূর্ণ পুরুষের অস্তিত্বে প্রত্যয় করে। জ্ঞানেতে সত্য প্রকাশ পায়, এবং সেই সত্যেতে আমাদের আত্মার

প্রত্যয় হয়। অতএব স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রামাণ্য স্থাপনের একমাত্র হেতু। যখন আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ অনন্ত পুরুষ সহজ জ্ঞানে প্রকাশিত হন, তখন বুদ্ধি তাঁহার জগৎ-রচনার কৌশল দেখাইয়া তাঁহার বিজ্ঞানের পরিচয় দেয় এবং জগতের মঙ্গলোদ্দেশ্যও নিয়ম দেখাইয়া সেই নিয়ন্তার মঙ্গলভাব ব্যক্ত করে।' এই ব্যাখ্যাতে বুদ্ধি, সহজ জ্ঞান, আত্মপ্রত্যয়, এই তিনের সম্বন্ধ এখানে সুস্পষ্ট দেখাইয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রথমে বুদ্ধি, দ্বিতীয়ে আত্মপ্রত্যয়, তৃতীয়ে সহজ জ্ঞান, এই প্রকার সোপানপরম্পরায় যে আরোহণ করিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ কোথায় ছিলেন? বুদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয়ে। আত্মপ্রত্যয়ে বা বা ঈশ্বর আছেন এই স্বাভাবিক বিশ্বাসে তাঁহাকে অবগত হইয়া বুদ্ধিযোগে জগতের মধ্যে তাঁহার বিচিত্র ক্রিয়া দর্শন, ইহাই সে সময়ে সর্ব্বপ্রধান ছিল। ১৭৭৬ শকের প্রকাশিত ব্রাহ্মধর্ম্মের চতুর্থাধ্যায় ৮ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় এ কথা বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। 'স্থাবর জঙ্গম সমুদয় বস্তুর কৌশল আলোচনা করা তাঁহার জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। স্থাবর জঙ্গম সমুদয় বস্তু তাঁহারই সৃষ্টি, তাঁহারই কৌশল, তাহারা তাঁহারই কীর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে, তাঁহারই মহিমা প্রচার করিতেছে, তাঁহারই নাম ঘোষণা করিতেছে, আমরা মনোনিবেশ করিলেই তাহা অবগত হইতে পারি। সৃষ্টি বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেই ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করা যায়, এবং নিয়ম জানিলেই নিয়ন্তার অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়।' এই কথা বলা বাহুল্য যে ১৭৮৫ শকের ব্যাখ্যাতে তৎসময়োচিত অবস্থানুসারে পূর্ব্ব ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বিপরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"—'আচার্য্য কেশবচন্দ্র'—৬১,৬২ পৃঃ।

আমি বিশেষ কিছু নূতনত্ব দেখিতে পাইতেছি না। মহর্ষি 'প্রত্যয়' বলিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। কেশবচন্দ্র 'জ্ঞান' কথাটি ব্যবহার করিলেন, এইমাত্র প্রভেদ। মৌলিক সংস্কারের স্বতঃসিদ্ধতা স্বীকার করিলে ইহাকে 'প্রত্যয়ই' বলা যাক্, আর 'জ্ঞান'ই বলা যাক্, ইহাতে কিছু আসে যায় না, এবং যিনি ইহার স্বতঃসিদ্ধতা স্বীকার না করেন তাঁহার পক্ষে 'জ্ঞান' নামটাতে ইহার মূল্য কিছুই বৃদ্ধি পায় না। যাহা হউক, কেশবচন্দ্র এই মতকে বহুলরূপে প্রচার করেন সন্দেহ নাই। 'সহজজ্ঞান' কথাটি বোধ হয় স্কচ্ দার্শনিক

রীডের Common sense বাক্যের অনুবাদ। এই রীড্ এবং তৎশিষ্য হ্যামিল্টনকে কেশবচন্দ্র অতিশয় উচ্চ দার্শনিক বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহাদের প্রচারিত দার্শনিক মতকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ সহায় বলিয়া মনে করিতেন। তিনি হ্যামিল্টনকে 'that unrivalled thinker' (সেই অনুপম দার্শনিক) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হ্যামিল্টনকে ধর্ম্মবিশ্বাসের সহায় বলিয়া মনে করাতে যে কেশবচন্দ্র মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন তাহা দর্শনাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। ইহা আমি কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎ শিষ্য বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং বাবু অমৃতলাল বসু এই মহাশয়-দ্বয়কেও স্বীকার করিতে শুনিয়াছি। হ্যামিল্টন ধর্ম্মবিশ্বাসের দার্শনিক ভিত্তির বিরুদ্ধে এত বলাতেও—'অনন্তের জ্ঞান মানবের পক্ষে অসম্ভব' এই কথা স্পষ্টরূপে বলাতেও কিরূপে হ্যামিল্টন-দর্শনকে কেশবচন্দ্র ধর্ম্মের সহায় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয়। হ্যামিলটনের অনুসরণ করিয়া ডীন ম্যানসেল ধর্ম্মদর্শনের অসম্ভবত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন ও আপ্তবাক্য-প্রতিষ্ঠিত খৃষ্টীয় বিশ্বাসের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। তৎপরে হার্বার্ট স্পেনসার উক্ত উভয় দার্শনিকের পদানুসরণ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞেয়তাবাদে উপনীত হইয়াছেন। কেশবচন্দ্রের হ্যামিল্-টনানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে যদি গভীর সামঞ্জস্য প্রিয়তা (love of consistency) থাকিত, এবং তিনি যদি ধর্ম্মোন্মত্ত বিশ্বাসী না হইয়া ধীর চিন্তাশীল দার্শনিক হইতেন, তবে তিনি আজ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ও নববিধান-প্রবর্ত্তক রূপে পরিচিত না হইয়া স্পেনসার-দর্শনের একজন সুযোগ্য প্রচারকরূপে পরিগণিত হইতেন, সন্দেহ নাই।

বাস্তবিক কথা বোধ হয় এই যে কেশবচন্দ্র হ্যামিল্টনের 'theory of direct perception' আলোচনা করিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, হ্যামিল্-টন-দর্শনের অন্যান্যদিকের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ দেন নাই। কিন্তু হ্যামিল্টন জড়জগৎকেই সাক্ষাৎ দর্শনের বিষয় বলিয়া প্রকাশ করি-য়াছেন। ঈশ্বর যে সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয়, ইহা হ্যামিল্টনের মত নহে। এই মত কেশবচন্দ্রের নিজের, হয়ত কতক পরিমাণে হ্যামিল্টনের theory of perception এর অনুকরণে রচিত।

এখন কেশবচন্দ্রের এই মত সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব। ইহা প্রধানতঃ তাহার 'Basis of Brahmoism' নামক পুস্তিকায় বিবৃত হইয়াছে। আমি 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র' নামক পুস্তক হইতে এই পুস্তিকার বাঙ্গলায় অনুবাদিত সংক্ষিপ্ত সার উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বাহ্য বস্তু, বস্তুর বস্তুত্ব এবং কার্য্যমাত্রের কারণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি হয়, এ সকল বিষয়ের জ্ঞান চিন্তার ফল নহে। এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সহজজ্ঞানের প্রথম লক্ষণ। এই লক্ষণ থাকাতে ইন্দ্রিয় প্রতিবোধের সাদৃশ্যে নীতিবোধ কর্ত্তব্যবোধাদি উহার নাম অর্পিত হইয়াছে। সহজ জ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষণ অযত্নসম্ভূতত্ব। কোন চেষ্টা বা যত্ন বিনা আপনা হইতে জ্ঞান সমুপস্থিত হয়, এ জ্ঞান কোন প্রকারে নষ্ট করা যায় না। যদি বলপুর্ব্বক এই জ্ঞান নিরোধ করিয়া রাখা হয়, সময়ে উহা এমনই বল প্রকাশ করে যে, সকল চেষ্টা সকল যত্ন বিফল করিয়া দেয়। বাহ্য বস্তু কিছু নয় মায়িক, এ মত অনেক দিন হইল প্রচলিত, কিন্তু বাহ্য বস্তুর বস্তুত্ব কেহই না মানিয়া থাকিতে পারেন না। অনেকে যুক্তি তর্ক দ্বারা ঈশ্বরসম্পর্কীন সাক্ষাৎ জ্ঞান উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এই জ্ঞান এমনই দুরপনেয় যে, সেই সকল ব্যক্তিকে বাধ্য হইয়া ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই লক্ষণ থাকাতে ইহাকে অযত্নসম্ভূত জ্ঞান, নৈসর্গিক আলোক, সহজপ্রত্যয় প্রভৃতি নাম অর্পণ করা হইয়াছে। সহজ জ্ঞানের তৃতীয় লক্ষণ সার্ব্ব-ভৌমিকত্ব। পণ্ডিত ও মূর্খ সকলেরই এই জ্ঞান আছে, এ জন্য ইহার নাম সাধারণ বোধ, সার্ব্বভৌমিক জ্ঞান। ইহার চতুর্থ লক্ষণ আদিমত্ব। সহজ জ্ঞান উৎপন্ন নহে, অনুমানসিদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে। সমুদায় বিজ্ঞান ও তর্কের উহা মূল আশ্রয়, উহাকে অবলম্বন করিয়া চিন্তা ও আলো-চনা উপস্থিত হয়। এই জন্য ইহার নাম মূল সত্য, আদিম জ্ঞান। সহজ জ্ঞানের পঞ্চম বা শেষ লক্ষণ এই যে উহা স্বতঃপ্রমাণ, অন্য প্রমাণ-সাপেক্ষ নহে। সুতরাং উহা কেবল জ্ঞান নয়, বিশ্বাস ও প্রত্যয়। কার্য্যমাত্রের কারণ আছে, সৎকার্য্য কর্ত্তব্য, অসৎকার্য্য পরিহার্য্য ইত্যাদি বিষয় আমরা সুদৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাকি, এই

জন্য ইহার নাম অবিচারোত্থিত সত্য, স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস। এই সহজ জ্ঞান মানব জাতিকে যে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম অর্পণ করে তাহাতে বিরোধ নাই, বিসংবাদ নাই, সাম্প্রদায়িকতা নাই। চিন্তা ও বিচারাদিতে মত ভেদ উপস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হইয়া পড়িয়াছে। সহজ জ্ঞান সাক্ষাৎ দর্শন। এই সাক্ষাদ্দর্শনে ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি সরস, কেননা উহাতে ঈশ্বর প্রাণের প্রাণরূপে সাক্ষাদ্দৃষ্ট হন। পণ্ডিত ও মূর্খ সকলেরই ইহাতে অধিকার, কেননা সহজ জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিকত্ব বশতঃ বিচার তর্ক দর্শনাদির সাহায্য বিনা সকলেই এই সাক্ষাৎ দর্শনে অধিকারী। ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বর তর্কলব্ধ বস্তু বা পুরাণবর্ণিত ঈশ্বর নহেন। ইহার ঈশ্বর জীবন্ত ঈশ্বর। বিশ্ব এই ধর্ম্মের মন্দির, প্রকৃতি পুরোহিত, সকল অবস্থার মানব ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইয়া পূজা করিবার অধিকারী। নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া যেমন সহজে নিষ্পন্ন হয়, আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, ধর্ম্মের মূলসত্য সকল তেমনি সহজ উপলব্ধির বিষয় হয়, আমাদের ইচ্ছার উপরে উহাদের গ্রহণাগ্রহণ নির্ভর করে না। এই সহজ সার্ব্বভৌমিক মূলোপরি ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপিত থাকাতে পৃথিবীর সর্ব্ব প্রকার সাম্প্রদায়িক বিরোধ বিসংবাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত নিত্য কাল সমভাবে অবস্থিতি করিতেছে।" 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র'—১১৯, ১২০ পৃঃ।

এস্থলে সহজ জ্ঞানের পাঁচটী লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে—(১) সাক্ষাৎসম্বন্ধ, (২) অযত্নসম্ভূতত্ব, (৩) সার্ব্বভৌমিকত্ব, (৪) আদিমত্ব ও (৫) স্বতঃসিদ্ধতা। এই পাঁচটী লক্ষণের মধ্যে (১), (২), (৪) ও (৫) লক্ষণকে মূলে একই লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। সাক্ষাৎসম্বন্ধ ও আদিমত্ব একই অর্থবাচক শব্দ, আর অযত্নসম্ভূতত্ব ও স্বতঃসিদ্ধতা আদিম জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। সুতরাং আমরা এস্থলে দুটী লক্ষণ পাইতেছি—(১) আদিমত্ব ও (২) সার্ব্বভৌমিকত্ব। মানবপ্রকৃতি যখন সর্ব্বত্রই মূলে একরূপ, তখন যাহা কিছু আদিম, যাহা কিছু মৌলিক, তাহাই সার্ব্বভৌমিক, ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং সার্ব্বভৌমিকত্বও আদিমত্ব হইতে স্বতন্ত্র কোন লক্ষণ নহে। যাহা হউক আমরা এই আলোচনায় সময় সময়ে ইহাকে স্বতন্ত্র লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করিব

কেশবচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন যে সহজজ্ঞানের সার্ব্বভৌমিকত্ব সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে চিন্তা ও বিচারাদি দ্বারা অনেক মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। আদিম ও সার্ব্বভৌমিক সহজ জ্ঞান অসভ্যদিগের জড়পূজা ও ভূতপূজা এবং সভ্যদিগের নাস্তিকতা, প্রতিমা পূজা ও নরপূজা বারণ করিতে পারে নাই। সহজ জ্ঞানরূপ অনতিক্রমণীয় ভিত্তির উপর সকলেই দাঁড়াইয়া আছে, অথচ এত মতভেদ! এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতকে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন রূপ বলা যায় না, এই সকল মত ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। যাহার উপর দাঁড়াইয়া লোক ব্রাহ্মও হইতে পারে, ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধীও হইতে পারে, তাঁহাকে কখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি বলা যাইতে পারে না। এই সকল ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ মত ভ্রান্ত তর্ক বিচারের ফল, সহজ জ্ঞানের ফল নহে, ইহা বলাতেও নিস্তার নাই। ইহাতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে ভ্রান্ত তর্ক বিচারে সহজ জ্ঞানকে বিকৃত করিয়া ফেলিতে পারে, এবং জগতের অধিকাংশ স্থলেই তাহা করিয়াছে, আর সহজ জ্ঞানের প্রকৃত ব্যাখ্যার জন্য, ইহার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য, বিশুদ্ধ তর্ক বিচার আবশ্যক। সুতরাং যে তর্ক বিচারের পরিবর্ত্তনশীলতা দেখিয়া কেশবচন্দ্র সহজজ্ঞানের অটল ভিত্তির উপর ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপনে প্রয়াসী হন সেই তর্ক বিচারই ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্যতর ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইতেছে। কোন্ বিশ্বাস সহজজ্ঞান-জাত এবং কোন্ বিশ্বাস কল্পনা মাত্র, ভ্রান্ত সংস্কার মাত্র; কোন্ বিশ্বাস বিশুদ্ধ সহজজ্ঞান-সিদ্ধ, আর কোন্‌টাই বা ভ্রম-জড়িত. ইহা যখন বিচার ব্যতীত জানিবার উপায় নাই, সহজ জ্ঞান যখন নিজে নিজের অধিকার রক্ষায় অক্ষম, ইহা যখন বিচারবিহীন হইলে নাস্তিকতা, জড়পূজা, নরপূজা প্রভৃতি যে কোন মতেই লইয়া যাইতে পারে, তখন ইহাকে "ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি" রূপ গৌরবান্বিত নাম প্রদান করা যাইতে পারে না, এবং উপরি-উদ্ধৃত ব্যাখ্যার শেষাংশে কেশবচন্দ্র ইহার পক্ষ হইয়া যে সকল দাবি করিয়াছেন, সে সমুদায়কে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। জীবন্ত ঈশ্বরোপলব্ধি যদি বিচার-নিরপেক্ষ, অযত্নসম্ভূত সহজজ্ঞান-সিদ্ধ ব্যাপার হইত, তবে ইহা এত দুর্লভ বস্তু হইত না। সহজ জ্ঞানকে নিতান্ত পক্ষে সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাসের বা বিশ্বাসের ভিত্তি বলা যাইতে পারে; ইহাকে বিশেষভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি বলা যাইতে পারে না। যে অংশে ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের সাধারণত্ব,

সেই অংশটীকে বরং এক মুহূর্ত্তের জন্য সহজ-জ্ঞান-মূলক বলিতে পারা যায়; কিন্তু সে অংশেও বিচারের প্রভাব আছে, সন্দেহ নাই। অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব যাহা, তাহা বিচার-মূলক বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতামূলক; তাহাকে সহজজ্ঞান মূলক বলিয়া ব্যাখ্যা করা নিতান্ত ভ্রমের কথা।

মৌলিক, সার্ব্বভৌমিক জ্ঞান সমুদায় জ্ঞানের ভিত্তি, এই কথা বলিতে গিয়া কেশবচন্দ্র একটী অকাট্য কথা বলিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশুদ্ধ মৌলিক জ্ঞানকে ভ্রান্ত সংস্কার হইতে মুক্ত করা যখন বিচার-সাপেক্ষ, তখন এই বিচার-প্রণালী স্থিরীকৃত না হইলে উপরি-উক্ত সহজজ্ঞানবাদ দ্বারা বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদের বিশেষ উপকার হয় না। কেশবচন্দ্র এরূপ কোন বিচার-প্রণালী আবিষ্কার বা প্রচার করেন নাই, সুতরাং তাঁহার সহজজ্ঞানবাদ তাঁহার সাক্ষাৎ পরবর্ত্তিগণের হস্তেও কিছুমাত্র বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। বরঞ্চ অনেক স্থলেই ইহা অন্ধ বিশ্বাসবাদ এবং জ্ঞানবিরোধিতায় পরিণত হইয়াছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পূর্ণতা, পরকাল, উপাসনা, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ক বিশ্বাস সার্ব্বভৌমিক ও মৌলিক, এই সমুদায় সম্বন্ধে কোন বিচারের প্রয়োজন নাই, বিচার দ্বারা এই সকল বিষয় বুঝা যায় না, আর এই সকল বিষয়ে সন্দেহ হইলে বিচার দ্বারা সেই সন্দেহ দূর হইতে পারে না, সুতরাং ধর্ম্মের মূল বিশ্বাস সম্বন্ধে বিচার নিষ্প্রয়োজন—কেশবচন্দ্রের সহজজ্ঞানবাদের মর্ম্ম এই, এবং তাঁহার ভাবাপন্ন ব্রাহ্মগণের সাধারণ মত এই। এই মত যে নিতান্ত ভ্রান্ত তাহা সহজেই দেখান যায়।

১। কোন বিশ্বাস সার্ব্বভৌমিক কি না, সমগ্র মানব-জগৎ তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিলে তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং যদি ইহাও স্বীকার করা যায় যে আমাদের জ্ঞাত সকল মানবই উপরি-উক্ত বিশ্বাস সমূহ পোষণ করে, তাহা হইলেও এই সকল বিশ্বাসের সার্ব্বভৌমিকত্ব সপ্রমাণ হইল না। কারণ অনেক অজ্ঞাত মানব থাকিতে পারে, যাহাদের এই সকল বিশ্বাস নাই।

২। নাস্তিকেরা স্পষ্টরূপেই এই সকল বিশ্বাস অস্বীকার করেন। যুক্তিবাদী আস্তিকও বলেন এই সকল বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ নহে, যুক্তি-প্রতিষ্ঠিত মাত্র, সুতরাং সার্ব্বভৌমিক নহে, কেবল জ্ঞানীর সম্ব। নানা উপধর্ম্মের সেবক-

গণ ব্রহ্মবাদ ও বিশুদ্ধ নীতিবাদের বিরোধী। তাহাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস গুলিকে কখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল বিশ্বাসের সহিত এক বলিয়া স্বীকার করা যায় না, সুতরাং তাহাদিগকে এই সকল মূল বিশ্বাসের অধিকারী বলা যায় না। অতএব কেশবচন্দ্র সহজজ্ঞান বলিতে যাহা বুঝিতেন তাহার সার্ব্বভৌমিকত্ব কোথায়? যদি বলেন উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মনে সহজজ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে আছে, তাহারা তাহা বুঝিতে পারিতেছে না, তবে তাহাদিগকে সহজজ্ঞানের সজ্ঞান অধিকারী বলা যায় না, আর সে স্থলে প্রচ্ছন্ন সহজজ্ঞানকে অনাবৃত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক।

৩। কোন বিশ্বাস সার্ব্বভৌমিক হইলেই তাহা সত্য হইবে, জ্ঞানপদবাচ্য হইবে, তাহা বলা যায় না। বিশেষ বিশেষ কালে বিশেষ বিশেষ বিশ্বাস সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়া থাকে, তাহাতে সে বিশ্বাসের সত্যত্ব সপ্রমাণ হয় না। এক কালে প্রেতাত্মা ও ডাকিনীর অস্তিত্বে বিশ্বাস সার্ব্বভৌমিক ছিল, ইহাতে কিছু সেই বিশ্বাস জ্ঞানমূলক বলিয়া সপ্রমাণ হয় না। মানসিক উন্নতির সমান সোপানস্থিত ব্যক্তিগণের সংস্কার অনেকাংশেই এক হইয়া থাকে, তাহাতে সেই সংস্কারের সত্যতা নির্ণীত হইতে পারে না। সুতরাং কেবল সার্ব্বভৌমিকত্ব কোন বিশ্বাসের শেষ প্রমাণ হইতে পারে না।

৪। কোন্ জ্ঞান মৌলিক, আর কোন জ্ঞান জন্য বা মিশ্র, তাহা সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-প্রণালী ব্যতীত স্থির কৃত হইতে পারে না। মানসিক বিশ্লেষণ বিষয়ে অক্ষম বা অলস, বিশ্বাস-প্রবণ, ভাবপ্রধান ব্যক্তির নিকট অনেক বিশ্বাসই মৌলিক বিশ্বাস বলিয়া বোধ হয়; সূক্ষ্ম বিচারক্ষম ব্যক্তি সেই সমুদায় বিশ্বাসেরই মিশ্রত্ব ও জন্যত্ব দেখিতে পান। যাহা ব্রহ্মানন্দের নিকট অমিশ্র মৌলিক জ্ঞান, তাহাই দেখি ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বাবুর নিকট বহু উপকরণযুক্ত মিশ্র জ্ঞান। আদিমত্বের পরীক্ষা কোথায়? আদিমত্ব নির্দ্ধারণের প্রণালী স্থির না করিয়া আদিমত্বের দোহাই দেওয়াতে কোন লাভ নাই। ইহাতে কোন বিশ্বাসের সত্যতা সপ্রমাণ হয় না।

৫। যে জ্ঞান অযত্নসম্ভূত, বিচার নিরপেক্ষ, অনপনেয়, যাহা সমুদায় জ্ঞানের মূল, যাহাতে পণ্ডিত মূর্খের সমান অধিকার, তাহা এত দুর্লভ কেন, এবং তাহা কিরূপে এত বিকৃত ও প্রচ্ছন্নই বা হইতে পারে? কেশবচন্দ্র

বলিতেছেন, "এ জ্ঞান কোন প্রকারে নষ্ট করা যায় না। যদি বলপূর্ব্বক এই জ্ঞান নিরোধ করিয়া রাখা হয়, সময়ে উহা এমনই বল প্রকাশ করে যে, সকল চেষ্টা সকল যত্ন বিফল করিয়া দেয়।" যাহা সমুদায় জ্ঞানের মূল তাহাকে কিরূপে বলপূর্ব্বক নিরোধ করা যাইতে পারে, তাহা আমরা বুঝি না। মূল নিরুদ্ধ হইল অথচ শাখা গুলি বাঁচিতে লাগিল, ইহা কিরূপে সম্ভব? প্রকৃত মৌলিক জ্ঞান যাহা, তাহার অভাবে অন্যান্য জ্ঞান এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। মৌলিক জ্ঞান প্রত্যেক জ্ঞান-কণিকাকে প্রতি মুহূর্ত্তে নিয়মিত করে। কিন্তু এই নিয়-মন প্রক্রিয়া সর্ব্বত্র এবং সকল সময়ে সজ্ঞান নহে। ইহা বুঝিতে হইলে অনেক যত্ন চেষ্টা ও বিচারের প্রয়োজন। মৌলিক জ্ঞান অনেক স্থলেই প্রচ্ছন্ন ভাবে কার্য্য করে, অথচ ইহার ক্রিয়া নিয়ত অনিরুদ্ধভাবে চলিতেছে,—কেশবচন্দ্রের ব্যাখাতে এই তত্ত্বের কোন প্রকাশ নাই।

অতএব ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তি সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র যাহা বলিয়া গিয়া-ছেন তাহা নিতান্তই অসন্তোষকর। তাঁহার প্রচারিত উচ্চ ভক্তি প্রেমের আদর্শ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণকে চিরদিনই পরিচালিত করিবে, কিন্তু তাঁহার অযত্ন-নিক্ষিপ্ত বিজ্ঞানবিন্দুতে ব্রহ্মজ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিগণের পিপাসা নিবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক্, রসনাও সিক্ত হইবে কি না সন্দেহ।

সহজ জ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধে ব্রহ্মতত্ত্বের আগামী খণ্ডে আমাদের বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। এই খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় "আত্মপ্রত্যয় ও ব্রহ্মপ্রত্যয়" এবং "আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে পাঠকগণ আমাদের মতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখা দেখিতে পাইবেন।

—•—

বৌদ্ধদর্শন।

(২)

বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল নির্ব্বাণের মাহাত্ম্য ঘোষণায় পরিপূর্ণ। বৈদান্তিক পরব্রহ্মে লীন হওয়াকে মোক্ষ বলিয়া বিশ্বাস করেন। আত্মা ক্লেদ মলীনতা বা পাপ-বিমুক্ত হইলে, আদিম স্বচ্ছতা পুনরায় লাভ করিলে, মায়ার বিড়ম্বনা সমাপ্ত হইলে, ব্যক্তিত্ব বা সগুণত্ব ঘুচিয়া যাইলে, অনন্তে

মিশিয়া যায়, আর জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই। ব্যক্তিত্বে বিশেষণ, এ বিশেষত্ব হারাইলে আমার আর কি রহিল? সুখ? ভোক্তা কে? সুখ দুঃখের অতীত তখন "সোঽহং"।

বৌদ্ধ আত্মা বা পরমাত্মা বা কোন পদার্থের বিশেষত্ব স্বীকার করেন না, সুতরাং তাঁহার নির্ব্বাণ বৈদান্তিক মোক্ষ নহে।

সাংখ্যকার ক্লেশের নির্ব্বাণকে মোক্ষ বলিয়াছেন। আত্মা ক্লেশ-বিমুক্ত হইলে পরা গতি লাভ করে। ত্রিবিধ দুঃখ-বিমুক্ত আত্মার আর জন্ম জরা মরণ নাই। সাংখ্যকারের পরমাত্মায় বিশ্বাস নাই। মুক্ত আত্মার লয় নাই, ক্রিয়া নাই, ভোগ নাই, বিশেষত্ব নাই। এরূপ মুক্ত আত্মার সত্তায় কাহারও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।

বৌদ্ধের নির্ব্বাণ জন্মের নির্ব্বাণ, জরা মরণ সর্ব্ববিধ ক্লেশের নির্ব্বাণ। জন্ম হইতে ক্লেশ, জন্ম ঘুচিলে সর্ব্ববিধ ক্লেশের নির্ব্বাণ হইল। এ কি তবে মৃত্যু? আত্মহত্যা কি তবে বৌদ্ধের বরণীয়? না—আত্মহত্যায় রিপু, বাসনা, কাম ক্রোধের নির্ব্বাণ হয় না। আত্মহত্যায় পুনর্জ্জন্ম আছে। নির্ব্বাণ মৃত্যু নহে, কারণ জীবিত কালে নির্ব্বাণ লাভ করা যাইতে পারে। বাসনার বিনাশে যাতনার নির্ব্বাণ। জীবিতাবস্থায় সাধনা গুণে বাসনার নির্ব্বাণ, কর্ম্ম ফলের শেষ হয়। বুদ্ধদেব জীবিতা-বস্থায় এই নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। আর কখন তাঁহার পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে হয় নাই। এ জন্য বুদ্ধের মৃত্যুকে মহা পরিনির্ব্বাণ শব্দে উল্লেখ করা হয়।

সুতরাং নির্ব্বাণকে বিনাশ বা মৃত্যু বলিলে কোন দোষ হয় না, যদি সে বিনাশ বা মৃত্যু অর্থে জন্মান্তর লাভের অসংযোগ বুঝা যায়।

বৌদ্ধের নির্ব্বাণ যথেষ্ট উপহাস লাভ করিয়াছে। কিন্তু বৈদান্তিক ও সাংখ্যকারের মোক্ষ বৌদ্ধের নির্ব্বাণ হইতে কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ আমরা বুঝিতে পারি না। আত্মার চির স্থিতিতে তাঁহাদের বিশ্বাস আছে সত্য, এবং বৌদ্ধের সে বিশ্বাস নাই, কিন্তু বিশেষত্ব বা কর্ম্মভোগ-বিহীন ক্লীব অবস্থান ও অনবস্থান ও শূন্যতার প্রভেদ অতি অকিঞ্চিৎকর।

যাঁহাকে হারাইয়াছি স্মৃতিপটে তাঁহার প্রতিকৃতি পাষাণে খোদিত,

তাঁহার রূপের গুণের বিশেষত্ব তাঁহাকে আমার করিয়াছিল। স্বর্গে গিয়া ঠিক তেমনিটী না দেখিলে তাঁহাকে চিনিতে পারিব কি? যদি তেমনটীর কিছুই না দেখি—সমস্ত ঘুচিয়া গিয়া থাকে, তবে তিনিই বা আমার কে আর আমিই বা তাঁহার কে? আবার নাম রূপ যদি সকলই ঘুচিয়া যায়, অচেতন পাষাণের পাষাণত্বও লয় হয়, তবে তিনি থাকিলেই কি আর না থাকিলেই কি? বলিবে চৈতন্য থাকে? বিশেষত্ববিহীন ক্রিয়া, কর্ম্মভোগ-বিরহিত চৈতন্য আর অচৈতন্য উভয়ের প্রভেদ কি? বস্তুতঃ যাহা হারাইয়াছি তাহা চিরদিনের মত হারাইয়াছি।

যত দিন নির্ব্বাণ লাভ না হয়, বাসনার লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেই বীজ হইতে আবার যোগ বিয়োগ সংস্কার হইয়া পুনর্জ্জন্ম ঘটিবে। যতদিন পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনা থাকে ততদিন লোকান্তরে সাক্ষাৎ হইবার ভরসা। জন্মান্তরে বিশ্বাস হারাইয়া বৌদ্ধ বৈদান্তিক ও সাংখ্যকার সকল ভরসা হারাইয়াছেন*।

তবে কি নির্ব্বাণ হইতে পুনর্জ্জন্ম শ্রেষ্ঠ? না, জন্মের সহিত জরা মরণ যাতনা। জীবন মাত্রই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখপূর্ণ। সুতরাং জীবন জন্ম হইতে চিরমৃত্যু প্রার্থনীয়।

বৈদান্তিক ও সাংখ্যকার বেদের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মৌলিক প্রেত-বিশ্বাস তাঁহাদের প্রখর বুদ্ধি কলুষিত করিয়াছিল। অথবা সাধারণের হিতার্থে তাঁহারা বুদ্ধির প্রখরতাকে সংযত করিয়াছিলেন। নির্গুণ ক্রিয়াবিহীন "সৎ," বিশেষত্ববিহীন নির্গুণ আত্মার অমরত্ব আকাশ কুসুমের ন্যায় লোভনীয় নহে।

শাক্যসিংহের ধর্ম্মমতের বিশেষত্ব এই খানে। তিনি বুদ্ধির অগম্য কল্পনামাত্রে প্রতারিত হইতে প্রস্তুত ছিলেন না। অন্ততঃ দৈনিক জীবনের কার্য্য কলাপে তাহাদিগকে টানাটানি করিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। ভিক্ষা বা প্রার্থনা দীনতাসূচক, অথচ প্রার্থনা পূর্ণ হয় না। কর্ম্মফল অবশ্য সম্ভোগ করিতে হইবে, প্রার্থনায় তাহার ব্যত্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলে কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিতা অকিঞ্চিৎকর হয়। অনুতাপ সজীবতার চিহ্ন মাত্র, ভবিষ্যৎ অপরাধ হয়ত কিয়ৎ পরিমাণে নিবারণ করিতে পারে,

কিন্তু অতীত অপরাধের ফল নিবারণ করিতে পারে না। অপরাধের কারণ সকল সময়ে অপরাধের অব্যবহিত পূর্ব্ব নহে। অতীত জন্মের কর্ম্মফলে ইহজন্মে অপরাধ ঘটিতে পারে, আমার অপরাধের কারণ আমার পূর্ব্বপুরুষ, আত্মীয় স্বজন, সমাজ প্রতিবেশি মণ্ডলী, জল বায়ু বৃক্ষলতা বা আমার অবস্থান হইতে পারে। ইহাদের কেহ কিয়ৎ পরিমাণেও অনুতাপ দ্বারা প্রভাবিত হয় না। প্রার্থনা যেমন প্রকৃতির নিয়ম অতিক্রম করিতে পারে না, অনুতাপও তেমনি প্রকৃতির নিয়ম প্রভাবিত করিতে কি কর্ম্মফল রোধ করিতে কিছুমাত্র সক্ষম নহে। প্রকৃতির নিয়ম লৌহ শৃঙ্খলের অপেক্ষা কঠিন। ঈশ্বর থাকিলেও ঈশ্বর সে নিয়মে বদ্ধ। তাঁহার সাধ্য নাই যে আপন নিয়ম যথেচ্ছা পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন। সুতরাং এমন সীমাবদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। মনুষ্যকে আপন পথ আপনি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। আপন পুরুষকারে আপনার পাপ, আপনার দুঃখ যাতন নিবারণ করিতে হইবে, দুঃখ যাতনার কারণ যে প্রবৃত্তি তাহাকে নির্ম্মূল করিতে হইবে, প্রবৃত্তির কারণ যে বাসনা তাহাকে উৎপাটন করিতে হইবে। এই মোক্ষ সাধনে, এই নির্ব্বাণ সঞ্চয়ে, এই মহাকার্য্যে মনুষ্য অনন্যসহায়। দেবতার সাধ্য নাই তাঁহাকে কিছুমাত্র সাহায্য করেন। কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া, কাহারও নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা না করিয়া আপন পুরুষকারে আপন স্বার্থ সাধন করিতে হইবে। বস্তুতঃ শাক্যসিংহ দেবতাকে মনুষ্য করিয়া মনুষ্যকে দেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু হায়, মনুষ্যত্ব আপনার স্বত্ব পুনরায় সাব্যস্থ করিয়া লইয়াছে। আপন প্রতিভায় প্রদীপ্ত হইয়া সিদ্ধার্থ মনুষ্যের প্রাকৃতিক দুর্ব্বলতা হিসাবের মধ্যে গণ্য করেন নাই। সেই নগণ্য দুর্ব্বলতা সময় পাইয়া তাঁহার পবিত্র দর্শনকে কালকূটে জর্জ্জরিত করিয়াছে। তিনি সব্রহ্ম তেত্রীশ কোটী দেবতাকে স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুচরেরা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সম্মুখে অবনত হইয়া আত্মাবমাননার চূড়ান্ত করিয়াছে। সিদ্ধার্থের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে পৌত্তলিকতা বা দেবমন্দির ছিল না। সিদ্ধার্থের বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষে প্রতিমাপূজা, নরপূজা, কঙ্কাল

পূজার একশেষ করিয়াছে, দেহগোপ ও মন্দিরে ভারতবর্ষ পূর্ণ করিয়াছে। তিনি ঈশ্বর মানেন নাই, তাহারা প্রতিমাপূজা করে, তিনি আত্মা মানেন নাই, তাহারা ভূত প্রেত পিশাচের সেবা করে।

সিদ্ধার্থের মৃত্যুর অনতিবিলম্বে তাঁহার শিষ্যগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সেই সকল সম্প্রদায় দুই প্রধান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, হীনায়ন ও মহায়ন। হীনায়নের মত অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ এবং অল্প সংখ্যক লোকে তাহা স্বীকার করে। সিংহলবাসীরা হীনায়ন মতাবলম্বী। তিব্বৎ চীন জাপানে মহায়ন মতের বিশেষ প্রচার। সিংহলের বৌদ্ধেরা মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া ধূপ ধূনা ফুল চন্দনে তাহার পূজা করে; তিনি কখন সিংহলে যান নাই, তবু পর্ব্বতগাত্রে তিনি পদচিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছেন বলিয়া সেই পদচিহ্নের পূজা করে।

মহায়ন বৌদ্ধেরা মহাদেবের স্থানে অবলোকিতেশ্বরকে বসাইয়াছে। একা পুরুষ ঈশ্বরে জগতের ঘর করণা চলে না, ক্রমে তাঁহার একটী দয়িতার আয়োজন করিয়াছে, তাঁহার নাম তারা। দশ দিকে দশ হস্ত প্রশারণ করিয়া ইহাঁরা ভক্তগণকে রক্ষা করেন। ভূত প্রেত সিদ্ধি, মন্ত্র যন্ত্র ইহাদের সকলই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ন্যায়, শেষে ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র কয়েক খানি কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। মহায়ন বৌদ্ধধর্ম্ম এখন তান্ত্রিক হিন্দু ধর্ম্ম। বস্তুতঃ বৌদ্ধদিগকে অত্যাচার করিয়া ব্রাহ্মণগণ কখনও ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করেন নাই। হিন্দুধর্ম্ম আপন বিশ্বোদর উদারতায় তাহাদিগকে স্থান দিয়াছে মাত্র। মুসলমানেরা বৌদ্ধদিগকে প্রপীড়িত করিয়া নির্ম্মূল করিয়াছিল, একথারও কোন মুল নাই। একাদশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এদেশে মুসলমানধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। ইহার পূর্ব্বেই বৌদ্ধেরা বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মে পরিণত করিয়াছিল। হুয়েন্তসাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যবনদিগের ললাটে প্রকৃত কলঙ্কের লেপন যথেষ্ট আছে। অপ্রকৃতের লেপ দিয়া তাহা বাড়াইবার আবশ্যকতা নাই। বৌদ্ধমন্দির ধুইয়া লইয়া ব্রাহ্মণ তাহাতে তারা কালী মহাদেব ও জগন্নাথ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ,—ইহার মতবৈচিত্র ও উদারতা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একটী বৃহৎ ব্রহ্মবাদি-সম্প্রদায়। 'ব্রহ্মতত্ত্বের' পাঠক যে সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিই হউন না কেন, এই বৃহৎ ব্রাহ্ম সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় তত্ত্ব জানিতে তাঁহার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং আমরা এই প্রবন্ধ নিঃসঙ্কোচে পত্রস্থ করিলাম।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পরবিরোধী নানা মত বর্ত্তমান আছে, ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, এই মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের মধ্যে দলভেদ ঘটে নাই। কার্য্যক্ষেত্রে পরস্পরের সহযোগিতার অভাবই দলভেদ। এরূপ দলভেদ তাঁহাদের মধ্যে এখনও ঘটে নাই। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ সমাজের কার্য্যক্ষেত্রে আপনাপন শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে একযোগে কার্য্য করিতেছেন। কিরূপে এই যোগ অব্যাহত থাকিতে পারে, এবং ভবিষ্যতে দলভেদের আশঙ্কা যথাসম্ভব দূরীভূত হইতে পারে, এই বিষয়ের আলোচনাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যাহাকে মতভেদ বলা হইল, তাহাকে বোধ হয় গতিভেদ বলিলে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হয়। আপাত-ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে পরস্পরের সম্মুখীন্ করিয়া আপনাপন মত ব্যাখ্যা করিতে বলিলে দেখা যায়, তাঁহাদের মতে মতে কোন বিরোধ নাই, কিন্তু তাঁহাদের মনের গতি, জীবনের গতি, অল্পাধিক পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে তাঁহাদিগকে ভিন্ন মতাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। যথা, অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, মহাপুরুষবাদ, আদেশবাদ, বিধানবাদ প্রভৃতি মতসম্বন্ধে কোন কোন নববিধানী ব্রাহ্মের সহিত সাধারণ সমাজভুক্ত ব্রাহ্মদের একমত, অথচ কার্য্যকালে এই দুই শ্রেণীর লোককে এক মতাবলম্বী বলিয়া বোধ হয় না, তাহার কারণ তাঁহাদের মনের গতি, জীবনের গতি, ভিন্ন ভিন্ন দিকে। যাহা হউক, এখন আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্মদিগের তিনটী ভিন্ন ভিন্ন গতি নির্দ্দেশ করিব, এবং দেখাইব যে তাঁহাদের মতবৈচিত্র্য আপাত হউক আর প্রকৃতই হউক, গতির ভিন্নতাই ইহার মূল কারণ।

প্রথম গতি স্থিতিশীলতার দিকে। যাহা একবার সত্য বলিয়া বুঝা গিয়াছে, যদ্দ্বারা জীবনের মহদুপকার সাধিত হইয়াছে, তাহাকে রক্ষা করার, তাহাতে স্থিতি করার প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এই প্রবৃত্তি অল্পাধিক পরিমাণে সকলেরই আছে, এবং থাকাও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ইহার আতিশয্য হওয়া দোষের বিষয়। সংগ্রামদ্বারা সত্য লাভ করিয়া মানুষ ক্লান্ত হইয়া পড়িতে পারে এবং সেই ক্লান্তি আধ্যাত্মিক আলস্য ও জড়তা জন্মাইতে পারে। যে সত্য লাভ করিয়াছি, তাহা ভাল করিয়া বুঝা, এবং নূতন নূতন সত্য লাভ করা, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নততর সোপানে উঠিবার চেষ্টা,—এই সকল প্রবৃত্তি হ্রাস হইয়া যাইতে পারে, এবং উন্নতিশীল ব্যক্তিদিগকে অস্থিরমতি, চঞ্চলপ্রকৃতি ও বিপ্লবপ্রিয় বলিয়া বোধ হইতে পারে। প্রাচীন সমাজে এই নিন্দনীয় স্থিতিশীলতা পূর্ণরূপে বর্ত্তমান। ব্রাহ্মসমাজেও অল্পাধিক পরিমাণে এই স্থিতিশীলতা আছে, এবং অনেক স্থলে ইহা নিন্দনীয় আকার ধারণ করিয়াছে, ইহা আমাদের বিশ্বাস। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সমূহ বহু সংগ্রামে অর্জ্জিত হইয়াছে, এই সকল সত্য পাইয়া ব্রাহ্মগণ মহা অনিষ্ট হইতে মুক্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সাধনপ্রণালীতে তাঁহাদের জীবনে মহদুপকার সাধিত হইয়াছে ও তাঁহাদের হৃদয়ে উজ্জ্বল আশার সঞ্চার হইয়াছে। এই সকল সত্য ও এই সাধনপ্রণালীকে রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি, এবং এই সমুদায়কে পরিত্যাগ করা বা নিন্দা করার গতি কোথাও লক্ষ্য করিলে মর্ম্মাহত হওয়া সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক এবং প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি দেখা যায় লব্ধ সত্য সমূহকে উজ্জ্বলরূপে বুঝিবার চেষ্টা নাই, নূতন সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষা নাই, গভীররূপে সত্য সম্ভোগ করিবার প্রবৃত্তি নাই, জগৎ চিন্তা ও সাধনে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু ব্রাহ্ম বহু বৎসর ধরিয়া এক স্থানেই দণ্ডায়মান; বরঞ্চ, যাহারা উন্নতির জন্য লালায়িত তাহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী বলিয়া ভৎর্সনা করিতেছেন, তাহা হইলে বলিব তাঁহার জীবনে স্থিতিশীলতার আতিশয্য হইয়াছে, তিনি ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে অলস হইয়া পড়িয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অনেক ব্রাহ্মের মধ্যে এই স্থিতিশীলতার আতিশয্য ঘটিয়াছে। জগতের স্বাভাবিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যসমূহ সম্বন্ধে লোকের মনে যে সকল নূতন প্রশ্ন উঠিয়াছে, তাঁহারা সেই সকল প্রশ্ন বুঝেন না, এবং সেই সকল প্রশ্নের উত্তরদানে

অসমর্থ। আধ্যাত্মিক সাধনের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃ আত্মাতে যে যোগপিপাসার উদ্রেক হয়, সেই পিপাসা তাঁহাদের নাই, সুতরাং ইহার সহিত সহানুভূতিও নাই। এমন কি, পারিবারিক ও সামাজিক উন্নতিরূপ যে অপেক্ষাকৃত স্থূল বিষয়, যাহাতে অনেক স্থিতিশীল ব্রাহ্মেরও উৎসাহ দেখা যায়, তজ্জন্য সমাজমধ্যে কোন নূতন প্রণালী অবলম্বিত হইলে, বা অবলম্বনের কথা হইলে তাহাতেও কেহ কেহ বিরোধী হন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মগণ পরিবর্ত্তনের বিরোধী, এবং পরিবর্ত্তন দেখিলে ভয় পান। তাঁহাদিগকে দেখিলে মনে হয় ব্রাহ্মসমাজের বয়স যেন এখনও ৩০।৪০ বৎসরের অধিক নহে। বিগত ৩০।৩৫ বৎসর যেন সমাজের পক্ষে বৃথাই গিয়াছে।

আর একটী গতির কথা বলিতেছি। সমাজের নেতাদিগের সহিত যত দিন সাধারণ সভ্যগণের ঘনিষ্ট আধ্যাত্মিক যোগ ছিল, যত দিন প্রবীণদিগের সাধনের ফল যুবকগণ অবাধে পাইতেছিলেন, ততদিন ব্রাহ্মসমাজে এই গতি দেখা দেয় নাই। নেতাদিগের সাধনশৈথিল্য বশতঃই হউক, অথবা শিষ্যবাৎসল্যের অভাববশতঃই হউক, যখন এই যোগের অভাব ঘটিল, তখনই সমাজমধ্যে গুরুকরণের গতি দেখা দিল ও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই গতিতেও আমরা কোন মৌলিক নিন্দনীয়তা দেখি না, এবং ইহা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে ঠিক নূতনও নহে। আচার্য্যের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করা, আচার্য্যের সাহায্যে ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হওয়া, ইহা সম্পূর্ণরূপেই ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত। এই দীক্ষা-প্রণালীও ব্রাহ্মসমাজে চলিত আছে, তবে আচার্য্য ও শিষ্যের যোগ দীক্ষার মুহূর্ত্তকে অতিক্রম করিয়া অধিক দূর যায় না, ইহাই দুঃখের বিষয়। নূতন গুরুকরণের নূতনত্ব—এমন গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা যিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত নহেন। ইহাকেও ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ বলা যায় না। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ এই, সত্য যেখানে পাওয়া যায় সেখান হইতেই গ্রহণ করিবে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মেরা যখন সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎভাবে সকলেই প্রাচীন হিন্দু সাধকদিগের সন্তান, তখন হিন্দুসমাজ-ভুক্ত সাধকদিগের নিকট যোগভক্তি শিখিতে যাওয়া সম্পূর্ণরূপেই স্বাভাবিক। এরূপ শিখিতে যাওয়াতে বিপদের আশঙ্কা থাকিলেও এই শিষ্যভাবকে, এই শিক্ষার্থিতাকে, বাধা দেওয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারভাবের বিরুদ্ধ। বিপদের আশঙ্কা সর্ব্বত্রই আছে, তাহা বলিয়া কি মানুষকে সর্ব্বদাই সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ

থাকিতে হইবে? বৈষ্ণব গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অনেক ব্রাহ্ম বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ দুর্ঘটনাতে যে উপরি-উক্ত আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং এরূপ গুরুকরণ গভীর আপত্তিজনক বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আরো দেখা যায়, এই গতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত আছেন, তাঁহারাও বৈষ্ণবভাবের অত্যন্ত পক্ষপাতী। কৃষ্ণলীলার আধ্যাত্মিক ভাব তাঁহারা এত উচ্চ মনে করেন যে ক্রমশঃ তাঁহাদের সমগ্র সাধন, এমন কি ভাষা পর্য্যন্ত বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হইয়া যাইতেছে। এই গতিকে নিতান্ত বিপদসঙ্কুল বলিয়া মনে করিলেও যদি ইহা এখানেই শেষ হয়, তবে আমরা ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু যখন দেখি কৃষ্ণলীলা ঘাটাঘাটী করিতে গিয়া ব্রাহ্ম ক্রমশঃ পৌরাণিক মিথ্যা গল্পকে সত্য বলিয়া মনে করিতেছেন, কল্পনার মোহিনী শক্তিতে তাঁহার বিচারশক্তির হ্রাস হইতেছে, সাকার লীলার আধ্যাত্মিকতা সম্ভোগ করিতে গিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিকতাই মন্দীভূত হইতেছে, তিনি ব্রহ্মোপাসনার আধ্যাত্মিকতা ভুলিয়া ক্রমশঃ সাকার ভাবনার দিকে, প্রতিমাপূজার দিকে অগ্রসর হইতেছেন, বিশেষতঃ ব্রাহ্মের উচ্চাধিকার স্বাধীন চিন্তা বিচার পরিত্যাগ করিয়া অন্ধভাবে গুরু ও শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইতেছেন, তখন ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহারা কেবল সামাজিক সম্বন্ধ দেখিয়া আর ব্রাহ্মগণ তৃপ্ত থাকিতে পারেন না, তখন তাঁহার এই আত্যন্তিক গুরু-অভিমুখী মতের প্রতিবাদ করিতে তাঁহারা বাধ্য। কিন্তু তখনও তাঁহার বিপক্ষে তিরস্কার ও সমাজচ্যুতী-করণরূপ বাহ্য ও নীচ অস্ত্র ধারণ উচিত নহে। এরূপ অস্ত্রধারণে কেবল ইহাই প্রকাশ পায় যে প্রতিবাদকারীর স্বপক্ষে যুক্তিবল নাই, অথবা তিনি স্বয়ং আত্যন্তিক স্থিতিশীলতাবশতঃ অলস ও বিচার-বিমুখ।

আর একটী গতির উল্লেখ করিতেছি। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, পূর্ব্বোক্ত দুই গতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন শ্রেণীই ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যসমূহ বিচারদ্বারা বুঝিতে উদ্যোগী নহেন। এই উদ্যোগ যাঁহা-

দের আছে, আমরা এখন তাঁহাদের কথা বলিতেছি। মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, ইহাঁরা তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। ইহাঁরা দর্শনালোচনা ও নিজ বিচার সাহায্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে নূতন আলোক লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। দার্শনিক বিচারবিহীন অথবা স্থূল বিচারসম্মত ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারসম্মত ব্রাহ্মধর্ম্ম, এই দুয়ে অল্লাধিক প্রভেদ হইবারই কথা। অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং দার্শনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে এই প্রভেদ ক্রমশঃই পরিষ্কাররূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই দার্শনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল ২।৪ জন পণ্ডিতলোকের মধ্যে আবদ্ধ নহে। যাঁহারা গভীরতর দার্শনিক সাহিত্য অধ্যয়নে অপেক্ষাকৃত অসমর্থ, অথচ যাঁহাদের মন স্বভাবতঃ চিন্তাশীল ও বিচারপ্রবণ, এরূপ অনেক ব্যক্তির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নূতন দার্শনিক মত প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে। আত্যন্তিক স্থিতিশীল ব্যক্তিগণ এই সকল অভিনব মত দেখিয়া ভীত হন বটে, কিন্তু বস্তুতঃ ভয়ের কারণ ইহাতে কিছুই নাই। দার্শনিক আলোচনায় ব্রাহ্মধর্ম্মের অটল ভিত্তি টলিবার নহে, বরঞ্চ দৃঢ়ীকৃত হইবারই কথা। পক্ষান্তরে, যে মত দর্শনের দৃঢ়মুষ্টির ভিতরে পড়িলেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, সে মত রক্ষণযোগ্য নহে, সে মত সম্বন্ধে যিনি রক্ষণশীল, তাঁহাকে অসত্য লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে হইবে, সত্যলাভ তাঁহার ভাগ্যে নাই। তার পর, গুরুকরণ গতির আতিশয্য বশতঃ যে সকল অনিষ্ট ঘটিয়াছে, দার্শনিক গতির সেরূপ কোন ফল এখনও দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু না হইয়া থাকিলেও ভবিষ্যতে হওয়া অসম্ভব নহে। দার্শনিক চিন্তা আধ্যাত্মিক সাধনবিরহিত হইলে শুষ্কতা ও নিষ্ক্রিয়তা জন্মাইতে পারে, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মের উপকার না করিয়া মহা অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে আরো একটী আশঙ্কার কারণ আছে, সেই আশঙ্কাটী ইদানীং কাহারও কাহারও মনে উদিত হইয়াছে। গুরুকরণ-গতির ন্যায় কোন কোন স্থলে দার্শনিক গতির ও প্রাচীনসমাজের দিকে আকর্ষণ দেখা যাইতেছে। এই আকর্ষণের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইলে আলোচ্য দার্শনিক গতি সম্বন্ধে আরো ২।১টী কথা বলা আবশ্যক। যে নূতন দার্শনিক মত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রচারিত হইতেছে, তাহা ব্যক্তি ভেদে অল্লাধিক ভিন্ন হইলেও তাহা মোটের উপর

ইউরোপীয় দার্শনিক অধ্যাত্মবাদ (Idealismএর) সদৃশ। এই মতের সহিত এদেশীয় বেদান্তমতের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। পাশ্চাত্য অধ্যাত্মবাদের পক্ষপাতী কেহ কেহ ইদানীং বিশেষভাবে দেশীয় শাস্ত্রালোচনা করাতে, এবং অপর কেহ কেহ তাঁহাদের অধ্যয়নের ফললাভ করাতে, দেশীয় উচ্চতর শাস্ত্রের উপর ইহাঁদের একটা বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছে। দেশ মধ্যে জাতীয়-ভাবের বিশেষ অভ্যুত্থান ও দেশীয় শাস্ত্রের বহুল প্রচার, এই সমুদায় ঘটনাও কিয়ৎপরিমাণে উক্ত অনুরাগের কারণ। যাহা হউক, উচ্চতর হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি এই অনুরাগ ও শ্রদ্ধাবশতঃ কাহারো কাহারো মধ্যে কিয়ৎ-পরিমাণে নূতন একটা মত দাঁড়াইতেছে। সেই মতটী এই—ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশের পক্ষে নূতন ধর্ম্ম নহে, ইহা উপনিষদাদি ব্রহ্মবাদ-প্রতিপাদক হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত ধর্ম্ম। ব্রাহ্মসমাজও হিন্দু সমাজ হইতে স্বতন্ত্র একটা সমাজ নহে, ইহা সুসংস্কৃত হিন্দু সমাজ মাত্র। আমরা অন্য জাতি হইতে শিক্ষা করিব বটে, কিন্তু যত দূর সম্ভব ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি জাতীয় সাহিত্য ও ইতি-বৃত্তের সহিত যোগ রাখিয়া করা উচিত। এই মত যে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে নূতন মত নহে, আদি ব্রাহ্মসমাজ যে বরাবরই এরূপ মত প্রচার করিয়া আসি-তেছেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন। কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের হিন্দুভাব ও এই নব-প্রচারিত হিন্দুভাবের মধ্যে দুটী বিশেষ প্রভেদ আছে, তাহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, এক অর্থে নূতন প্রচা-রিত হিন্দুভাব আদি ব্রাহ্মসমাজের হিন্দু ভাবাপেক্ষা গাঢ়তর। আদি ব্রাহ্মসমাজ উপনিষদের পক্ষপাতী হইয়াও উপনিষদুক্ত ধর্ম্মের কতিপয় মূল মতেরই প্রতি-বাদ করিয়াছিলেন। উপনিষদুক্ত অদ্বৈতবাদ, পুনর্জ্জন্মবাদ প্রভৃতি মত আদি-ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ ও প্রতিবাদ করেন; অভিনব দার্শনিকগণ "জগৎ ব্রহ্মের প্রকাশ," "জীবাত্মা পরমাত্মার অনুপ্রকাশ," "দ্বৈতাদ্বৈতবাদ"প্রভৃতি মতের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে পরিত্যক্ত অদ্বৈতবাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, এবং পুন-র্জ্জন্মবাদের স্পষ্ট সমর্থন না করুন, ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে বিরত হই-য়াছেন। এই সকল বিষয়ে নূতন হিন্দুভাব আদি সমাজের হিন্দুভাবাপেক্ষা গাঢ়তর ও প্রকৃততর। ফলতঃ কোন কোন বিষয়ে নূতন দার্শনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম তিন সমাজেরই সাধারণে চলিত আধুনিক মত অপেক্ষা রাজা রামমোহন

রায়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম ও উপনিষদুক্ত ধর্ম্মের নিকটতর। কিন্তু অপর কোন কোন বিষয়ে নূতন হিন্দুভাব আদি ব্রাহ্মসমাজের হিন্দুভাবাপেক্ষা অনেক তরল। আদি ব্রাহ্মসমাজের হিন্দুভাব জাতিভেদ ও অন্যান্য সমাজিক বিষয়ে রক্ষণশীল, নব হিন্দুভাব এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপেই সংস্কারের পক্ষপাতী। ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত গুরুকরণ গতিতে সংস্কার সম্বন্ধে যে সকল আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে আলোচনাধীন দার্শনিক গতিতে যে সে সকল আশঙ্কার কারণ নাই, তাহা এই কয়েকটী কথা বিবেচনা করিলেই প্রতীত হইবে।

১। এই গতি স্বাধীন চিন্তা-প্রসূত, ইহাতে গুরু ও শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ নির্ভরের ভাব কিছু মাত্র নাই। পাশ্চাত্য দর্শন ও দেশীয় বেদান্তাদি শাস্ত্রের প্রতি নূতন দার্শনিকগণের পক্ষপাত কেবল ততটুকুই যত টুকু এই সকল শাস্ত্র তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তার সহিত মিলে।

২। দেশীয় শাস্ত্রের মধ্যে ব্রহ্মপ্রতিপাদক, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা-প্রতিপাদক জ্ঞানপ্রধান শাস্ত্রের দিকেই ইহাদের অনুরাগ। এরূপ শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ ইহাদিগকে পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য কুসংস্কারের দিকে লইয়া যাওয়া সম্ভব নহে।

৩। নূতন দার্শনিকদিগের প্রকৃত নেতা দেশীয় শাস্ত্রকারগণ নহেন—পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ। ইহারা পাশ্চাত্য দর্শনলব্ধ আলোকে দেশীয় শাস্ত্রের সত্য দেখিতে পান। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত ইহাঁদের সাক্ষাৎ যোগ থাকাতে দেশীয় শাস্ত্রের আত্যন্তিক পক্ষপাতী হওয়া ইহাঁদের পক্ষে অসম্ভব।

৪। ইহাঁরা কোন কোন বিষয়ে বেদান্ত মতের পুনঃ স্থাপনের উদ্যোগী হইলেও বেদান্তকে অভ্রান্ত বলেন না, পরন্তু কোন কোন বিষয়ে বেদান্ত মতের সংস্কার আবশ্যক বোধ করেন। ইহারা ধর্ম্মের ক্রমিক বিকাশ সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার করেন।

৫। সাধনবিহীন হইলে শুষ্ক ও নিষ্ক্রিয় হওয়া সকলের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু অলোচ্য দার্শনিক গতিতে প্রেম ও কার্য্যকারিতার বিরোধী কিছুই দেখা যায় না। নূতন দার্শনিকগণের কেহই অভক্তি ও নিষ্ক্রিয় ভাবের সমর্থন করেন নাই। পাশ্চাত্য যে সকল দার্শনিকগণের সহিত ইহাঁদের আধ্যাত্মিক যোগ, তাঁহারা সকলই প্রীতি ও কার্য্যসাধনের পক্ষ। এদেশীয় শঙ্কর-

সম্প্রদায় অভক্ত ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ বটে, কিন্তু রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি অন্যান্য বৈদান্তিক শাখায় প্রেম ভক্তি ও কার্য্যকারিতার অভাব নাই।

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন গতি ও মতের সম্বন্ধে সমাজের কিরূপ ভাব অবলম্বন করা উচিত, এখন সে বিষয়ে ২।৪ টী কথা বলিব। ১। 'তরবারিদ্বারা ধর্ম্মপ্রচার হয় না' এই সত্যটী ইহাঁদের অনেকের এখনও শিখিতে বাকি আছে। ইহাঁরা ইস্পাতের তরবারি ধারণ করেন না বটে, সুবিধা থাকিলে কি করিতেন জানি না, কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাসের বিপক্ষে বিদ্রূপ, নিন্দা, উৎপীড়ন ও সমাজচ্যুতীকরণের চেষ্টারূপ তরবারি ধারণ করিতে অনেকেই কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু ধর্ম্মমতের বিপক্ষে বিচার, যুক্তি, সাধনাভিজ্ঞতা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক অস্ত্রই এক মাত্র উপযুক্ত। যিনি এরূপ আধ্যাত্মিক অস্ত্র প্রয়োগ না করিয়া কেবল নিজমতের প্রাচীনত্ব ও লোকবল দেখাইয়া পরমত খণ্ডন করিতে যান, বিরুদ্ধ মতাবলম্বীকে বলেন, "তোমার মত নূতন, ইহা চলিত মত নহে, অধিকাংশের মত নহে, ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে, তুমি ইহা পরিত্যাগ না করিলে তোমার নাম আমাদের সভ্যের তালিকা হইতে কাটিয়া দিব", তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ হয় যে তিনি নিজ চিন্তার সাহায্যে নহে, কিন্তু অপর দশ জনের হুজুকে পড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা যদি এক সময়ে চিন্তা সংগ্রামের দ্বারাই ইহা লাভ করিয়া থাকেন, এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহার পক্ষে পরিচ্ছদাদির ন্যায় একটা সামাজিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এখন আর ইহা স্বাধীন চিন্তা, সংগ্রাম ও সাধনের ব্যাপার নহে। নিজ চিন্তা সাধনাদি আধ্যাত্মিক সংগ্রাম চক্ষুর সম্মুখে থাকিলে অবশ্যম্ভাবি রূপেই অন্যের মত সম্বন্ধে সহিষ্ণু ও উদার হইতে হয়।

২। ভিন্ন মতাবলম্বী ভ্রাতাকে উৎপীড়ন করাই যে কেবল অন্যায় তাহা নহে। তিনি যত দিন সমাজের মূল সত্যে বিশ্বাসী থাকেন, তত দিন তাঁহাকে সভ্যের সাধারণ অধিকার, অথবা তাঁহার বিশেষ ক্ষমতানুরূপ বিশেষ অধিকার হইতে বঞ্চিত করাও অন্যায়। সমাজের প্রকাশ্য সভায়, যথাযথ বিচারের পর যে সকল সত্য সমাজের ভিত্তিরূপ মূল সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, সেই সকল সত্যের বিরুদ্ধ মত অবশ্য সমাজের অঙ্গীভূত মণ্ডলী, সভা সমিতি বা সাময়িক পত্রিকাদিদ্বারা প্রচারিত হইতে দেওয়া যাইতে পারে না, কিন্তু যে সকল মত এইরূপে গৃহীত হয় নাই, অথচ আনুমানিক গণনায় যাহা হয়তঃ অধিকাংশ

সভ্যের মত, সে মত কেবল অধিকাংশের মত বলিয়াই বিশেষ সম্মানের বস্তু নহে, এবং তদ্বিরুদ্ধ মত কেবল অপেক্ষাকৃত অল্পাংশের মত বলিয়াই অসম্মানের বস্তু নহে। যে মত প্রকাশ্যরূপে বিচারিত, পরীক্ষিত, গৃহীত বা বর্জ্জিত হয় নাই, যে মত হয়ত আজ আছে কাল থাকিবে না, যে মত হয়ত সাময়িক উত্তেজনার প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার বিপরীত উত্তেজনায় পরিত্যক্ত হইবে, যে মত আজ অধিকাংশের, কাল অর্দ্ধাংশের, এবং পরস্ব অল্পাংশের মত হইয়া দাঁড়াইতে পারে, সে মত অধিকাংশের হউক, আর অল্পাংশেরই হউক, তাহাকে সমাজের মত মনে না করিয়া ব্যক্তিগত মত বলিয়াই মনে করা উচিত, এবং এরূপ মতবিরোধী ব্যক্তি উপযুক্ত ও শ্রদ্ধেয় হইলে তাঁহার নিকট সমাজের বেদী, বক্তৃতা-মঞ্চ, পত্রিকার স্তম্ভ প্রভৃতি সমুদায়ই অবারিত-দ্বার থাকা উচিত। নতুবা যদি লোকবলে প্রবল অধিকাংশ, দুর্ব্বল অল্পাংশের উপর উৎপীড়ন করিবার অধিকার পান, সমাজের মণ্ডলী, সভা, সমিতি শিক্ষালয়, পত্রিকা প্রভৃতি নিজায়ত্ত করিয়া অল্পাংশের মুখ বন্ধ করিবার ক্ষমতা পান, তবে বুঝা গেল সমাজ প্রধানতঃ বাহুবলের দ্বারাই পরিচালিত, ইহাতে বিচার, আধ্যাত্মিক প্ররোচনা প্রভৃতি ধর্ম্মবলের অপেক্ষা অন্ধ লোক-বলের প্রভাবই অধিক। আভ্যন্তরীণ ধর্ম্মবল অপেক্ষা বাহ্যিক লোকবলকে প্রাধান্য দিলে যে অচিরে সমাজ একটা স্থিতিশীল, প্রাণ ও উন্নতিবিহীন দল-মাত্রে পরিণত হইবে, এবিষয় অধিক বলা বাহুল্য। যাহা হউক, সাধারণতঃ এই বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদারতা প্রশংসনীয়। কিন্তু কোন কোন স্থলে,কোন কোন ঘটনায়,এই উদারতার অভাবও হয়, সেই জন্যই তাঁহাদিগকে উল্লিখিত উদার নীতি স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। সমাজের সভা সমিতি পত্রিকাদিতে যদি সমাজের অন্তর্গত স্বাধীন চিন্তা প্রকাশ করিতে না দেওয়া হয়, এই সকল প্রচার-যন্ত্র যদি কোন বিশেষ বিশেষ মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের যন্ত্ররূপেই ব্যবহৃত হয়, তবে অচিরে সমাজে কিরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইবে তাহা ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের শেষাবস্থার দৃষ্টান্তে সহজেই বুঝিতেছি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই সমাজের বেদী, বক্তৃতামঞ্চ, পত্রিকাদি কতিপয় ব্যক্তিবিশেষের করায়ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই ব্যক্তিগণ অধিকাংশ সমাজিকগণের দ্বারা সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ ভাবে সমর্থিত হইতে-

ছিলেন। সমাজের কতিপয় অল্প সংখ্যক স্বাধীনচেতা ও উপযুক্ত ব্যক্তি কিছুতেই সকল যন্ত্রের সুবিধা লাভ করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বতন্ত্র উপাসনার স্থান, স্বতন্ত্র বক্তৃতার আয়োজন, স্বতন্ত্র সাময়িক পত্রিকা প্রচার করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। অবশেষে বিধাতার বিধানে প্রশস্ততর, স্বাধীনতর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু এই সমাজের পরিচালকগণও যদি তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিদিগের ন্যায় অপরিণামদর্শী ও অনুদার হন, সমাজান্তর্গত ব্যক্তিগণের স্বাধীন মতকে সম্মান না করিয়া, বিচার প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বলে সুনিয়মিত করিতে চেষ্টা না করিয়া, লোকবলদ্বারা চাপিয়া রাখিতে বা দূর করিতে প্রয়াস পান, তবে অচিরে তাঁহাদেরও নেতৃত্বের-দিন অবসন্ন হইবে, সন্দেহ নাই।

আত্মার অমরত্ব ও পুনর্জন্ম।*

'আত্মা'র অর্থ যাহা আপনা আপনি থাকিতে পারে, যাহার অস্তিত্ব অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না, যাহার সত্তা আপেক্ষিক নহে, নিরপেক্ষ। যাহার সত্তা অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে, তাহাই অনাত্মা।

যাহাকে আমরা জড় বলি, যাহা দেখা যায়, শুনা যায়, স্পর্শ করা যায়, আঘ্রাণ করা যায়, আস্বাদন করা যায়, তাহার অস্তিত্ব আপেক্ষিক। তাহা কেবল দৃষ্ট, শ্রুত, স্পৃষ্ট, আঘ্রাত বা আস্বাদিত, এই ভাবেই প্রকাশিত হয়, এবং কেবল এই ভাবেই চিন্তা বা বিশ্বাসের বিষয়ীভূত হইতে পারে। এক কথায়, কেবল জ্ঞাত বা জ্ঞেয় রূপেই অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত, জ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত, এই ভাবেই থাকিতে পারে। জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ না করিয়া যাহার সম্বন্ধে কিছুই ভাবা এবং বলা যায় না, তাহার জ্ঞাননিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে,—তাহা জ্ঞানকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে আছে—ইহা স্ববিরোধী সুতরাং অসঙ্গত কথা। সুতরাং জড় অনাত্ম বস্তু, ইহার স্বতন্ত্রতা নাই, স্বাধী-

---

*এই প্রবন্ধের কোন কোন অংশ ইতিপূর্ব্বে 'দাসী' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

নতা নাই, আত্ম-প্রতিষ্ঠা নাই, অর্থাৎ এক কথায় আত্মত্ব নাই, ইহা অনাত্মা। তারপর, যে বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয় না, অথচ কার্য্য দেখিয়া আমরা যাহার অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করি, যাহা অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য হইয়াও দেশে বিস্তৃত, যাহার আন্দোলন আছে, রূপান্তর আছে, গতি আছে, যথা আলোক উত্তাপ প্রভৃতির কারণরূপী ইথার, তাহা স্থূল ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ হইয়াও যখন দেশ কালের অন্তর্গত, এবং দেশ কাল যখন জ্ঞানের বিষয়ীভূত, জ্ঞানে প্রকাশিত, সুতরাং জ্ঞানাশ্রিত, তখন এরূপ সূক্ষ্ম বস্তু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও জড়, সুতরাং আত্মত্বশূন্য,—অনাত্মা। তারপর, যাহা দৃশ্য নহে, স্পৃশ্য নহে, কোন ইন্দ্রিয়গোচরই নহে, যাহা কেবল অতীন্দ্রিয় অনুভবের বিষয়; যাহা দেশে বিস্তৃত নহে, গতি এবং আন্দোলনযুক্তও নহে, অথচ যাহা কালে প্রকাশিত; যাহার উৎপত্তি আছে, বিলয় আছে, পরিবর্ত্তন আছে, যথা সুখ, দুঃখ, আসক্তি, বিরক্তি, উৎসাহ, ঔদাস্য ইত্যাদি, এই সমুদয় বস্তু দেশের অন্তর্গত নহে বলিয়া জড় অভিধেয় না হইলেও যখন কালের অধীন, এবং জ্ঞানের বিষয়ীভূত, তখন ইহাদেরও আত্মত্ব নাই, ইহারাও অনাত্মা।

এই সকল অনাত্ম বস্তু জ্ঞানের বিষয়ীভূত, জ্ঞানে প্রকাশিত, জ্ঞানের আশ্রিত। সুতরাং এই জ্ঞানবস্তুর নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তা থাক্ আর নাই থাক্, ইহা যে এই সকল অনাত্ম বস্তুর অধীন নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। যাহার 'আমি দেখি,' 'আমি শুনি,' 'আমি জানি,' না হইলে এই সকল দৃশ্য, শ্রবণীয়, জ্ঞেয় বস্তুর প্রকাশ অর্থাৎ অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় না, সে ইহাদের অধীন, এবং ইহাদের বিনাশে বিনাশশীল, ইহা স্পষ্টতঃই স্ববিরোধী সুতরাং অসঙ্গত কথা। জ্ঞানের উপর ইহাদের একান্ত নির্ভরশীলতা না বুঝাতেই এ বিষয়ে সন্দেহ আসে, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলে আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

এখন দেখা যাক্, যে জ্ঞানবস্তুর সম্বন্ধে উপরি-উক্ত অনাত্ম বস্তু সমূহ আপেক্ষিক, সেই জ্ঞানবস্তুর আত্মত্ব আছে কিনা। এই জ্ঞান বস্তুর প্রকৃতি স্পষ্টরূপে আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। অনাত্মবস্তু সমূহের সহিত ইহার আধার আধেয়ত্বের,—আশ্রয় আশ্রিতের—সম্বন্ধ বটে, কিন্তু অনাত্মবস্তু সমূহের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ আশ্রয় আশ্রিতের সম্বন্ধ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ সেরূপ

নহে। তৈলপাত্র ও তৈলের মধ্যে যে সম্বন্ধ, শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, বায়ুর আঘাত ও বৃক্ষ পতনের মধ্যে যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধে দেশ, কাল ও ভৌতিক প্রতিরোধের ভাব রহিয়াছে। কিন্তু জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধের মধ্যে এই সকল ভাব নাই। অনাত্ম আশ্রয় অন্য অনাত্মবস্তুকে আশ্রয় দিতে গিয়াও নিজের অনাত্মত্ব পরিত্যাগ করে না, বিষয়ত্ব পরিত্যাগ করে না। পাত্র, শরীর ও বায়ু, তৈল, অঙ্গ ও পতনের আশ্রয় ও কারণ হইয়াও বিষয়ত্ব ও আশ্রিতত্ব পরিত্যাগ করে না। পরন্তু দেশ কাল শক্তি প্রভৃতি বিষয়ত্ব গুণের আধিক্য বশতঃই এই সকল বস্তু অন্য বস্তুর আধার বা কারণ। কিন্তু জ্ঞান জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে এই কথা খাটে না। আমার দৃশ্য, স্পৃশ্য, জ্ঞেয় বস্তুর সহিত আমার যে-সম্বন্ধ, সে কেবল নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানের সম্বন্ধ। আমি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, জ্ঞাতা বলিয়াই ইহাদের আশ্রয়। আমার জ্ঞাতৃত্বেই আমার আধারত্ব, আশ্রয়ত্ব। আমার শরীর এখানে আছে, ইহাতে আমার আশ্রয়ত্ব নহে, কেননা আমার শরীরও অন্য জড় বস্তুর ন্যায় আমার বিষয়। আমি এখানে আছি, ইহাতেও আমার আশ্রয়ত্ব নহে, কারণ 'এখান' অর্থাৎ এই দেশখণ্ডও আমার জ্ঞানে বিষয়। আমি এখন আছি, ইহাতেও আমার আশ্রয়ত্ব নহে। কেননা 'এখন' অর্থাৎ এই মুহূর্ত্তও আমার জ্ঞানাশ্রিত। সুতরাং অনাত্মবস্তুর আশ্রয়ত্ব যেরূপ সমধিক বিষয়ত্ব গুণের উপর নির্ভর করে, আমার আশ্রয়ত্ব সেরূপ নহে। আমার আশ্রয়ত্ব কেবল জ্ঞাতৃত্বের উপরই নির্ভর করে, কেবল জ্ঞাতৃত্বেই আমার আশ্রয়ত্ব, আমি জ্ঞাতা বলিয়াই আশ্রয়, এবং আমার জ্ঞাতৃত্ব দেশ কালের উপর নির্ভর করে না, কেননা দেশ ও কাল নিজেই জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, জ্ঞানের আশ্রিত।

এই যে জ্ঞাতৃত্ব বা জ্ঞান, যাহা সমুদায় বিষয়ের অবভাসক, প্রকাশক, এবং প্রকাশক রূপেই আশ্রয়—এই জ্ঞান অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে কি না? বিষয় জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, এবং জ্ঞানের আশ্রয়ে যে প্রকাশ, ইহাতেই ইহার অস্তিত্ব। কিন্তু জ্ঞান অন্য কিছুর বিষয় নহে, অন্য কিছুর সম্বন্ধে প্রকাশিত নহে, জ্ঞান নিজেই নিজের অবভাসক, প্রকাশক; ইহা নিজের জ্যোতিতে, নিজের কাছেই প্রকাশিত। ইহা নিজের জ্যোতিতে প্রকাশিত হইয়া অন্য সকলকে প্রকাশ করে।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥

"সেই দীপমানের প্রকাশেই সমুদায় বস্তু অনুপ্রকাশিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সকলে দীপ্তি পাইতেছে।" এই স্বয়ং-জ্যোতি, স্বপ্রকাশ বস্তু স্বতন্ত্র, স্বাধীন আত্ম প্রতিষ্ঠিত ব্যতীত আর কি হইতে পারে? যাহার জ্যোতিতে সমুদয় প্রকাশিত, সে আর কাহার জ্যোতির অপেক্ষা রাখিবে? যাহার আশ্রয়ে সমুদয় আশ্রিত, সে আর কাহার আশ্রয়ের অপেক্ষা রাখিবে? বিষয়, দেশ ও কাল যাহার আশ্রিত সে আর কিরূপে বিষয়, দেশ ও কালের অধীন হইবে? সুতরাং এই জ্ঞানবস্তু একান্তই স্বতন্ত্র, স্বাধীন, আত্মপ্রতিষ্ঠিত, ইহা আত্মত্বশালী নিরপেক্ষ বস্তু, ইহা আত্মা।

এই যে জ্ঞানবস্তু, যাহাকে 'আমি' বলি, আত্মা বলি, ইহা ছাড়া এবং ইহার আশ্রিত বিষয় সমূহ ছাড়া সাক্ষাৎভাবে বা আসাক্ষাৎ ভাবে আমি আর কিছুই জানি না,এবং জানাও সম্ভব নহে। "ইহা ছাড়া আর কিছু,"এই কথাটা যে বলি-তেছি তাহা কেবল বিষয়ের তুলনায়; জ্ঞানের সম্বন্ধে এই কথাটা সম্পূর্ণ অপ্রযুজ্য। এক বিষয় অন্য বিষয় ছাড়া থাকিতে পারে,এক বিষয়কে অন্য বিষয় ছাড়া ভাবা যাইতে পারে, কিন্তু জ্ঞান ছাড়া কোন বস্তু থাকিতে পারে না,জ্ঞান ছাড়া কোন বস্তুর চিন্তাই হইতে পারে না। কিন্তু এই সত্যটীর অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। ইহার অর্থ এই নয় যে—কোন না কোন জ্ঞান ছাড়া বিষয় থাকিতে পারে না, হয় আমার জ্ঞানে, না হয় তোমার জ্ঞানে, না হয় অপর কোন জ্ঞানে বিষয়কে থাকিতে হইবে। কথাটার অর্থ এরূপে বুঝাতে কেবল ইহাই প্রকাশ পায় যে জ্ঞানের স্বপ্রকাশ-ভাব,জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ,বুঝা হয় নাই,ইহাকে বিষ-য়ের ন্যায় দেশগত, কালগত, খণ্ডশীল, বহুত্বশালী বলিয়া মনে করা হইতেছে, এক কথায়—ইহার বিষয়িত্ব ভুলিয়া ইহাকে বিষয়ের পদবীতে নামাইয়া আনা হইতেছে। বাস্তবিক কথা এই যে, জ্ঞানবস্তুর দেশাতীত কালাতীত প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিলে দেখা যায় ইহা অবশ্যম্ভাবিরূপেই এক, অখণ্ড, অনন্ত—ভিন্ন ভিন্ন দেশ, কাল ও শরীর যোগে প্রকাশিত হইয়াও ইহা ব্যক্তিত্বের সীমার অন্তর্গত নহে,—সসীম ব্যক্তিত্বের আশ্রয়, আধার এবং কারণ হইয়াও ইহা ব্যক্তিত্ববিহীন, বা অসীম ব্যক্তিত্বশালী। এই তত্ত্ব কেবল যুক্তিগোচর নহে,

ইহা সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ও চিন্তার গোচর। এই যে জ্ঞানবস্তু, যাহাকে আমি "আমার জ্ঞান" বলিতেছি, এই জ্ঞানবস্তুকে ছাড়িয়া,—এই জ্ঞানবস্তুর বাহিরে —আমি কিছুই জানিতে পারি না, কিছুই ভাবিতে পারি না, কিছুই বিশ্বাস করিতে পারি না। আমি যাহা কিছু দেখি আমাতেই দেখি, অর্থাৎ আমার জ্ঞানবস্তুর আশ্রিত বলিয়াই দেখি; যাহা কিছু শুনি, স্পর্শ করি বা অন্য প্রকারে প্রত্যক্ষ করি, সমুদয়ই আমার জ্ঞানবস্তুর আশ্রিতরূপে প্রত্যক্ষ করি। তার পর, আমার প্রত্যক্ষীভূত বস্তুসমূহ হইতে যখন আমার শরীর দূরে থাকে, পরোক্ষে থাকে, তখনও আমি উহাদিগকে যেরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, অর্থাৎ আমার জ্ঞানের বিষয়রূপে, কেবল সেইরূপেই আমি উহাদিগকে চিন্তা করিতে পারি ও উহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে পারি। আমার শরীরের অনুপস্থিতিতে যেমন বস্তুসমূহের মৌলিক গুণের বিলয় বা পরিবর্ত্তন ভাবি না, অর্থাৎ উহারা যে যে গুণ লইয়া আমার নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল সেই সকল গুণযুক্ত হইয়াই বর্ত্তমান আছে, এরূপ ভাবি, তেমনি যে জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ ইহাদের প্রকাশের নিদান,—ইহাদের বিষয়ত্বের কারণ, সেই জ্ঞানের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ পুর্ব্ববৎই রহিয়াছে, ইহাও ভাবি। অর্থাৎ যাহাকে আমার জ্ঞান বলি, সেই জ্ঞানকেই তখনও—শরীরের অনুপস্থিতির অবস্থায়ও—বস্তু সমূহের আশ্রয় বলিয়া ভাবি। আমি শরীরাদি সম্বন্ধে সসীম হইলেও আমার জ্ঞানকে অবশ্যম্ভাবিরূপেই এরূপ ব্যাপক, সর্ব্ববিষয়-ব্যাপ্ত বলিয়া ভাবিতে হয়। কেবল প্রত্যক্ষগোচর ও নিকটস্থ বস্তুর সম্বন্ধে নহে, যাহা কখনও আমার ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কে আসে নাই, এবং আসিবে না, সেই সকল বস্তু সম্বন্ধেও আমাকে অবশ্যম্ভাবিরূপে এই ভাবিতে হয় এবং বিশ্বাস করিতে হয় যে তাহারাও সেই জ্ঞানবস্তুর আশ্রয়েই আছে যে জ্ঞানবস্তু এখানে,—অর্থাৎ এই বিশেষ দেশ ও বস্তু সমূহের যোগে—প্রকাশ পাইতেছে। এই জ্ঞানরূপী "আমি" কে সাক্ষীরূপে না বসাইয়া আমি কিছুই ভাবিতে পারি না, কিছুই বিশ্বাস করিতে পারি না, ভাবনা ও বিশ্বাসের কোন অর্থই হয় না। পৃথিবীর দূরতম কেন্দ্র, সুদূর সূর্য্যমণ্ডল, অগণ্য জগৎসমষ্টিরূপী ছায়া পথ, যত কেন দূরবর্ত্তী বস্তু হউক না; পৃথিবীর বাল্যাবস্থা, সৌর ও নক্ষত্র জগতের সেই পূর্ব্বতন তরল বা বাষ্পাবস্থা, যত কেন দূরবর্ত্তী ঘটনা হউক না,—এই জ্ঞান-

বস্তুর সাক্ষিত্ব হইতে বিচ্যুত করিয়া কিছুই ভাবিতে পারি না, কিছুই বিশ্বাস করিতে পারি না। বিষয়ের সাক্ষী, দেশের সাক্ষী, কালের সাক্ষী জ্ঞানবস্তুর ভাব একবার স্পষ্টরূপে হৃদয়ে স্ফুরিত হইলে আর ইহাকে কোন বিশেষ দেশে, কালে, বা শরীরে আবদ্ধ রাখা যায় না; দেখা যায় ইহা সর্ব্ববিষয়ব্যাপী, সর্ব্বদেশব্যাপা, সর্ব্বকালব্যাপী, অনাদি, অনন্ত, এক, অখণ্ড।

সুতরাং আত্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে যাইয়া দেখি পরমাত্মাই জীবের আত্মারূপী। আমরা প্রত্যেকে নিজ আত্মাকে প্রকৃতরূপে জানিতে যাইয়া ব্রহ্মকেই আত্মারূপে জ্ঞাত হই। অনন্ত অখণ্ড আত্মা এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না, সুতরাং প্রত্যেকের আত্মজ্ঞান এক অদ্বিতীয় অসীম আত্মারই পরিচয় দেয়। সেই অদ্বিতীয় অনন্ত আত্মা প্রত্যেক জীবের আত্মারূপে বর্ত্তমান। জীব ব্রহ্মের আত্মত্বে আত্মবান্‌, সুতরাং ব্রহ্মের অবিনাশিত্বের ভাগী। সেই এক অখণ্ড জ্ঞানবস্তু যখন কালের অতীত, তাঁহার প্রত্যেক জ্ঞানকণিকাই যখন কালাতীত অবিনাশী বস্তু, জীবগত জ্ঞান যখন সেই জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে, জীবের প্রত্যেক জ্ঞানস্ফুলিঙ্গ যখন সেই মহাজ্যোতিরই অঙ্গীভূত, তখন জীব কখনও ক্ষণস্থায়ী বিনাশশীল হইতে পারে না। মহাজ্ঞানীর পরিপক্ক চিন্তা ও ধ্যান হইতে ক্ষুদ্র শিশুর সরল চিন্তা ও জ্ঞানচেষ্টা পর্য্যন্ত সমুদায়ই অক্ষয় অবিনাশী। জীব যখন ব্রহ্মের আত্মত্বের অংশভাগী, তখন ইহা পরমাত্মার দেশনিরপেক্ষতা, কালনিরপেক্ষতা, সত্তান্তর-নিরপেক্ষতা, সমুদায়েরই অধিকারী, এবং এই অধিকারসূত্রেই অমর, অবিনাশী।

কিন্তু কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে আমরা জীবের অমরত্ব দেখাইতে যাইয়া বস্তুতঃ পরমাত্মার অমরত্বই দেখাইলাম, জীবের অমরত্ব সপ্রমাণ করিতে যাইয়া জীবকে ব্রহ্মের সহিত এক করিতে হইল, জীবের জীবত্ব প্রকারান্তরে অস্বীকার করিতে হইল। এই কথা এক অর্থে ঠিক। জীব অনাত্ম বস্তু নহে, সত্তান্তরসাপেক্ষ বস্তু নহে, জীব আত্মারূপী, বিষয়ীরূপী, দেশকালের অতীত বস্তু, ইহা দেখাইতে হইলে দেশকালাতীত নিত্য অখণ্ড পরমাত্মার সহিত জীবের মৌলিক একত্ব দেখান অবশ্যম্ভাবী। কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি ঈশ্বরতত্ত্ব ও পরকালতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ যোগ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়া থাকেন—ঈশ্বরাস্তিত্ব ও জীবের অমরত্ব দুটী সত্য নহে, একটী সত্যের দুটী দিক্‌ মাত্র ?—তাহা ঠিক।

যাহা হউক আমরা জীব ও ব্রহ্মের মৌলিক একত্ব প্রদর্শন করিতে যাইয়া প্রকৃতপক্ষে জীবের জীবত্ব, জীব ব্রহ্মের আপেক্ষিক ভেদ, অস্বীকার করি নাই। এই সত্য অস্বীকার করিলে আর আমরা বলিতাম না যে পরমাত্মা প্রত্যেক জীবের আত্মারূপে বর্ত্তমান,—জীব ব্রহ্মের আত্মত্বে আত্মবান্। এই "জীব" "প্রত্যেক জীব" প্রভৃতি কথা গুলির অবশ্য কোন অর্থ আছে। এই কথা গুলির যখন অর্থ আছে, তখন, জীব ব্রহ্মের মৌলিক একতা যেমন সত্য, আপেক্ষিক ভেদও তেমনি সত্য, এবং জীবে জীবে পরস্পর ভেদও তেমনি সত্য। ব্রহ্ম নিজজ্ঞানে নিজে নিত্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন। সেই প্রকাশে খণ্ড নাই, প্রবাহ নাই। সমুদায় তত্ত্ব অখণ্ড আত্মতত্ত্বের সহিত তাঁহাতে চিরপ্রকাশিত। তাঁহার জ্ঞানের উদয় নাই, অস্ত নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই। তাঁহার বিস্মৃতি নাই, নিদ্রা নাই, তিনি চিরজাগ্রত, চিরপ্রকাশস্বরূপ। কিন্তু জীবরূপে যে তাঁহার প্রকাশ, সেই প্রকাশ মূল প্রকাশের অনুপ্রকাশ মাত্র। এই অনুপ্রকাশের আরম্ভ আছে, বৃদ্ধি আছে, হ্রাস আছে। ইহা অপূর্ণ, প্রবাহরূপী। এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে অতি অল্প পরিমাণ জ্ঞান—অতি অল্প-সংখ্যক তত্ত্বই আমার মানসিক জীবনে প্রকাশিত; অবশিষ্ট সমুদায়ই এখন লুকায়িত;—ব্যক্তিগত অনুপ্রকাশিত জীবনের পক্ষে লুকায়িত, কিন্তু সেই চিরপ্রকাশস্বরূপে প্রকাশিত। সেই অপ্রতিহত প্রকাশ-রাজ্য হইতে এই তত্ত্বসমূহ প্রয়োজনমত ক্রমশঃই ব্যক্তিগত জীবনে অনুপ্রকাশিত হইতেছে। এই বিষয়টী আমরা অনেকবার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। সম্প্রতি এবিষয়ে নূতন কিছু না বলিয়া "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" নামক পুস্তক হইতে একটী স্থান উদ্ধৃত করিব।

"সম্মুখস্থ এই টেবল্‌টীকে প্রত্যক্ষ করিয়া—ইহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়া আমি স্থানান্তরিত হইলাম এবং বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট হইয়া ইহাকে বিস্মৃত হই-লাম। তৎপরে অন্য এক সময়ে ইহাকে পুনরায় প্রত্যক্ষ করিলাম বা প্রত্যক্ষ না করিলেও কোন ক্রমে ইহা আমার স্মরণে আসিল। ইহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ইহাকে পূর্ব্ব প্রত্যক্ষীভূত টেব্‌ল্ বলিয়া চিনিতে পারিলাম, অথবা ইহা স্মরণে আসাতে বুঝিতে পারিলাম যে, যে টেবল্‌টীর প্রত্যক্ষ জ্ঞান পূর্ব্বে লাভ করিয়াছিলাম সেই টেবলেরই স্মৃতি-ঘটিত জ্ঞান এই। এই স্মৃতি ব্যাপারটী

কিরূপে ঘটিল ? বিষয়জ্ঞান যদি একটা অনুভব-ঘটিত ঘটনা মাত্র হইত, একটা প্রবাহশীল বিনাশশীল বস্তু হইত, ইহা যদি প্রবাহশূন্য অবিনাশী বস্তু না হইত, তবে যে বিষয়জ্ঞান একবার মানসক্ষেত্র ছাড়িয়া গিয়াছিল, তাহা আর কথনও মনে আসিত না, কিন্তু এই স্মৃতি ব্যাপারে দেখিতেছি পূর্ব্বকার বিষয়-জ্ঞানই আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। টেবল্‌টীকে পুনর্ব্বার দর্শন ও স্পর্শ করাতে কতকগুলি নূতন ঘটনা মাত্র ঘটিতেছে, নূতনত্ব কেবল ঘটনায়, নূতনত্ব কেবল নূতন কাল-তরঙ্গে ; কিন্তু জ্ঞান যাহা আসিল তাহা পূর্ব্বকার পুরাতন জ্ঞানই। অতীত ও বর্ত্তমানের যোগ না হইলে স্মৃতি সম্ভব হয় না ; কিন্তু অতীতকাল চিরদিনের জন্যই অতীত হইয়াছে, তাহা কদাচ ফিরিয়া আসিতে পারে না ; অতীত ঘটনা চির দিনের জন্যই অতিরাহিত হইয়াছে, নূতন কালে নূতন ঘটনা ঘটে। তবে অতীত সম্বন্ধীয় কি আসিয়া এই স্মৃতি ব্যাপার সংঘটন করিল ? অতীত সম্বন্ধীয় জ্ঞান—যাহা অতীত ঘটনার সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু যাহা অতীত ঘটনার সঙ্গে প্রবাহিত হয় নাই, বিনষ্ট হয় নাই, সেই প্রবাহশূন্য অবিনাশী জ্ঞানই বর্ত্তমানে পুনঃপ্রকাশিত হইয়া অতীত ও বর্ত্তমানকে সংযুক্ত করিল এবং স্মৃতি ক্রিয়া সংঘটন করিল। পূর্ব্বে টেব্‌লটীকে প্রত্যক্ষ করিবার সময়ে যে বর্ণ, স্পর্শাদি ঘটিত ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই সকল ঘটনা তথনই অতিবাহিত হইয়াছে,এখন অনুভব-ঘটিত নূতন ঘটনা ঘটিতেছে ; কিন্তু সেই সকল অনুভব-ঘটিত ঘটনা অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি উহাদের জ্ঞানও বিলয় প্রাপ্ত হইত, যদি উহাদের জ্ঞান স্থির প্রবাহাতীত থাকিয়া এখন অন্তরে পুনঃ প্রকাশিত না হইত, তবে পুরাতন ও নূতন অনু-ভবের সাদৃশ্য জ্ঞান কদাচ সম্ভব হইত না, সুতরাং স্মৃতিরও উদ্রেক হইত না, এবং পুরাতনের জ্ঞানের অভাবে নূতনের নূতনত্ব-জ্ঞানও সম্ভব হইত না। সুতরাং পাঠক দেখিতেছেন, অতীতের জ্ঞান সময়ে সময়ে আমাদের সসীম বিস্মৃতিশীল মনকে পরিত্যাগ করে বটে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবন হইতে তিরোহিত হয় বটে, কিন্তু স্মৃতিরূপে ইহা পুনঃ প্রকাশিত হইয়া ইহার অবিনা-শিত্বের পরিচয় দেয়। এক দিকে আমরা বিস্মৃতিশীল, আমরা ক্ষণে ক্ষণে জীবনের প্রায় সমস্ত ব্যাপার ভুলিয়া যাইতেছি, কিন্তু আমাদেরই মধ্যে, আমাদের জীবনের নিত্য আধাররূপী, আমাদের প্রাণরূপী এমন একজন

আছেন যিনি কোন কথাই ভুলেন না এবং যিনি প্রয়োজন মত আমাদের বিস্মৃত কথা স্মরণ করাইয়া দেন। তিনি অতীতের জ্ঞান লইয়া আমাদের ভিতরে পুনঃপ্রকাশিত না হইলে আমাদের জীবন একবারেই অসম্ভব হইত। স্মৃতিবিহীন জীবন জীবনই নহে, স্মৃতিবিহীন জ্ঞান জ্ঞানই নহে। চির-স্মৃতি-শীলের স্মৃতি আমাদের স্মৃতিরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাতেই আমাদের জীবন সম্ভব হয়। সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের জ্ঞান আমাদের জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা তেই আমরা জ্ঞানী হই।

"স্মৃতি বিস্মৃতির বিষয় আলোচনা করিলে যেমন দেখা যায় যে আমাদের ব্যক্তিগত সসীম মন বিস্মৃতিশীল বটে, কিন্তু আমাদের জীবনাধার প্রাণস্বরূপ পরমাত্মা চিরস্মৃতিশীল, এবং আমাদের মনে তাঁহার স্মৃতির পুনঃপ্রকাশই আমাদের স্মৃতি,—তেমনি নিদ্রা ও জাগরণের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন নিদ্রাশীল বটে, কিন্তু আমাদের প্রাণরূপী পরমাত্মা চিরজাগ্রত। নিদ্রাকালে আমাদের সমুদায় জ্ঞান তাঁহাতেই বর্ত্তমান থাকে, এবং নিদ্রাবসানে সেই সমস্ত সহকারে আমাদের প্রাণরূপে যে তাঁহার পুনঃপ্রকাশ, ইহারই নাম জাগরণ। সুষুপ্তিকে আপাততঃ সমস্ত জ্ঞানের —আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান উভয়ের—বিলয়াবস্থা, বিনাশাবস্থা বলিয়া বোধ হয়। অজ্ঞান অচেতন না হইলে আর সুষুপ্তি কি হইল? আমাদের ব্যক্তি গত জীবনের পক্ষে এই কথাকে বিশেষ অত্যুক্তি বলা যাইতে পারে না; বাস্তবিক আমাদের ব্যক্তিগত সসীম মন তখন অজ্ঞান অচেতন হইয়া পড়ে,— আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত জ্ঞান তখন তিরোহিত হয়, তাহা না হইলে সুষুপ্তির কোনও অর্থই থাকে না। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনই যদি সর্ব্বেসর্ব্বা হইত, যদি চির জাগ্রত পরমাত্মা আমাদের জীবনাধার-রূপে, প্রাণরূপে, বর্ত্তমান না থাকিতেন, তবে সুষুপ্তি ও মরণে, জাগরণে ও পুনর্জ্জন্মে কিছুই প্রভেদ থাকিত না। তাহা হইলে আমাদের নিদ্রা আমাদের মৃত্যু হইত, জাগরণ পুনর্জ্জন্ম হইত। সুষুপ্তিকালে আমাদের আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানের যে তিরোভাব হয়, সেই তিরোভাবই যদি বিলয় হইত, বিনাশ হইত, তবে নিদ্রাবসানে আমরা সম্পূর্ণ নূতন লোক হইয়া জাগ্রত হইতাম, অথবা—জাগরণ কথা এস্থলে ঠিক খাটে না—সৃষ্ট হইতাম। সেস্থলে নিদ্রার

পূর্ব্বকার আত্মজ্ঞান ও পরবর্ত্তী আত্মজ্ঞানে কোনও একত্ব থাকিত না; নিদ্রার পূর্ব্বে প্রত্যক্ষীভূত বস্তু ও নিদ্রার পরে প্রত্যক্ষীভূত বস্তু সমূহের মধ্যে কোনও একত্ব বা সাদৃশ্যবোধ থাকিত না। পূর্ব্ব-প্রকাশিত আত্মজ্ঞান ও পর-প্রকাশিত আত্মজ্ঞানের একত্ব বোধ হইতে গেলে পূর্ব্ব-প্রকাশিত আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত না হইয়া স্থির থাকা আবশ্যক এবং পর-প্রকাশিত আত্মজ্ঞানের সহিত পুনঃ-প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক; আত্মজ্ঞান একবার বিলুপ্ত হইলে আর তাহা আসিতে পারে না। পরবর্ত্তী কালে যাহা আসিবে তাহা নূতন বস্তু। বিষয়-জ্ঞানের সম্বন্ধেও যে এই কথা ঠিক্ তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং নিদ্রাবসানে আমাদের আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান পুনঃ প্রকাশিত হওয়াতে ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হয় যে আমাদের আত্মজ্ঞান ও বিষয়-জ্ঞান সুষুপ্তি কালে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রকাশিত হয় না বটে, কালের উপকরণরূপী ঘটনাপ্রবাহ সহকারে আবির্ভূত হয় না বটে, কিন্তু সেই সময়েও তাহা বিলুপ্ত হয় না, সেই সময়েও তাহা আমাদের প্রাণরূপী পরমাত্মাতে অঙ্কুররূপে বর্ত্তমান থাকে। আমরা যখন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত থাকি, তখন পরমাত্মা চির-জাগ্রত থাকিয়া আমাদের জীবনের সমুদায় জ্ঞানকে ধারণ করিয়া থাকেন, এবং নিদ্রাবসানে এই জ্ঞানসহকারে আমাদের প্রাণরূপে প্রকাশিত হইয়া জাগরণ ব্যাপার সংঘটন করেন। ইহাতেই আমাদের আত্মজ্ঞান ও বিষয়-জ্ঞানের একত্ব—আমাদের সমগ্র অভিজ্ঞতা—সম্ভব হয়।"

সুতরাং জীবব্রহ্মের ভেদ, এবং চিরপ্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মে অনুপ্রকাশরূপ জীবের স্থিতি, এই উভয় তত্ত্বই নিঃসন্দিগ্ধ, এবং জীবব্রহ্মের এই ভেদাভেদ তত্ত্ব জীবের অমরত্বের সুদৃঢ় প্রমাণ। ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদাভেদ যেমন আমরা স্পষ্টরূপে দেখিলাম, জীবে জীবে ভেদাভেদও সেরূপ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। এক পরব্রহ্ম যখন সকলের আত্মা, তখন মূলে সকলই এক, ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু প্রত্যেকের জীবনে ব্রহ্মের অনুপ্রকাশ যে ভিন্ন ভিন্ন তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। আমাদের পরস্পরের জ্ঞান, স্মৃতি, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, পাপ, পুণ্য সমুদায়ই ভিন্ন ভিন্ন। গভীর সুষুপ্তির সময়ে যখন সমুদায় ব্যক্তিগত অনুপ্রকাশ সেই মহাপ্রকাশে বিলীন হইয়া যায়, ব্যক্তিগত ভাব ক্ষণকালের জন্য নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন বোধ হইতে পারে যেন প্রলয়জলধির মহা প্লাবনে সমুদায়

ডুবিয়া একাকার হইয়া যায়। যেন, জ্ঞানী অজ্ঞানী, সবল দুর্ব্বল, প্রেমিক অপ্রেমিক, পাপী সাধুর ভেদ বিলুপ্ত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না। যখন মানব পুনর্জাগ্রত হয়, তখন সে দেখে যে নিদ্রারূপ খণ্ডপ্রলয়েও তাহার কর্ম্মফল কিছুমাত্র বিনষ্ট হয় নাই; জ্ঞানী অজ্ঞানী, সবল দুর্ব্বল, প্রেমিক অপ্রেমিক, সাধু অসাধু যে যেমন ছিল, সে তেমনই রহিয়াছে; পরস্পরের আত্মবোধ, অভিজ্ঞতা, অর্জ্জিত আধ্যাত্মিক সম্পত্তির বিন্দুমাত্রও মিশ্রণ ঘটে নাই; যার যা তাই আছে, কেহ কিছু হারায় নাই, এবং অন্যের কিছুও পায় নাই। সেই এক অখণ্ড অনন্ত জ্ঞানের মধ্যেও যেন ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মার জীবনোপকরণগুলি ভিন্ন ভিন্নরূপে রক্ষিত হয়, পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইতে পায় না। সুতরাং আমাদের ব্যক্তিগত ভেদ ব্রহ্মের অভেদ ভাবের অধীন হইলেও তাহা অক্ষয়।

এখন, এই ব্যক্তিগত ভেদের চিরস্থায়িত্ব বিষয়ে আমরা আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া জীবের অমরত্বের প্রমাণ দৃঢ়তর করিতে চেষ্টা করিব। আমরা দেখিয়াছি যে জীব ব্রহ্মকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, জীব ব্রহ্মের অঙ্গীভূত, ব্রহ্মে অবস্থিত। এখন ভাবিয়া দেখুন যে এক অর্থে ব্রহ্মও জীবকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। আমরা এই কথাটী বিশেষ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। পরমাত্মা অন্য-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু। তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু; তাঁহার অতিরিক্ত, তাঁহা ছাড়া, কোন বস্তু নাই। সমুদায়ই তাঁহার আশ্রিত, তাঁহার অন্তর্গত। সুতরাং এমন কোন বস্তু থাকিতে পারে না যাহা তাঁহাতে বাসনা উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে, তাঁহাকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে। সুতরাং তাঁহার প্রকৃতিতে সসীম জীবের ন্যায় চঞ্চল বাসনা থাকিতে পারে না। এখন এক কামনার উদয়, পুনশ্চ কিছুকাল পর তাহার বিলয়, পুনরায় আর এক কামনার উদয় —ইহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। ইহা অস্বতন্ত্র, পরাধীন জীবের স্বভাব, স্বতন্ত্র স্বাধীন ব্যক্তির স্বভাব নহে। পরত্মার যাবতীয় কার্য্যই তাঁহার নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় প্রকৃতির ফল হইবে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে তিনি যাহা কিছু করেন তাহা অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য্য, তাহা না হইয়া পারে না, তাহা অন্যরূপ হইবার যো নাই। এই কথা যদি সত্য হয় তবে বুঝিতে হইবে যে,

এই যে মানবজীবনরূপে ভগবানের লীলা, ইহা তাঁহার সাময়িক বাসনার ফল নহে, ইহা তাঁহার সনাতন প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য ফল, ইহার অন্যথা হইতে পারে না, ইহা তিনি না করিয়া থাকিতে পারেন না, ইহা না করিলে তাঁহার নিজ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ করা হইত। এই কথা যে কেবল সাধারণ ভাবে খাটে তাহা নহে। একই যুক্তিতে, পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতেই—ইহা প্রত্যেক মানবাত্মা সম্বন্ধেই খাটে। এই যে আমার জীবনে, তোমার জীবনে, তাহার জীবনে তাঁহার অনুপ্রকাশ, এই প্রত্যেক কার্য্যই তাঁহার প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য ফল। এইরূপে অনুপ্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক, না হইলে নয়, তাই তিনি হইয়াছেন।

তার পর আর একটী কথা বিবেচনা করুন্। এই অনুপ্রকাশের কারণ কি, অভিপ্রায় কি, তাহা যে আমরা একবারে বুঝিতে পারিতেছি না, তাহা নহে। খুব সূক্ষ্মরূপে, বিশেষরূপে, না বুঝি, মোটামুটি বেশ বুঝিতেছি। মানবজীবনের আর যাহাই উদ্দেশ্য থাকুক্ না থাকুক্, ধর্ম্মে উন্নত হওয়া, জ্ঞান, প্রীতি, পবিত্রতাতে উন্নত হওয়া, পশুভাব ছাড়িয়া মানুষ হওয়া, মানবের সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়া দেবতা হওয়া, বিবেক-প্রকাশিত পূর্ণ প্রেম পবিত্রতার আদর্শ জীবনে আয়ত্ত করা, ইহা যে মানবজীবনের উদ্দেশ্য এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। নানা সংগ্রামের ভিতর দিয়া, অসংখ্য সুখ দুঃখ, বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া, ঈশ্বর মানবকে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকে অগ্রসর করিতেছেন। পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, জাতীয় জীবন, অন্তর্জ্জাতীয় জীবন; বিজ্ঞান, দর্শন, সভ্যতা, শিল্প, বাণিজ্য, সমুদায়ই এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সহায়তা করিতেছে, সমুদায়ই এই আধ্যাত্মিক বিকাশের আয়োজন মাত্র। আর, এই আধ্যাত্মিক বিকাশ মূলে ব্যক্তিগত বিকাশ। ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য সমাজ চাই বটে, অন্যের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক বিকাশের কোন অর্থ নাই বটে, কিন্তু বিকাশ ব্যাপারটা ব্যক্তিগত আত্মা সম্বন্ধীয়, সমাজ সম্বন্ধীয় নহে। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি জ্ঞানী না হইলে সামাজিক জ্ঞানের কোন অর্থ নাই; বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি প্রেমিক না হইলে সামাজিক প্রেমের কোন অর্থ নাই; বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির চিত্ত ও ব্যবহার পবিত্র না হইলে সামাজিক পবিত্রতার কোন অর্থ নাই। সামাজিক

জ্ঞানোন্নতি, প্রেমোন্নতি, পবিত্রতার উন্নতির অর্থ সমাজভুক্ত ব্যক্তিদিগের জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতার উন্নতি। সুতরাং "আধ্যাত্মিক উন্নতিই মানবজীবনের উদ্দেশ্য, বিধাতার মানব সৃষ্টির অভিপ্রায়,"—এই কথার অর্থ এই যে প্রত্যেক মানবাত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতিই বিধাতার মানব-সৃষ্টির অভিপ্রায়।

তাহাই যদি হইল,—মানবসৃষ্টি যদি ঐশ্বরিক প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী কার্য্যই হইল, এবং প্রত্যেক মানবাত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতিই যদি সেই কার্য্যের মূলোদ্দেশ্য হইল, তবে শরীর নাশের সঙ্গে মানবাত্মার বিনাশ—মানবজ্ঞানের ব্যক্তিগত প্রকাশের নিরোধ—কদাচ বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। তাহা হইলে, যে অসংখ্য সংগ্রাম ও অশেষ যত্নের সহিত আধ্যাত্মিক সম্পত্তি সঞ্চিত হয়, সে সংগ্রাম ও যত্ন সমস্তই উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া পড়ে। অথচ অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ, ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া নিয়ত এরূপ কার্য্য করিতেছেন, ইহা কখনও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। সর্ব্বশক্তিমান অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের স্বভাব ও শক্তি-প্রসূত কার্য্য অন্য কোন শক্তিদ্বারা নিষ্ফলীকৃত হইতেছে, ইহাও একবারেই অসম্ভব। সুতরাং আমাদিগকে অবশ্যম্ভাবিরূপেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইতেছে যে প্রত্যেক মানবের জীবনে যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক সম্পত্তি সঞ্চিত হইতেছে, ও তাহার দৈনন্দিন বিস্মৃতি ও নিদ্রার মধ্যেও পরমাত্মার নিরাপদ আশ্রয়ে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহা শরীর পাত হইলেও অকর্ম্মণ্য ও অনুন্নত হইয়া পড়িয়া থাকিবে না, কিন্তু ঐশী শক্তি-প্রভাবে ইহা অবস্থান্তরে পুনঃ প্রকাশিত হইবে, এবং ইহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির দিকে প্রতিনিয়ত অগ্রসর হইবে। যে অদম্য ধর্ম্মপিপাসার—মুক্তিপিপাসার—বশবর্ত্তী হইয়া মানব ধন, মান, অর্থ, সুখ, আত্মীয় স্বজন, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে, অথচ যাহা অত্যুন্নত জীবনের শেষ দিনেও নিবৃত্ত হয় না, সেই অদম্য পিপাসার মূলে যিনি, সেই পিপাসা যাঁহার পবিত্র পূর্ণ স্বভাবের অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য ফল, সেই পিপাসাকে নিবৃত্ত না করিয়া নির্ম্মূল করা, এবং সেই পিপাসানিবৃত্তির সমুদায় আয়োজন নিষ্ফল করিয়া দেওয়া—এই কার্য্যের সহিত পূর্ণ পবিত্র স্বভাবের কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই। এই বলিলেই সেই স্বভাবের অনুযায়ী কথা বলা হয় যে, ঈশ্বরকর্ত্তৃক মানবাত্মায় সঞ্চারিত এই অদম্য মুক্তিপিপাসা তিনি যে-কোন উপায়েই হউক নিবৃত্তি

করিবেন, তাঁহার নিজেরই অশেষ যত্ন-সঞ্চিত মানব-পুণ্যফল তিনি যে-কোন প্রণালীতেই হউক চিরদিন রক্ষা করিবেন ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবেন।

এখন অমরজীবনের প্রণালী সম্বন্ধে,—জীবাত্মার অমর জীবন সদেহ কি বিদেহ, এই সম্বন্ধে—কয়েকটী কথা বলিব।

১। ঈশ্বর যে নিয়মে জগৎ সৃষ্টি ও পালন করিতেছেন, তাহার আলোচনা করিলে দেখি, তিনি সহসা কিছুই করেন না। তিনি যাহা কিছু করেন, অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মানুসারে করেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ-পরম্পরার ফল। বিশেষতঃ যে বস্তু যত জটিল, যে বস্তু যত প্রকৃষ্ট গুণযুক্ত, সেই বস্তুর নির্ম্মাণে ততই বহুল ও দীর্ঘকালব্যাপী আয়োজন ব্যয়িত হয়, সেই বস্তু ততই ধীর ক্রম বিকাশ-প্রণালীর ফল। বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশ-বাদ যদি সত্য হয়, তবে ইহা ঠিক যে বর্ত্তমান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-ময়, অতি জটিল মানবশরীরের অভিব্যক্তির জন্য অচিন্তনীয় দীর্ঘকাল লাগিয়াছে। অগণ্য পশু-শরীর অশেষ সংগ্রাম ও সাধনার প্রভাবে ক্রম-বিকশিত হইয়া, সেই সাধনার ফল সঞ্চয় করিয়া, ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর শরীর উৎপাদন করিয়া, অবশেষে এই মানব-শরীরে পরিণত হইয়াছে, এবং এখন অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই নিজ আকৃতির অনুরূপ শরীরোৎ-পাদনে সক্ষম হইয়াছে। ভৌতিক জগতে যে নিয়ম, আত্মজগতে তাহার বিপরীত নিয়ম;—সেখানে ধীর ক্রম-বিকাশ, এখানে আকস্মিক সৃষ্টি, এরূপ ধারণা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং পরিপক্ব মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিশালী মানবাত্মা, যে মানবাত্মা জন্মগ্রহণান্তর অতি অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই অতি বিচিত্র ও উন্নত মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করে, সেই মানবাত্মা অকস্মাৎ সৃষ্ট না হইয়া, ৯।১০ মাসের মধ্যে সূক্ষ্ম ও জটিল মনোবৃত্তি-সমন্বিত না হইয়া, সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশ-প্রণালীর ভিতর দিয়া বর্ত্তমান অবস্থা লাভ করিয়াছে,—প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে এই কথাই সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ মানুষে মানুষে যেরূপ স্বাভাবিক জন্মগত প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, এই জন্মগত প্রভেদকে পূর্ব্ববিকাশের তারতম্য-জনিত বলিয়া ব্যাখ্যা না করিলে যেন ইহার কোন সন্তোষকর ব্যাখ্যাই হয় না। কেবল শারীরিক প্রভেদদ্বারা এই মানসিক প্রভেদ ব্যাখ্যা করা,

এবং এই শারীরিক প্রভেদকে আপন আপন পিতা মাতার শারীরিক তারতম্যে আরোপ করা, ইহাতে কেবল জড়বাদেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অনেক স্থলে সন্তান পিতা মাতা হইতে অতিশয় ভিন্ন হয়। আর, যেখানে সাদৃশ্য থাকে সেখানে যে পিতা মাতার মানসিক শক্তি সন্তানে সাক্ষাৎভাবে সংক্রামিত হইয়াছে, ইহা বলিলে এই মতই পোষণ করা হয় যে, যেমন এক শরীর হইতে আর এক শরীর জন্মে, তেমনি এক মানবাত্মা হইতে অন্য মানবাত্মা জন্মে; অথচ এই মতের স্বপক্ষে কোন যুক্তিই দেখিতে পাওয়া যায় না। পিতামাতার মানসিক শক্তি কোন অজ্ঞাত প্রণালীতে সন্তানে সংক্রামিত হওয়া অসম্ভব নহে, বরং অনেক পরিমাণে সম্ভব বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু পিতামাতা যখন নিজ সাধন-বলে সন্তানের আত্মাকে উৎপাদন করেন না, এবং যখন দেখা যায় যে যতদিন পর্য্যন্ত না কোন আত্মা নিজে চেষ্টান্বিত হয়, যত দিন না তাহার নিজ মানসিক শক্তি জাগরিত হয়, তত দিন কেবল অন্যের যত্নে তাহার উন্নতি সাধিত হয় না;—যখন দেখা যাইতেছে যে ব্যক্তিগত সাধনই ব্যক্তিগত উন্নতির মূল কারণ,—তখন ভিন্ন ভিন্ন আত্মার জন্মগত প্রভেদ সেই আত্মার জন্মান্তরগত সাধনের তারতম্য-জনিত হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

২। আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় দেখিতে পাই, আমাদের মানসিক অনেক ক্রিয়াই,—সম্ভবতঃ সমুদায় ক্রিয়াই—শরীরের সহযোগিতার উপর, স্নায়বিক যন্ত্রের (nervous systemএর) সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। আত্মা আর শরীর এক নহে; ইহা নিশ্চয়, এবং স্নায়বিক যন্ত্রের নিষ্ক্রিয় অবস্থায়, গভীর সুষুপ্তির অবস্থায়ও যে মানসিক সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাও এই প্রবন্ধেই দেখান হইয়াছে। কিন্তু ইহা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে স্নায়বিক যন্ত্র অবসন্ন দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেই মানুষ ঘুমাইয়া পড়ে, বা অন্য প্রকারে অচেতন হইয়া পড়ে,—মানবাত্মার ব্যক্তিগত প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়,—দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, মনন, ধ্যান প্রভৃতি সমস্ত মানসিক ক্রিয়া এবং ব্যক্তিগত জীবনের মূলীভূত অহংবোধ পর্য্যন্ত নিরুদ্ধ হইয়া যায়। ইহাতে কি এই কথাই সপ্রমাণ হয় না যে মানবাত্মার ব্যক্তিগত প্রকাশের পক্ষে কোন না কোন প্রকার শরীর, স্নায়বিক যন্ত্রের ন্যায় কোন না কোন জড়ীয়

আশ্রয়, একান্ত আবশ্যক? শরীর-বিহীন হইয়া যে মানবাত্মার প্রকাশ একবারে অসম্ভব, আমরা এই কথা বলিতেছি না। কিন্তু সমস্ত জীবন যাহার একান্ত প্রয়োজন হইল, যাহা না হইলে এক মুহূর্ত্তও চলিল না, একবার তাহার বিনাশ হওয়া মাত্র তদনুরূপ আর কিছুর প্রয়োজন হইল না,—যে শক্তি, অর্থাৎ অশরীরী হইয়া থাকার শক্তি, সমগ্র জীবনে একবারও প্রকাশ পাইল না, শরীর পতনমাত্রেই সহসা সেই শক্তি বিকশিত হইল, শরীর বিনাই দর্শন শ্রবণ মননাদি সমস্ত মানসিক ক্রিয়া চলিতে লাগিল,—ইহা যেন প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ সুতরাং অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ, আধ্যাত্মিক উন্নতি যে সমস্ত উপায়ের উপর নির্ভর করে, তন্মধ্যে অনেক গুলিই শরীরের সহিত সম্বদ্ধ। নীতি ও আধ্যাত্মিকতা সামাজিক বস্তু,—পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-ঘটিত বস্তু। পরস্পরের সহিত দেখা শুনা, পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান, প্রেমিক ও প্রেম পাত্র, উপকারী ও উপকৃত—এবম্প্রকার সম্বন্ধ যে অবস্থায় নাই,—সে অবস্থায় আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভবপর নহে, সে অবস্থায় আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন অর্থ আছে বলিয়াই বোধ হয় না। অথচ অশরীরীর পক্ষে—অশরীরী ব্যক্তিগণের মধ্যে—এই সকল সামাজিক সম্বন্ধ কিরূপে সম্ভব, তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং এক শরীর পাতান্তে আর এক শরীর প্রাপ্ত হওয়া ব্যক্তিগত আত্মার পুনঃ প্রকাশের পক্ষে এবং ক্রমোন্নতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। দীর্ঘকালব্যাপী সাধনও উন্নতির ফল স্বরূপ বিদেহ অবস্থা লাভ করা অসম্ভব বলিয়া মনে করি না, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু কোথাও কিছু নাই, জীবদ্দশায় এরূপ বিদেহ হইয়া কার্য্য করিবার শক্তির কোন প্রকাশ নাই, অথচ মরণান্তে সহসা এরূপ অবস্থা লাভ হইল, ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। আর, স্থূল শরীর না থাকিলেও কোন না কোন প্রকার সূক্ষ্মশরীর জীবাত্মার পক্ষে চিরদিনই অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হয়। অসীম জ্ঞানের পক্ষে কোন প্রকার শরীরের প্রয়োজন নাই, বরং 'অসীম' ও 'সশরীর' এই দুই ভাব পরস্পর-বিরুদ্ধ। কিন্তু 'সসীম জ্ঞান' বলিলেই কোন না কোন বিষয়ের বেষ্টন বুঝায়,—সে বিষয় স্থূলই হউক আর সূক্ষ্মই হউক।

৩। পূর্ব্বজন্ম সত্য হইলেও মানবাত্মা যে নানা নিকৃষ্ট যোনি ভ্রমণ করিয়া

অবশেষে মানবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সপ্রমাণ হয় না। মানবাত্মারই উচ্চ নীচ অসংখ্য সোপান, অসংখ্য অবস্থা-পরম্পরা থাকিতে পারে যাহার ভিতর দিয়া ইহা ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু যোনিভ্রমণ যে একবারে অসম্ভব, তাহা বলিতে পারি না। মানবের জ্ঞান ও বিশেষ বিশেষ নিকৃষ্ট জন্তুর জ্ঞানে অনতিক্রমণীয় প্রভেদ আছে, বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জীবপরম্পরাকে দাঁড় করাইলে সেই অনতিক্রম-ণীয় প্রভেদ লক্ষিত হইবে কি না সন্দেহ। বিজ্ঞান যেন ক্রমশঃ আমাদের সংস্কারগত ভেদজ্ঞানকে দূর করিয়া দিতেছে। কোন কোন উচ্চতর মানবেতর জন্তুর মধ্যে এমন গভীর ও মধুর সামাজিক ভাব এবং উন্নতিশীলতা দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি মানবের পক্ষেই দুর্লভ পরোপকার-প্রবণতা, স্বার্থহীনতা, এমন কি অন্যায় কার্য্যের জন্য অনুতাপের ভাব পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে এই সকল জন্তুর অমরত্বলাভ ও ক্রমোন্নতি এবং পরিণামে মনুষ্যত্ব লাভ একবারে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, শরীর ও মনের পরস্পর নিকট সম্পর্ক সত্ত্বেও ইহাদের প্রকৃত সম্বন্ধ এখনও এত দুর্ব্বোধ রহিয়াছে যে জন্মান্তর ও যোনি-ভ্রমণ যদি সত্যও হয়, তথাপি বলিতে হইবে যে, কি প্রণা-লীতে এক দেহ-মুক্ত আত্মা দেহান্তরে প্রবেশ লাভ করে, কি নিয়মে নিম্ন যোনিস্থ আত্মা উচ্চতর শরীরান্তর প্রাপ্ত হয়, এই সমস্ত বিষয় এখনও গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। একটী কথা আমাদের নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কোন আত্মা একবার মানবত্ব প্রাপ্ত হইয়া, মানবের জটিল ও উন্নত মনোবৃত্তি সমূহ প্রাপ্ত হইয়া যে পুনরায় কোন নিকৃষ্ট জন্তুর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে ইহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। এরূপ আত্যন্তিক অধোগতি প্রাপ্তির উপযুক্ত মানসিক ও আধ্যাত্মিক দুরবস্থা মানবাত্মার পক্ষে ঘটা আমরা অসম্ভব মনে করি, এবং বোধ হয় প্রাণীবিজ্ঞানেও এরূপ পশ্চাদগামী বিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

৪। জন্মান্তরবাদের বিরুদ্ধে একটী আপত্তি সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। সেই আপত্তিটী এই,—পূর্ব্বজন্মের কথা যখন কিছুই স্মরণ নাই তখন কিরূপে বলিব পূর্ব্বজন্ম ছিল? আর যে সকল কর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছি, তাহার ফলভোগ ন্যায়সঙ্গতও নহে। এই আপত্তি আমাদের তাদৃশ কঠিন বলিয়া বোধ হয় না।

আমরা ইহজীবনে দেখি, আমাদের জীবনের অধিকাংশ তত্ত্বই স্মৃতির পশ্চাতে থাকে, এককালে প্রকাশিত হয় না, এবং সুষুপ্তির অবস্থায় সমস্তই বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়, অথচ তাহাতে আমাদের ব্যক্তিগত একত্ব বিনষ্ট হয় না। তার পর দেখুন, আমরা সজ্ঞানভাবে যে সমস্ত পুণ্য বা পাপ কার্য্য করি তাহা ক্রমশঃ ভুলিয়া যাই, অথচ সেই সকল কার্য্যের ফলস্বরূপ যে সু বা কু অভ্যাস, তাহা আত্মাতে বদ্ধমূল হইয়া জীবনে সু বা কু ফল, সুখ বা দুঃখ উৎপাদন করিতে থাকে। অধ্যয়ন, উপদেশ, আলোচনা ও চিন্তা প্রভৃতি হইতে লব্ধ বিশেষ বিশেষ সত্যের অধিকাংশই বিস্মৃত হইয়া যাইতে হয়। অথচ এই সমুদায়ের প্রভাবে বুদ্ধির যে তীক্ষ্ণতা ও ধারণাশক্তি জন্মে, তাহা আত্মার স্থায়ী সম্পত্তি হইয়া থাকে। তেমনি যে যে সজ্ঞান পুণ্যকর্ম্ম, পুণ্যকল্পা, পবিত্র চিন্তাদ্বারা নিস্বার্থ প্রীতি ও চিত্তশুদ্ধি লাভ করা যায়, যে সকল উপাসনা ধ্যান ধারণাদি সজ্ঞান সাধনাদ্বারা যোগ ও ভক্তি লাভ করা হয়, সে সমুদায় কার্য্যের অধিকাংশই জ্ঞানের ভূমি ছাড়িয়া গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, অথচ তাহাতে অভ্যস্ত ও সঞ্চিত আধ্যাত্মিক সম্পত্তি সমূহ নষ্ট হয় না। পুণ্য সম্বন্ধে যেরূপ, পাপ সম্বন্ধেও সেরূপ। যে সমস্ত সজ্ঞান পাপচিন্তা, পাপকথা, পাপব্যবহারদ্বারা হৃদয় শুষ্ক, কঠোর, পরপীড়ন-প্রবণ, স্বার্থপর ও নীচ ভোগাসক্ত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই মানুষ ক্রমশঃ ভুলিয়া যায়, কিন্তু তাহা ভুলিয়া গেলেও মনের অপবিত্র গঠন, মনোবৃত্তির অভ্যস্ত পাপাভিমুখী গতি পরিবর্ত্তিত হয় না। এইত গেল সাধারণ কথা, যাহা সকলের জীবনেই অল্লাধিক পরিমাণে ঘটে। এই সকল স্থলে আমরা পূর্ব্ব কথার বিস্মৃতিবশতঃ কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত একতা নষ্ট হইল বলিয়া মনে করি না, অথবা যে সকল কু বা সু অভ্যাস মানুষের দুঃখ বা সুখ ঘটাইতেছে, তাহার কারণরূপী সজ্ঞান পাপ বা পুণ্য কর্ম্মসমূহ কর্ত্তা ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া ঈশ্বর তাহার সম্বন্ধে কোন অন্যায় ব্যবহার করিতেছেন,—তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ বা নিগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন,—এরূপ মনে করি না। তার পর আবার, বিশেষ বিশেষ স্থলে, কোন উৎকট পীড়া বা বিপৎপাৎ বশতঃ পূর্ব্বস্মৃতি একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, জীবনের পূর্ব্বাংশের সঙ্গে অপরাংশের একত্ববোধ পর্য্যন্ত চলিয়া যায়, অথচ সেই সকল স্থলেও প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তিগত একতা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে

করি না, এবং সেই সকল স্থলেও পূর্ব্বকৃত পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের ফল জীবনকে নিয়মিত করিতে থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিস্মৃতি অল্পাধিক পরিমাণে এই জীবনেও ঘটে, এবং এই জীবনেও বিস্মৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। ইহজীবনের এই সকল ঘটনার যে ব্যাখ্যা, পূর্ব্ব বা পর জীবন সম্বন্ধেও সেই ব্যাখ্যাই খাটে।

৫। আর একটি কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিব। মুক্তিলাভ করিলেই, চিত্ত শুদ্ধ হইলেই, ব্রহ্মের সহিত নিত্যযোগ লাভ হইলেই, জীব ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়, মানবের আর ব্যক্তিত্ব থাকে না, প্রকৃত পক্ষে মানব আর থাকেই না,—এই যে একটা বৈদান্তিক মত, ইহা আমাদের নিকট যুক্তি-যুক্ত বলিয়া বোধ হয় না, এবং ইহাও বলা আবশ্যক যে বেদান্তদর্শনের প্রধান গ্রন্থ "ব্রহ্মসূত্র" এই মতের পক্ষপাতী নহে। এই মত অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এবং একটি বিশেষ বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মত। ইহা প্রাচীন বৈদান্তিক মত নহে এবং সমুদায় বেদান্তবাদীর মত নহে। মুক্তাত্মা যদি ব্রহ্মে লয় প্রাপ্তই হইল, অর্থাৎ নিত্য চিরন্তন পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণই রহিলেন, সসীম জীবভাব যদি বিনষ্টই হইল, তবে ব্রহ্মের জীব-লীলা, জীবের জীবনে তাঁহার অনুপ্রকাশ এবং জীবের উন্নতি-কল্পে অশেষ আয়োজন, সমস্তই ব্যর্থ হইল বলিতে হইবে। "জীবের জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, জীব কৃতকৃতার্থ হইল, আর তাহার বাঁচিয়া ফল কি?" এই কথাও কিছুমাত্র যুক্তিযুক্ত নহে। যে অবস্থা লাভের জন্য এত আয়োজন, যে অবস্থা পরম মঙ্গল, তাহাতে নিত্যস্থিতিই প্রকৃত মঙ্গল; সুতরাং তখন বিলয়ের সময় নয়, তখন বরং প্রকৃত জীবনারম্ভ। যাঁহার সমুদায় বাসনা নিবৃত্ত হইয়াছে, সমুদায় স্পৃহা পরিতৃপ্ত হইয়াছে, যিনি জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছায় ব্রহ্মের সহিত চিরসংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মীভূত হইয়াছেন, তাঁহার আর নিজের জন্য লভনীয় কিছু না থাকিতে পারে, তাঁহার নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ব্যস্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন ও অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু এরূপ ব্রহ্মীভূত, সর্ব্ববিধ ব্যক্তিগত কামনাশূন্য আত্মারও বিলয়ের প্রয়োজন হইতে পারে না, এবং তাঁহার সকাম কর্ম্ম দগ্ধ হইলেও নিষ্কাম কর্ম্ম শেষ হয় না। এরূপ ব্যক্তি ব্রহ্মের সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বভাব প্রাপ্ত হন, ব্রহ্মের প্রকৃতি-প্রসূত জীবলীলার সহিত সমগ্র বলের সহিত যোগ দেন, জীবের মুক্তির জন্য, উন্নতির জন্য, ব্রহ্মের

দ্যায় নিষ্কাম নিস্পৃহ ভাবে চিরদিন কার্য্য করিতে থাকেন। অতি ক্ষুদ্রতম মানবকেও যখন ঈশ্বর বিনাশ করেন না, তখন যাঁহারা তাঁহার সারূপ্য ও সাযুজ্য প্রাপ্ত করিয়া তাঁহার মহদুদ্দেশ্য সাধনের, তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের সহায় হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তিনি বিনাশ করিবেন, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। বিনাশ করা দূরে থাকুক, আমাদের বরং বোধ হয় যে প্রচলিত লয়বাদের বিপরীত কথাই ঠিক। অর্থাৎ তাঁহারা সংসার হইতে, দেশ কাল ও বিষয়ের সংস্রব হইতে, দূরবর্ত্তী না হইয়া বরঞ্চ কোন না কোন প্রকারে সংসারের সহিত, জীবজগতের সহিত, চিরদিনই সংশ্লিষ্ট থাকেন, এবং নিষ্কাম-ভাবে জীবের সেবা করেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, দেখ, আমার অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্য কিছুই নাই, কিন্তু আমি জীবের হিতের জন্য নিয়ত কর্ম্ম করিতেছি। এই আখ্যায়িকাচ্ছলে গীতাকার উৎকট সন্ন্যাস-বাদের প্রতিবাদ করিতেছেন,—"যাঁহার সমস্ত পাওয়া হইয়াছে তাঁহার আর সংসারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিবার প্রয়োজন নাই" এই স্বার্থপরতা-প্রসূত সংকীর্ণ মতের প্রতিবাদ করিতেছেন। তাই আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতেও বোধ হয় যে বিদেহ অবস্থায়ই হউক, অথবা শরীরান্তর গ্রহণ করিয়াই হউক, ব্রহ্মীভূত মুক্তাত্মারা সর্ব্বদাই জীবজগতের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন।